ভারতের শিল্প-কথা

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৯

২৫৪

ভারতের শিল্প-কথা

স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও [illegible]কলা

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৯

Published by the University of Calcutta and Printed at Sree Saraswaty Press Ltd., 1, Ramanath Mazumder Street, Calcutta by S. N. Guha Ray, B.A.

৫৩৫৮

যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা বাঙলার সন্তানদের
নিকট জগতের সকল জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়ে
সত্য-সন্ধানে ব্রতী করে গেছেন,
সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

স্মৃতি-তর্পণ স্বরূপে

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

সূচীপত্র

ভূমিকা

'ভারতের শিল্প-কথা' পুস্তকটি লিখতে অনুরুদ্ধ হই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ভাইস-চ্যানস্‌লার ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্কল্প বাঙলা ভাষায় সহজ ও সুলভ সংস্করণ গ্রন্থাবলীর প্রচার দ্বারা সাধারণের নিকট জ্ঞান-ভাণ্ডারের পথ সহজ করা। অবশ্য এত বড় কাজের অনুষ্ঠানের মধ্যে আমার যোগ্যতা যে কতটুকু, তা' আমি জানি না, তবে দেশের লোকের মনে এই গ্রন্থপাঠে যদি দেশের শিল্পকলার প্রতি অনুরাগের অঙ্কুরটুকুও জন্মায়, তবে গ্রন্থ-রচনা সার্থক জ্ঞান করব। অবশ্য সুলভ সংস্করণে চিত্রাবলী বেশী দিতে পারা যায় নি, কিন্তু যথাসম্ভব শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বর্ণনার দিকে মন রেখে বইখানি লেখা হয়েছে।

ভারতের শিল্প-কলার সঙ্গে উরোপের শিল্পকলার মিল বা গরমিলের বিষয় পরিশেষে কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু একটা কথা আরো বলা প্রয়োজন মনে করি যে,উরোপের চিত্র ও ভাস্কর্য্য-কলা যেমন মডেলকে আদর্শ রেখে তবে গ'ড়ে উঠেছে আমাদের দেশে তা' হয়নি। আমাদের শিল্পীদের আদর্শ মনের মধ্যে রূপকভাবে সমসাময়িক শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রত্যক্ষ-বোধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কতকটা কবিতা লেখার মত তাঁদের হাতের রেখা চলতো মনের মধ্যে প্রতিফলিত ছবি যা' জাগতো তারই ভাবের অনুসরণ ক'রে। এইখানে উরোপের শিল্পীকে

এদেশের শিল্পীরা ছাড়িয়ে গেছেন। অবশ্য এটি প্রাচ্য শিল্পেরই বিশেষত্ব এবং চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানেও দেখা যায়।

শিল্পকলা রস-সৃষ্টি, কিন্তু রসের দিক ছাড়াও ভারতের শিল্প-কলার বিষয় নানাদিক দিয়ে গবেষণা করা চলে। যথা, (১) শিল্প-রীতির (techniqueএর) দিক দিয়ে তার বিশেষত্ব-গুলি দেখানো; (২) বিশেষ বিশেষ ধরণের শিল্পের খুঁটিনাটির মধ্যে যে সকল রূপক অর্থ নিহিত আছে তার বিষয়; (৩) শিল্প-কলার মধ্যে মানুষের মনের বিকাশ; (৪) ছন্দ ও ভাবের দিক দিয়ে শিল্পকলার বিশ্লেষণ; এইরূপ আরো অনেক বিষয় গবেষণা করবার মত আছে, অবশ্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তার স্থান নেই। তা' ছাড়া শিল্প-শিক্ষার্থীর পক্ষে ভারতের ও বিদেশের শিল্প-সংগ্রহগুলির বিষয়ও বিশেষ ভাবে জানা প্রয়োজন। ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয়ের লেখা বিলাতের ভারতীয় শিল্প-সংগ্রহের বিষয় একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা শিল্প-শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতার্থে নীচে একটি এদেশের শিল্প-সংগ্রহের তালিকা দিলাম। যথা, পাটনায় মানুকের, বম্বের গাজদারের, হায়দ্রাবাদের সার আকবর হায়দারীর শিল্প-সংগ্রহ; মহীশূর রাজদরবারের শিল্প-ভাণ্ডার; জয়পুরের পোথিখানা; আলোয়ারের ও বড়োদার শিল্প-ভাণ্ডার; শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প-সংগ্রহ; বিশ্বভারতীর শিল্পাগার; মহারাজা বর্দ্ধমানের, স্বর্গীয় প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের শিল্প-সংগ্রহ; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের শিল্প-সংগ্রহ; রামপুর ও টেহ্‌রী গাড়বালের, মুকুন্দীলাল, এন, সি, মেটার

শিল্প-সংগ্রহ ; রায় রাজেশ্বর বালী (দরিয়াবাদ) ; পূরণচাঁদ নাহারের (কলিকাতা) শিল্প-সংগ্রহ প্রভৃতি ছাড়াও জয়পুর, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ ও বম্বের শিল্প-বিদ্যালয়ের সংগ্রহ এবং যাবতীয় প্রাদেশিক যাদুঘর আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-শিল্প-ভাণ্ডারের উল্লেখ করা যেতে পারে।

শুধু গ্রন্থের মারফৎ কোনো দেশের শিল্পকলার সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই প্রত্যক্ষভাবে অজন্তা, ইলোরা, মাদুরা, আগ্রা, মহাবলীপুরম, অনুরাধাপুর প্রভৃতি স্থানের শিল্প-তীর্থগুলি দেখারও প্রয়োজন আছে। পুস্তকটিতে কেবল তারই নির্দ্দেশমাত্র দেওয়া গেল। এখন আশা করা যায় আরো গভীরভাবে দেশের শিল্পকলার বিষয় গবেষণা হবে এবং নব নব তথ্য ও চিন্তার ধারার পরিচয় পাওয়া যাবে।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় শিল্পকলার কাল-সূচিটি দেখে দিয়েছেন এবং শ্রীসরস্বতী প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় যত্ন-সহকারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সুচারুরূপে ছেপেছেন, সেজন্য তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

গভর্ণমেণ্ট চারু ও কারু-
শিল্প-বিদ্যালয়।
লক্ষ্ণৌ, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

ভারতের শিল্প-কথা

স্থাপত্যকলা

শিল্পকলার বিষয় বলতে গেলে প্রথমেই বাস্তু-শিল্পের কথা আসে। কেন না, আধার না থাকলে যেমন কিছু রাখা যায় না, তেমনি স্থাপত্য না হ'লে ভাস্কর্য্য বা চিত্রকলারও ঠাঁই নেই। তাই উরোপে 'স্থাপত্য', 'ভাস্কর্য্য,' ও 'চিত্র-কলা'কে 'তিন-ভগ্নী' (Three sisters) বলা হয়। আদিম প্রস্তর যুগের কথা যদি আমরা ভাবি তো দেখব তখন হ'তেই মানুষকে গ্রীষ্ম বর্ষা থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে কখনো বা ঘরের বাইরে কখনো বা ঘরের মধ্যে, খোলা যায়গায় বাস করতে হচ্চে। আজ যে আমরা আমেরিকায় পঞ্চাশতলা বা একশতলা বিরাট সৌধাবলী দেখছি, সেগুলির জন্যে আদিম যুগ হ'তে মানুষকে যে কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েচে, তার ইয়ত্তা নেই।

দেশ প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান বা শীতপ্রধান হয় এবং সেইমত সেই সব দেশের আবাসেরও সংস্কার করতে হয়েচে যুগে যুগে। পৃথিবীতে এখনো এমন জাতি আছে, যারা এখনো সেই আদিম প্রস্তর যুগের মতই বাসা বেঁধে বাস করচে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ নাগা, কুকী প্রভৃতি আদিম জাতি-দের কথা বলা যেতে পারে। আবার হা-ঘরে জাতি আছে, যারা আজ পর্য্যন্ত বাসাই বাঁধলে না—শিবিরে (তাঁবুতে) বাস ক'রে দেশে দেশে ঘুরে ঘুরেই জীবন কাটাচ্চে। এরূপ

হা-ঘরে (যাযাবর) সমগ্র পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাসা-বাঁধার রীতিরও ক্রমোন্নতি হয়েচে দেখা যায়। তাই সভ্যতার দাবী সেই সব জাতি কবতে পারে, যাদের বাস্তুশিল্পের উন্নতি হয়েচে। যেমন তেমন ক'রে ঘর বেঁধে আছে পৃথিবীতে অনেক দেশের অসভ্য লোকেরা ; কিন্তু প্রকৃত স্থাপত্যকলার মধ্যে থাকা চাই শ্রী এবং মানুষের মার্জ্জিত মনের পরিচয়। তাই তাজমহল কোনো এক সম্রাজ্ঞীর কবর মাত্র নয়, সেটি মানুষের বাস্তু-পরিকল্পনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রাচীন কালের স্থাপত্যের নিদর্শন থেকে যদি ভারতবর্ষের সভ্যতার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করতে হয়, তবে হয়ত তেমন অতি প্রাচীন পৌরাণিক যুগের নিদর্শন এখন আর পাওয়া যাবে না। তবে বেদ ও পুরাণের বর্ণনাগুলি থেকে তার অস্তিত্বের কথা আমরা যথেষ্ট জানতে পারি। [অতি প্রাচীন কালে পৌরাণিক যুগে মানুষের প্রথম বয়স কাট্‌তো গুরু-গৃহে—আশ্রমবাসে ; এবং এই আশ্রমে থাকতে হতো একেবারে আদিম কালেরই মত কুটিরবাসে। শহরে রাজন্যদের বাসস্থানের মধ্যেই স্থাপত্য-শোভা দেখা যেতো, তাকে বলা হতো 'জনপদ'।]

প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে আমরা তিন প্রকারের স্থাপত্য দেখতে পাই। একটি হ'ল (১) যা' চালাঘর থেকে (বিশেষ, বাঙলা দেশের খোড়োচালা) ভেঙে তৈরী ; প্রাচীন বৌদ্ধ-চৈত্যাবাসগুলিতে, বাঙলা দেশের মন্দিরে এবং পরবর্ত্তী মোগল যুগের (Indo-Saracenic) ছত্রি প্রভৃতিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। (২) দ্বিতীয়টি হ'ল প্রাচীনকালের

রথের মত চাপা ধরণের (বিমান) এবং (৩) তৃতীয়টি ধরণীর শোভাবর্দ্ধনের জন্যে প্রাচীন রাজকিরীটের অনুরূপ গঠনে তৈরী হতো। এগুলি বেশ উঁচু ধরণের। আমরা ক্রমশ বিস্তারিতভাবে এগুলির কথা বলব।

ভারত-গভর্মেণ্টের প্রতিষ্ঠিত প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের তরফ থেকে প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করার উপযোগী এখনো বিস্তর বিষয় ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়ানো আছে। অল্পদিন থেকে এই বিভাগটি খোলা হ'লেও ইতিমধ্যেই অনেক কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েচে এই বিভাগটির দ্বারা। এতকাল ধরে অশোকের আমলের মৌর্য্য-স্থাপত্যেরই কথা আমাদের জানা ছিল, এবং ধারণা ছিল যে, ইট বা পাথরের তৈরী স্থাপত্যকলা ভারতবর্ষের লোকেরা তার পূর্ব্বে জানতেন না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সে দুর্ণামের অপসরণ ক'রে গেছেন সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিদ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সার জন মার্শেল মোহেন-জো-দড়ো ও হারাপ্পায় সিন্ধুদেশের মাটির মধ্যে থেকে অতি প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন আবিষ্কার ক'রে। পোড়া ইট, চুন (gypsum) ও মাটি দিয়ে গেঁথে হর্ম্ম্য তৈরী হতো, তা' থেকে প্রমাণ হয়; এবং খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরের ভারতের অন্যান্য শিল্পকলারও পরিচয় পাওয়া যায়। শান-বাঁধানো পুষ্করিণী, পাকা পয়ঃপ্রণালী (drains), পাকা ছাদ তৈরীর প্রথা প্রভৃতির অনেক কথাই জানা যায়।

মোহেন-জো-দড়ো ও হারাপ্পা

মোহেন-জো-দড়োতে (১) বাসগৃহ, অর্থাৎ আভিজাত্য-পূর্ণ ধনীর প্রাসাদ এবং গৃহস্থের ঘর, (২) দেবালয় বা

ভজনালয় (৩) এবং স্নানাগারই প্রধানত দেখা যায়। চাকরদের থাকবার ঘর, অতিথিশালা এবং রান্নাঘরগুলি নীচের তলায় এবং ধনীদের থাকবার ব্যবস্থা দোতলায় ছিল। শহরের পয়ঃপ্রণালী, ছাদের জলনিকাশের নল, ময়লা জল বা আবর্জ্জনার জন্যে বিশেষ কুণ্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, সভ্যতার উন্নতির স্তরেই সে সময় লোকেরা পৌঁছেছিলেন। একটি সুবৃহৎ স্নানাগার ১৮০ ফুট দীর্ঘ এবং ১০৮ ফুট প্রস্থ যা সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি দেখলে আধুনিককালের যে কোনো স্নানাগারের চেয়ে সুন্দর বলেই মনে হয়। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষের লোকেরা তখন স্থাপত্য ও পূর্ত্তকলায় বেশ পারদর্শী ছিলেন এবং পৃথিবীর সকল উন্নতিশীল জাতির মধ্যে অগ্রদূতস্বরূপ ছিলেন। ঠিক এরই পরবর্ত্তী বৈদিক যুগের সভ্যতার চিহ্ন লৌরিয়া নন্দনগড়ে প্রাপ্ত সোনার চিত্রফলক এবং ছত্রি প্রভৃতি সামান্য কিছু প্রাচীন ভিটার মধ্য থেকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। সম্যক্‌ভাবে অনুসন্ধান করলে হয়তো আরো কিছু এইরূপ প্রাচীন শিল্প-ইতিহাসের উপাদান এখনো আবিষ্কার হ'তে পারে।

প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগে মোহেন-জো-দড়োর ও পূর্ব্বেকার গুহাবাসীদের পরিচয় ভারতের নানা স্থানে আছে। এই সকল আদিম গুহাবাসীদের আবাসের সঙ্গে বর্ষাকালে বাসের জন্য তৈরী বৌদ্ধদের অজন্তা, বাগ, নাসিক, কার্লে প্রভৃতি গুহা-হর্ম্ম্যের এবং ইজিপ্তের ইপসামবুলের (Ipsambоul) দ্বিতীয় রামেসেসের (Rameses II) আমলের গুহা-মন্দিরগুলির তুলনা করে দেখলে বোঝা যায় যে, এই

আদিম গুহাবাসের ব্যবস্থাকে পরবর্ত্তী সভ্যতার আবহাওয়ায় কিরূপ সুরুচি-সম্পদে ভূষিত ক'রে তুলেছিলেন এই ভারতের ও ইজিপ্তের সভ্য বাস্তুশিল্পীরা।

ভারতের ক্ষত্রিয় রাজাদের দেশ জয় করা যেমন প্রাচীন কালে একটি বিশেষ ধর্ম্ম ছিল, তেমনি 'জনপদ' স্থাপন করাও বিশেষ একটি কাজ ছিল। এখনো তাই উত্তর-ভারতে টেহরি-গাড়বালের রাজারা যখন গদীতে বসেন, তখন তাঁদের পছন্দমত একটি নূতন যায়গায় নূতন রাজধানী স্থাপনা করতে হয় তাঁর নিজের নামে। একটি পৌবাণিক গল্পে রাজন্যদের নগর-স্থাপনার বিষয় উল্লেখ আছে। মারীচিকে বধ ক'রে মিথিলার পথে যাবার সময় ঋষি বিশ্বামিত্র লক্ষ্মণকে গল্পচ্ছলে যা' বলেছিলেন, তা থেকে কৌশাম্বীর জনপদের বিষয় জানা যায়। 'কুশ' নামক এক নৃপতি বাস কবতেন, 'বৈধর্ব্বী' তাঁর পত্নী ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর চার ছেলেকে পাঠালেন দেশ-বিদেশে রাজ্য ও নগব স্থাপনা করতে। তাঁর পুত্র 'বাসু', 'কুশনাভ', 'কুশাম্ভ' ও 'অশ্রুতরাজ' অনেক জনপদ স্থাপনা করেছিলেন। 'কুশাম্ভ'—কৌশাম্বী নগরী, 'কুশনাভ' —মহোদয়নগর, 'অশ্রুতরাজ'—ধর্ম্মারণ্য এবং 'বাসু' স্থাপনা করলেন গিরিব্রজ। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, নগর-প্রতিষ্ঠা ক্ষত্রিয় রাজাদের একটি বিশেষ ধর্ম্ম ছিল। সুতরাং তা' কেবলমাত্র অশোকের সময়েই যে সম্ভব হয়েছিল, তার পূর্ব্ব সম্ভব ছিল না, একথা ঠিক নয়। 'কৌশাম্বী' জনপদটির চিহ্ন মাটি-চাপা অবস্থায় আছে। এলাহাবাদ থেকে কৌশাম্বী ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখনো তার ভিটাগুলি খুঁড়ে দেখা হয়নি।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ এবং চীন পরিব্রাজক হিয়াঙসিয়াঙ ও ফাহিয়াঙের লিপি থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব তাঁর জীবিত-কালে এই কৌশাম্বী নগরে বাস করেছিলেন। পৌরাণিক গল্প বা প্রবাদকে বাদ দিয়ে যদি বৌদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থাবলীকে মানা যায়, তা'হলে আমরা এই কৌশাম্বীর মধ্যেই প্রাচীনতম স্থাপত্যকলাকে জানতে বা আবিষ্কার করতে পারি। ভিটাগুলি খোঁড়া হ'লে স্থাপত্যকলার অনেক তথ্যই আবিষ্কৃত হ'তে পারে। এই কৌশাম্বীরই এক রাজা উদয়নকে অবলম্বন ক'রে দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃত নাট্যকার কবি ভাস 'বাসবদত্তা' নাটিকাটি রচনা করেছিলেন।

প্রাচীন স্থাপত্যের নমুনা আমরা আরো পাই ভরহুৎ ও সাঁচীর রেলিঙে আঁকা ভাস্কর্য্যচিত্রের (bas-relief) মধ্যে ঘরবাড়ীর ছবিগুলি থেকে। তাতে আমরা প্রধানত পাই চৈত্য-ধরণের ছাদের নীচের (ঘোড়ার নালের মত) খিলান দেওয়া গবাক্ষ, যাকে আমরা চালাঘর-ঘেঁষা নক্সার স্থাপত্য-ব'লে গোড়ায় উল্লেখ করেচি। কুমারস্বামী (*Encyclopaedia Britannica, 11th Edition*) ভারতীয় ভাস্কর্য্যকলার আলোচনা করতে গিয়ে অতি প্রাচীন চৈত্য-রীতিকে আদিম অসভ্য আসাম অঞ্চলের টোডা জাতির চালাঘরের সঙ্গে তুলনা করেচেন। কিন্তু তার সঙ্গে যতই আকারগত মিল থাক্, ছন্দগত সামঞ্জস্য আমরা পাই না। বরং বাঙলা দেশের ঘরামীর তৈরী চালাঘরের সঙ্গে তার কিছু ছন্দগত মিল থাকতে পারে; বিশেষত বাঙলা দেশের নৌকার চালার বা ছাউনির সঙ্গে। রেলিঙ, তোরণ এবং ঘরের নক্সা যা' ভরহুৎ, সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতির ভাস্কর্য্যচিত্রে পাওয়া যায়, তা

থেকে মনে হয় যে, তারও অনেক আগে থেকে সেইরূপ স্থাপত্যের চলন ছিল এবং এই সব প্রাচীন স্থাপত্যের চিহ্ন এগুলিতে থেকে গেছে।

সাঁচী ও ভরহুতের স্তূপের চারপাশে যে বেষ্টনী আছে, তাকে 'বেদিকা', রেলিঙের মাঝখানকার পাথরকে 'সূচ' এবং রেলিঙের মধ্যেকার প্রদক্ষিণা-পথকে 'মেধী' বলা হতো। স্তূপটি অর্দ্ধগোলাকারভাবে মাটির উপর দেখা যেতো—অনেকটা জল-বুদ্বুদের মত আকারে। নির্ব্বাণের পর মহাপুরুষদের অস্থি এইরূপ নভোলোকেব মত অর্দ্ধবৃত্তাকার (বা ক্ষণস্থায়ী জল-বুদ্বুদের মত) আধারের নীচে রাখার প্রথা ভারতবর্ষে যে কতকাল থেকে চলে এসেছিল, তা জানা যায় না। স্তূপের বিষয় সবিশেষ পরে বর্ণিত হবে। অনেকে অনুমান করেন যে, হিন্দুরাও বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ঐরূপ স্তূপের মধ্যে মৃত ব্যক্তির অস্থি রাখতেন এবং স্তূপটি সাধারণত মাটিরই তৈরী হ'ত। স্তূপের ধারের রেলিঙ প্রভৃতি যে কেবল স্তূপের জন্যই চলিত ছিল, এরূপ ভাবা সঙ্গত নয়। এই সব রেলিঙ ও তোরণ প্রভৃতি তৈরীর প্রণালী দেখলে বেশ অনুমান করা যায় যে, এগুলি কাঠের কাজের অনুরূপ এবং তারই যেন জের পাথরের কাজের মধ্যেও চলেছিল। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-স্থাপত্যে অজন্তা, বাগ, কেনহেরী প্রভৃতি গুহায়ও তারই সংস্করণ দেখা যায়। কাঠের কড়ি বড়গার নকল পাথরের গায়ে খোদাই ক'রে দেখানো হয়েচে। যদিও সেগুলি অলঙ্কার-রূপে শোভাবর্দ্ধনের জন্যেই আছে, তার আর কোন সার্থকতা নেই। এই সব স্তূপের রেলিঙ ও তোরণগুলি একেবারে তখনকার সাময়িক কল্পনাপ্রসূত বিশেষ একটি সৃষ্টি বলে ধরে নিলে চলে

না; সেগুলি পূর্ব্বেকার স্থাপত্যেরই ক্রমিক ধারার পরিচয় দেয় মাত্র। বাস্তু-শিল্প সম্বন্ধে বেদের মধ্যেও উল্লেখ আছে দেখা যায়। তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে স্থাপত্য-কলার কেবল একটি আদিম (primitive) সংস্করণই বৈদিক যুগে যে ছিল, তা নয়। আমরা এখন সে বিষয় কিছু আলোচনা করব।

বাস্তু-শাস্ত্র

অথর্ব্ববেদে গৃহ-প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ আছে এবং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথা আছে। একটি প্রাচীন শ্লোকে আছে :

গেহ ত্বং সর্ব্বলোকাণাং
পূজ্যঃ পুণ্যো যশঃপ্রদঃ।
দেবতাস্থিতিদানেন
সুমেরুসদৃশো ভব॥
ত্বং কৈলাসশ্চ বৈকুণ্ঠ-
স্ত্বং ব্রহ্মভবনং গৃহ।
য স্ত্বয়া বিধৃতো দেবস্তস্মাত্ত্বং
সুরবন্দিতঃ॥
যস্য কুক্ষৌ জগৎ সর্ব্বং
বরীবর্ত্তি চরাচরম্॥
দেবমাতৃসমস্ত্বং হি সর্ব্বতীর্থময়স্তথা।
সর্ব্বকামপ্রদো ভূত্বা শান্তিং মে
কুরুতে নমঃ॥

অর্থাৎ :—হে গেহ, তুমি সর্ব্বলোকের পূজ্য, তুমি পুণ্য ও যশ প্রদান কর। দেবতাকে প্রতিষ্ঠান ক'রে তুমি সুমেরুর মত হও। তুমিই কৈলাস, তুমিই বৈকুণ্ঠ, তুমিই

ব্রহ্মভবন; যে মহাদেবতার অন্তরে জগৎ-চরাচর স্বচ্ছন্দে বিরাজ করচে, সেই পরম দেবতাকে তুমি অন্তরে ধারণ ক'রে আছ, তাই তুমি দেবতাদেরও বন্দিত। তুমি দেবমাতৃসদৃশ এবং তুমি সর্ব্বতীর্থময়। আমার সকল কামনাকে পরিপূর্ণ ক'রে আমার শান্তি সাধন কর, তোমাকে নমস্কার করি।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছেঃ—

বিশ্ববাসায় বাসায় গৃহং তে বিনিবেদিতম্
অঙ্গীকুরু মহেশান কৃপয়া সন্নিধীয়তাম্॥

অর্থাৎ—বিশ্ব তোমার মন্দির, হে দেবতা, এই গৃহ তোমার মন্দির হৌক, এই নিমিত্ত ইহা তোমাকে নিবেদন করচি। তুমি সকলের মহানেতা, তুমি কৃপাপূর্ব্বক এই মন্দির গ্রহণ কর, দয়া করে তুমি এর মধ্যে সন্নিহিত হও।

ইস্‌লাম ধর্ম্মে যেমন মসজিদ-প্রতিষ্ঠা করতে হলে 'কাবাব' দিকে (পশ্চিমে) মুখ রাখতে হয়, তেমনি হিন্দুশাস্ত্রেও চতুর্দ্দিক চতুষ্কোণের হিসাব আছে এবং মন্দির ও বাসভবন তার অনুরূপ তৈরী করতে হয়। চারদিকে চারটি বিশেষ দেবতা অধিষ্ঠান করচেন। যথাঃ—উত্তরে অশ্ববাহন কুবের, দক্ষিণে মহিষবাহন যম, পশ্চিমে মকরবাহন বরুণ, পূর্ব্বে হস্তিবাহন ইন্দ্র বিরাজ করচেন। তা'ছাড়া, আবার বায়ুকোণে হরিণবাহন বায়ু, ঈশানকোণে নন্দীবাহন শিব, অগ্নিকোণে অজবাহন অগ্নি, এবং নৈঋ‍ৎ কোণে গরুড়বাহন বিষ্ণু আছেন। দেবতা ও স্থান বুঝে মন্দিরের স্থাপনা করা হতো। আচার্য্য ও পুরোহিতেরা তার শাস্ত্রীয় বিধান বলে দিতেন।

মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে আঠারো জন বাস্তুশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যের নাম। যথাঃ (১) ভৃগু, (২) অত্রি, (৩) বশিষ্ঠ,

(৪) বিশ্বকর্ম্মা, (৫) মায়া, (৬) নারদ, (৭) নগ্নজিৎ (৮) বিশালাক্ষ, (৯) পুরন্দর, (১০) ব্রহ্মা, (১১) কুমার, (১২) নন্দিশ, (১৩) সৌনক, (১৪) গর্গ, (১৫) বাসুদেব, (১৬) অনিরুদ্ধ, (১৭) শুক্র এবং (১৮) বৃহস্পতি। বিশ্বকর্ম্মাকেই প্রধান বলে ধরে নেওয়া হয়। 'বাস্তু-লক্ষণে' আছে প্রথমেই 'কাল-পরীক্ষা'—অর্থাৎ কোন্ সময় গৃহ-নির্ম্মাণের পক্ষে প্রশস্ত সেইটি স্থির করা। 'দেশ-নির্ণয়'—অর্থাৎ স্থান-নির্ণয় করা, কোন্ দেশ বা স্থান গৃহ-নির্ম্মাণের পক্ষে সকল রকমে উপযুক্ত। 'ভূ-পরীক্ষা'—জমি (soil) কঠিন কিম্বা নরম, অর্থাৎ বোনেদের পক্ষে উপযুক্ত কিনা (পুষ্করিণী বোজান জমি নয় ত ? ইত্যাদি খুঁটিনাটি)। 'কর্ষণম্'—জমি স্থির হ'লেই তাকে কর্ষণের দ্বারা সমতল করার প্রয়োজন। 'পদ-নির্ণয়'—কি ভাবে বাড়ীটির ভিত্তি স্থাপনা করা হবে—কতটা ভিত্তি চওড়া বা সরু করতে হবে (foundation laying), তাব কথা। 'সূত্র-বিন্যাস'—প্রথম নক্সার মাপে জমিতে দাগ কাটা। 'গর্ভ-বিন্যাস'—প্রথম ভিত্তি-স্থাপনায় ইট বা পাথর কি দিলে বেশী মজবুৎ হবে জমি হিসেবে স্থির করা। তা'ছাড়া, জাতি-বিশেষের পক্ষে জমি কিরূপ হওয়া উচিত তারও খুঁটিনাটির বিষয় বাস্তুশাস্ত্রে দেওয়া আছে। যথা ঃ

আর্য্যগন্ধা চ সাঃ ভূমি ব্রাহ্মণানাং প্রশস্যতে।
রক্তগন্ধা চ যা ভূমিঃ ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্যতে॥
অন্নগন্ধা চ যা ভূমিঃ সা বৈশ্যানাং প্রশস্যতে।
সুরাগন্ধা চ যা ভূমিঃ শূদ্রাণাং সমুদাহৃতা॥

শিল্পাচার্য্যদের মতে ২০ প্রকার মন্দিরের ব্যবস্থা আছে, এবং শুক্রনীতিতে ১৬টির মাত্র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

(১) 'মেরু'—১২ তলা এবং ৪টি তাতে প্রধান প্রবেশদ্বার। (২) 'মন্দার'—১০ তলা চূড়া বা গম্বুজ দেওয়া। (৩) 'কৈলাস' —৪ তলা চূড়া দেওয়া। (৪) 'বিমান'—জালিকাটা গবাক্ষ বা জানালা থাকবে। (৫) 'নন্দন'—৬ তলা এবং ১৬টি শিখরবিশিষ্ট। (৬) সমুদ্গ—গোল পেটিকার মত। (৭) 'পদ্ম'—পদ্মের মত আকারের এবং একতলা। (৮-৯) 'গড়ুর' ও 'নন্দী'—৭ তলা এবং ২০টি শিখর বা চূড়া থাকবে। (১০) 'কুঞ্জর'—হাতীর পিঠের মত গড়ানে ও চওড়া। (১১) 'গুহরাজ'—তিনটি চূড়াযুক্ত হবে। (১২) 'বৃষ'—একতলা এবং একটি চূড়ার। (১৩) 'হংস'—হংসের মত আকারের তৈরী। (১৪) 'ঘট'—ঘটের মতন আকারবিশিষ্ট। (১৫) 'সর্ব্বতোভদ্র'—৪টি প্রবেশ-পথ এবং অনেকগুলি শিখরযুক্ত পাঁচতলা মন্দির। (১৬) 'সিংহ'—বারোটি কোণযুক্ত এবং সিংহের প্রতিমূর্ত্তি শোভিত হবে। প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্রে এইরূপ অনেক বিধান দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বিস্তারিতভাবে বাস্তুশিল্পের চর্চ্চা বহুকাল থেকেই এদেশে চলে এসেচে। যদিও শিল্প-শাস্ত্র হিসাবে সকল দৃষ্টান্ত এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না, কালের কবলে একে একে যে কোথায় অন্তর্হিত হয়েচে, তা' কে বলতে পারে?

ভারতের স্থাপত্যকলাকে দেশ-হিসাবে ভাগ করা যেতে পারে। যদিও ভারতের স্থাপত্যের নিদর্শন কেবলমাত্র ভারতেই নিবদ্ধ নয়, কেন না বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্রকে অবলম্বন করে ভারতের শিল্পচক্র পৌঁছেছিল সুদূর চীন, কোরিয়া ও ও জাপানে। চীন ও জাপানের স্থাপত্যকলায় (বিশেষ তোরণ-রচনায়) সাঁচী ও ভরহুতের প্রভাব স্পষ্ট দেখতে

পাওয়া যায়। এমন কি 'তোরণ' শব্দটির মত 'তোরি' কথাটিও জাপানে প্রচলিত আছে। ভারতের স্থাপত্যকলাকে তাই আমরা মোটামুটি এইভাবে ভাগ করতে পারি:

১। বৌদ্ধ
- (১) উত্তর ভারত
- (২) দক্ষিণ ভারত
- (৩) সিংহলীয়
- (৪) ব্রহ্ম
- (৫) যবদ্বীপ, বালী, শ্যাম ও কম্বোজ
- (৬) নেপাল ও তিব্বত

২। জৈন

৩। উত্তর হিন্দু
- (১) উড়িষ্যা
- (২) বঙ্গীয় বা গৌড়
- (৩) উত্তর ভারত

৪। দক্ষিণ হিন্দু (চালুক্য, দ্রাবিড়ি ও তামিলি)

৫। কাশ্মিরী (গান্ধার)

সমগ্র ভারতে এবং ভারত-প্রভাবাপন্ন এসিয়াখণ্ডে উল্লিখিত স্থাপত্যকলা ছড়িয়ে আছে। বৃহত্তর-ভারতের বিষয় লিখতে গেলে একটি বিরাট গ্রন্থের সৃষ্টি করতে হয়। এক্ষেত্রে আমরা বিশেষ কতকগুলি জ্ঞাতব্য বাস্তুশিল্পের কথাই বলব।

ভারতীয় স্থাপত্য ও তার বিশেষ পদ্ধতি

প্রথমেই কোনো দেশের স্থাপত্যকলার কথা বলতে গেলে তার রচনার বিশেষত্বের খুঁটিনাটির কথা গোড়ায় বলতে হয়। প্রাচীনতম স্থাপত্যের নিদর্শন যা মাটির তলা থেকে আমাদের দেশে আবিষ্কৃত হয়েচে সেই মোহেন-জো-দড়ো ও হারাপ্পার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেচি। এখন বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য-

কলা থেকেই আমরা আলোচনা আরম্ভ করব। প্রাচীন বৌদ্ধনগরীর মধ্যে লঙ্কাদ্বীপে অনুরাধাপুব, ভারতের মধ্যে নালন্দা, তক্ষশিলা ও সারনাথের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এবং পাটলিপুত্রের ভিটা প্রভৃতি থেকে স্থাপত্যকলার বিষয় অনেক কিছু জানতে পারি। মাটির তলায় চাপা-পড়া সহরগুলির স্থাপত্যের মধ্যে দেখবার অনেক বিষয় আছে। কিন্তু সর্ব্ব-প্রথমেই চোখে পড়ে শহরের জলনিকাশের পয়ঃপ্রণালীগুলি, বাঁধানো স্নানাগার এবং ঘরবাড়ীর ভিত্তির (পদনির্ণয়ের) নিদর্শনগুলি।

অতি প্রাচীন বৌদ্ধ-স্থাপত্যের পরিচয় যা আছে তার যদি কেবল আমরা প্রাকার (বা দেওয়াল) গুলি দেখি তো দেখব যে প্রায়ই সেগুলো ইট বা পাথর দিয়েই তৈরী হতো। ইট ও গাঁথুনির রীতি দেখেও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কোন্ যুগে এবং কোন্ সময়ে উহা তৈরী হয়েছিল নির্ণয় করতে পারেন। প্রধানত দেখা যায় মৌর্য্য ও সঙ্ঘ যুগের নালন্দা, কৌশাম্বী, পাটলিপুত্র (পাটনা) সারনাথ প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রাকারের ইটগুলি আধুনিক কালের ইটের চেয়ে অনেক বড়। তা'ছাড়া প্রাকারগুলিতে বেশীর ভাগ মাটি বা চুণের গাঁথুনি দেওয়া। এই গাঁথুনির ও ইটের আবার যুগে যুগে অনেক তারতম্য হতে দেখা যায়। মোগল যুগের ইটগুলি মাপে এখনকার ইটের তুলনায় আবার খুবই ছোট। মাত্র ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও এই প্রকার ছোট ইট তৈরী হতো উত্তর ভারতে।

ইট ও গাঁথুনি

খিলানগুলির যুগে যুগে যা পরিবর্ত্তন ঘটে তাও সহজে বোঝা যায়। মোগল আমলের (Indo-saracenic) খিলান

যা' তৈরী হতো, সেগুলি প্রায় অর্দ্ধচন্দ্র আকারের; কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু-মন্দিরের খিলান সাধারণত চাপা এবং সোজাসুজিভাবে গাঁথা। বৌদ্ধস্তূপ বা মন্দিরের মধ্যভাগে একপ্রকার বিশেষ উপায়ে পাথর সাজিয়ে খিলান গেঁথে তোলা হতো। এই প্রকার খিলান কোনো কোনো যায়গায় বহু যুগ থেকে টিকে আছে। মোগল আমলে খিলান গাঁথা হতো চুণ সুর্খি দিয়ে, এখন সিমেণ্ট-কঙ্ক্রিট তার স্থান অধিকার করেচে। পূর্ব্বে খিলান তৈরীর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল, এখন তা' খুবই সহজসাধ্য হয়ে পড়েচে। 'রথ', 'বিমান', 'চালাঘরে'র ধরণের বা 'মুকুট' গঠনের যে সব মন্দির তৈরী হতো, প্রত্যেকটির মধ্যে উক্ত প্রকার চাপা-খিলান পাথর সাজিয়ে তৈরী হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ (১) বুদ্ধগয়ার মন্দিরটিকে প্রাচীন দেবমুকুটের গঠনের মন্দির, (২) কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরটিকেও রথের দৃষ্টান্ত এবং (৩) দক্ষিণের চেজাচলের কপটেশ্বরের মন্দিরটিকে চালাঘরের ছাউনি ধরণের স্থাপত্য এবং চাপা খিলানের আদর্শ বলে ধরা যেতে পারে। খজুরাহোর (বৃত্রশূরের) ভুবনেশ্বরের (উড়িষ্যার) মন্দিরগুলিতেও ঐরূপ চাপা খিলান আছে। এই মন্দিরগুলির অধিষ্ঠান-প্রকোষ্ঠের (অর্থাৎ যার মধ্যে প্রতিমা বিরাজ করচেন) বাইরের আকার মুকুটের মত এবং তার সংলগ্ন মন্দিরের অংশ 'বিমান' বা রথের আকারে তৈরী।

খিলান

এই সকল মন্দিরের গাঁথুনিতে এবং বিশেষভাবে মেঝের উপর যে 'বজ্রলেপ' দেওয়া হতো, তার ভাল দৃষ্টান্ত নালন্দা, তক্ষশিলা ও সারনাথে পাওয়া যায়। শঙ্খচূর্ণ, শ্বেতপাথরের

চূর্ণ ও চুণ দিয়ে এমন মজবুত ক'রে তৈরী করা হতো যে এতকাল পরে মাটির তলা থেকে আবিষ্কার করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার পালিস মলিন হয়নি। পাথরের দেয়ালের উপর উৎকৃষ্ট পালিসের পরিচয় অশোকের আমলের (খৃঃ পূঃ ২৫০) আজীবক সাধুদের জন্যে তৈরী বরাবর গুহায় পাওয়া যায় এবং অশোকের তৈরী সারনাথের স্তম্ভ প্রভৃতিতেও তার নমুনা যথেষ্ট আছে।

বজ্রলেপ (mortar) ও পালিস

প্রত্যেক দেশের স্থাপত্যকলার বিশেষ রূপটি ধরা পড়ে সেখানকার স্তম্ভের গঠন দেখে। উরোপের বায়জান্তিন (Byzantine), রোমানেস্ক (Romanesque সারাসীনিক (Saracenic) প্রভৃতি স্তম্ভগুলি দেখলে স্থাপত্যকলাকে বেশ বোঝা যায়। ইজিপ্তের (মিশরের) স্তম্ভগুলি মরুর খেজুর গাছের বা প্যাপাইরাসের (Papyrus) গুচ্ছের মত কতকটা দেখতে। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্যকলায় দেশ-কাল-ভেদে স্তম্ভের আকার বা গঠনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেচে। প্রাচীন হিন্দু-মন্দিরগুলিতে বিষ্ণু-মন্দির হ'লে গরুড় স্তম্ভ, লক্ষ্মীর মন্দির হ'লে পদ্মাঙ্কিত স্তম্ভ, এবং রাজপ্রাসাদে সিংহ-অঙ্কিত স্তম্ভই সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা যদি বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখি তো এগুলি ছাড়া আরো অনেক প্রকারের স্তম্ভের পরিচয় আমরা পাই নানা স্থানের প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে। গরুড় স্তম্ভের দৃষ্টান্ত আমরা পাই মালব রাজধানী বিদিশার স্তম্ভটিতে, যেটি বাসুদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে গান্ধারের যুবরাজ হিলিওডোরাস খৃঃ পূঃ ১৪০ অব্দে তৈরী করিয়েছিলেন। স্তম্ভের গায়ের ব্রাহ্মী লিপি পাঠে জানা

স্তম্ভ

যায়, গ্রীকরাজ এন্টিয়ালসিভাসের পুত্র হিলিওডোরাসের সঙ্গে মালবরাজ ভাগভদ্রের কন্যা মালবিকার বিবাহের কাহিনীর বিষয়।

নাসিক গুহায় থামগুলির মাথার উপরকার কলসটি (capital) একটি কল্‌সী উপুড় করে রাখা, এইভাবে গঠিত। সিংহলের প্রাচীন শহর অনুরাধাপুরের স্থাপত্যের মধ্যে স্তম্ভের উপরে 'বজ্র-কলস', অজন্তায় 'আমলক-কলস' এবং বেসনগরের কীর্ত্তিস্তম্ভে তালপত্রের নক্সায় তৈরী কলস দেখা যায়। তা' ছাড়া সাধারণত পদ্মাকারের কলসই প্রাচীন ভারতের একটি প্রচলিত সংস্করণ। ভারতবর্ষের পদ্মের ন্যায় ইজিপ্তে শালুক বা কুমুদফুলের নক্সার প্রচলন ছিল। পদ্ম বা শালুককে নক্সাকারী রীতিতে দেখানো হতো—স্বাভাবিক ভাবে গড়া হতো না। তা' ছাড়া পদ্ম ও কলস হিন্দুদের বিশেষ মাঙ্গলিক চিহ্ন।

স্থাপত্যের শোভাবর্দ্ধনের জন্য স্তম্ভ তৈরী যা' হতো, তা' ছাড়াও রাজাদের গৌরব-ঘোষণার জন্যে জয়স্তম্ভের রেওয়াজও আমাদের দেশে বহু যুগ থেকে ছিল। অবশ্য প্রাচীনতম নিদর্শন অশোকের স্তম্ভগুলি ছাড়া এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। চিতোরের জয়স্তম্ভটি মধ্যযুগের রাজপুতরাজাদের একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

অশোকের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি অধিকাংশই সিংহ-কলসযুক্ত। লুম্বিনী বনে যেখানে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, কুশীনগরে যেখানে তাঁর পরিনির্ব্বাণ ঘটে, বুদ্ধগয়ায় যেখানে তপস্যা করে বৌদ্ধত্বপ্রাপ্ত হন, সকল স্থানেই তীর্থ-পরিক্রমকালে অশোক স্তম্ভ ও স্তূপ

অশোকের জয়স্তম্ভ

রচনা করে গিয়েছিলেন। জানা যায় অশোক প্রথমে পাটলিপুত্র ত্যাগ করে গঙ্গা পার হয়ে মজঃফরপুর, চম্পারণ এবং বৈশালীতে গিয়েছিলেন। এই সব স্থানে তাঁর শুভাগমনসূচক প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। কুশীনগরের স্তম্ভটির কলসের উপর অশ্ব-মূর্ত্তি আছে এবং স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা লিপিতে সেখানে অশোকের আসার খবর লেখা আছে। কনকমুনি-বুদ্ধের স্তূপের নিকট আরো একটি অশোকের রচিত স্তম্ভ পাওয়া যায়। কনকমুনি গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ। অশোক রাজার এই তীর্থ-পর্য্যটনের ইতিহাস নেপাল থেকে শ্রাবস্তি স্তূপের সকল যায়গায় স্তম্ভ-গাত্রে লেখা আছে। তা' ছাড়াও তাঁর ঘোষণা-লিপি পাহাড়ের গায়ে, গুহার গায়ে ও স্তূপের সামনে প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। অশোকের পরবর্ত্তী যুগের দিল্লী ও এলাহাবাদে রক্ষিত লৌহনির্ম্মিত বিরাট স্তম্ভ দুটি সে-যুগে যে কি করে ঢালাই করা হয়েছিল, তা' এখন বোঝা শক্ত। ধর্ম্মাশোকের দয়া-ধর্ম্ম-প্রচারের 'লাট' বা স্তম্ভগুলির যথাসম্ভব একটি তালিকা দেওয়া গেল।

১। দিল্লীর তোপ্‌রা স্তম্ভ—এটি ফিরোজ শা' তোঘ্‌লক্ ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে আম্বালা জেলার তোপ্‌রা গ্রাম থেকে তাঁর কোট্‌লা বা দুর্গে (ফিরোজাবাদে) এনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

২। দিল্লীর অপর একটি স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ ফিরোজ শা' তোঘ্‌লক্ তাঁর শিকারখানায় এনে রাখেন। এটিকে এখন দিল্লীর উত্তরে পাহাড়ের শিখরে দেখা যায়।

৩। লৌরিয়-অররাজ স্তম্ভ—লৌরিয় গ্রামে মহাদেব অররাজ মন্দিরের এক মাইল দূরে অবস্থিত।

৪। লৌরিয়-নন্দনগড় স্তম্ভ—মাথিয়া গ্রামের ৩ মাইল উত্তরে চম্পারণ জেলায় অবস্থিত। চূড়ায় সিংহমূর্ত্তি আছে।

৫। এলাহাবাদ স্তম্ভ—এলাহাবাদের প্রাচীন দুর্গে জাহাঙ্গীর বাদশা' কর্ত্তৃক ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেক-কালে প্রতিষ্ঠিত। অশোকের লিপি ছাড়াও এতে সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের (৩৮০—৪০০ খৃষ্টাব্দ) বিজয়-কাহিনী ও তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের মহিমা লেখা আছে।

৬। রামপুরবা স্তম্ভ—পিয়ারিয়া গ্রামে চম্পারণ জেলার রামপুরবাতে অবস্থিত। তার ঘণ্টাকার চূড়ায় সিংহ-মূর্ত্তি।

৭। নিগ্লীভ স্তম্ভ—নেপাল তরাইয়ের বস্তি জেলার চিল্লিয়া গ্রামের ১৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অশোক-লিপি থেকে জানা যায় যে, এটি কনকমুনি বুদ্ধের জন্মস্থানের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

৮। রুম্মিনদেঈ (লুম্বিনী) স্তম্ভ—নিগ্লীভ স্তম্ভের ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বদেরিয়া গ্রামে অবস্থিত। অশোকের লিপি থেকে জানা যায় যে এটি শাক্যমুনির জন্মস্থানের উপরে অবস্থিত।

৯। সঙ্কিস (সঙ্কাশ্য) স্তম্ভ—মথুরা ও কনৌজের মাঝামাঝি স্থানে আছে। এটির মাথায় একটি হাতীর মূর্ত্তি আছে।

১০। সাঁচী স্তূপের (ও অমরাবতী স্তূপের) আশে-পাশে ৬।৭টি করে স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে; কিন্তু সাঁচীর একটি স্তম্ভে মাত্র অশোকের শিলালিপি আছে। তার চূড়ায় ৪টি সিংহ-মূর্ত্তি।

১১। সারনাথ স্তম্ভ—সারনাথের ভগ্ন বৌদ্ধবিহারের সামনে প্রতিষ্ঠিত। চূড়ায় ৪টি সিংহ দেওয়া।

১২। বাখ্‌রা বা বৈশালী স্তম্ভ - বাখ্‌রা গ্রামে অবস্থিত। এটির মাথায় একটি সিংহ-মূর্ত্তি আছে।

চীন পরিব্রাজক হিয়াঙসিয়াঙ এইরূপ ১৫টি অশোক স্তম্ভ দেখেছিলেন ; এখন তাঁর বিবরণ-অনুসারে মাত্র ৪।৫টি পাওয়া যায়। এগুলির সবিশেষ বর্ণনা ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'অশোক' গ্রন্থে আছে।

অশোকের স্তম্ভগুলির মত কানাড়া প্রদেশে জৈন স্তম্ভও অনেক দেখা যায়। কিন্তু সেগুলির গঠন বেশ একটু সূক্ষ্ম ধরণের। তা'ছাড়া, পুরীর মন্দিরের বাইরে অবস্থিত গরুড়-স্তম্ভটিও উল্লেখযোগ্য। অশোকের স্তম্ভগুলি অপেক্ষা প্রাচীন স্তম্ভের চিহ্ন পাওয়া না গেলেও অনেকে অনুমান করেন যে, মন্দিরের সামনে ও রাজপ্রাসাদের সামনে কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্থাপনার প্রথা তার পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। অশোক তাঁর সমসাময়িক বা তাঁরও পূর্ব্বেকার রাজাদের কীর্ত্তি-স্তম্ভগুলির গায়েও অনেক সময় শিলালিপি রেখে গেছেন বলে অনেকে মনে করেন। অনেকে বলেন, অশোকের স্তম্ভ ছাড়াও আরো অনেক প্রাচীন স্তম্ভ, যা' মধ্যযুগের হিন্দুরা মাটি খুঁড়ে পেয়েছিলেন, সেগুলিকে শিবলিঙ্গ মনে ক'রে তার চার পাশে আবার মন্দির গড়ে তুলেছিলেন। সেগুলি এখন পীঠস্থানরূপে গণ্য হওয়ায় প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করা কঠিন। উত্তর-প্রদেশে একমাত্র দরিয়াবাদ তালুকে এইরূপ ৪টি স্তম্ভ শিবলিঙ্গ-হিসাবে পূজা হচ্চে বলে জানা গেছে। এরূপ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আরো অনেক দৃষ্টান্ত ভারতের নানাস্থানে

পাওয়া যেতে পারে। তা'ছাড়া, প্রাচীন ভারতের লোকেরা যে স্তম্ভ-যষ্টি পূজা করতেন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।
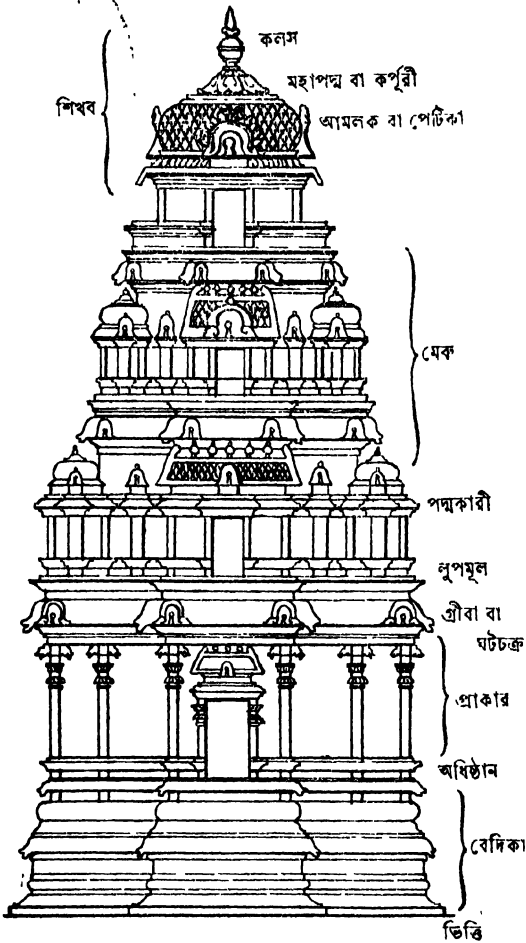
মন্দিরের দেহ বিভাগ

মথুরায় প্রাপ্ত লক্ষ্ণৌ-যাদুঘরে রক্ষিত একটি ভাস্কর্য্য-চিত্রে আছে, একটি দম্পতি স্তম্ভ প্রদক্ষিণ করচেন এবং ঠিক তার

নীচের চিত্রটিতে আছে পূজার পর তাঁরা উভয়ে নৃত্যোৎসব সম্ভোগ করছেন।

মন্দিরের দেহ-বিভাগ

আমরা এবার মন্দিরের যথাসম্ভব দেহ-বিভাগের কথা বলব। উরোপীয় স্থাপত্যের সঙ্গে ভারতের স্থাপত্যের তুলনা করতে গেলেও এই দেহ-বিভাগের বিষয় জানা দরকার। কেননা প্রত্যেক দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে এই সব রীতি-পদ্ধতি জড়িত হয়ে আছে। গোড়াতেই মন্দিরের চূড়ার কথা বলা যাক। মন্দিরের শিখরকে 'কলস' বলে এবং এই কলসের সঙ্গেই ধ্বজা বা পতাকা বাঁধা থাকে। 'শিখর' হ'ল আসলে গম্বুজ। রামরাজের বাস্তুশিল্প গ্রন্থে নানা প্রকার মন্দিরের দেহ-বিভাগের নির্দ্দেশ আছে। (১) প্রথমেই ভিত্তি-স্থাপন, (২) তার ঠিক উপরে 'বেদিকা' বা 'আসন', (৩) তারই ঠিক উপরের অংশ হ'ল 'অধিষ্ঠান', যার উপরে (৪) প্রাকার তৈরী হয়। প্রাকার বা দেয়ালের পরেই (৫) 'গ্রীবা' বা 'ঘটচক্র' যেখান থেকে ছাদ আরম্ভ হয়েছে। (৬) 'লুপমূল' বা 'শিখর মূল' যেখান থেকে শিখর বা গম্বুজ আরম্ভ হয়েচে। (৭) 'পদ্মকারী' নক্সার একটি বন্ধনী, (৮) 'শিখর' বা 'মেরু' (৯) 'মালাবন্ধনী' শিখরের ঠিক উপরে। (১০) 'আমলক' বা 'পেটিকা' ঠিক তারই উপরে এবং (১১) 'মহাপদ্ম' নক্সার উপরেই (১২) অমৃতকলস অবস্থিত হয়। এই

কলস

অমৃত কলসটি একটি মাঙ্গলিক পূর্ণঘটের উপর একটি

নারিকেল স্থাপনা করলে যেরূপ দেখতে হয়, এও কতকটা সেইরূপ। মন্দিরের এই শিখর ও মেরুর প্রথম উৎপত্তির ইতিহাস জানা যায় না, তবে বৌদ্ধযুগের স্তূপের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। স্তূপের রচনা-প্রণালী দেখলে অবশ্য সহজে তা' অনুমান করা যায় না। কিন্তু প্রাচীন মন্দিরের চূড়ার নিকটবর্ত্তী শিখর বা গম্বুজটির সঙ্গে স্তূপের গঠনের তুলনা করলে তা' জানা যায়। হ্যাভেল সাহেব তাঁর ভারতীয় স্থাপত্যের পুস্তকে (Indian Architecture) ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য তাজমহলটি যে ইটালী বা পারস্যের অনুকরণে তৈরী হয়নি, এই কথা প্রমাণ করবার জন্যে তার গম্বুজের সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু স্তূপের বা শিখরের, তুলনা করে দেখিয়েচেন। মতভেদ থাকলেও তাঁর যুক্তিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
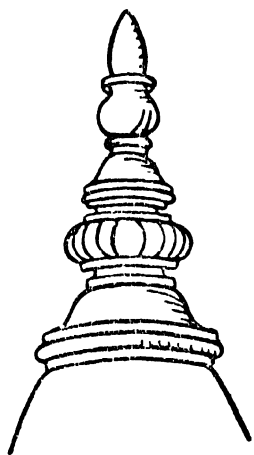
শিখর

বৌদ্ধ-স্থাপত্যের মধ্যে স্তূপ ছাড়াও 'চৈত্য' ও 'বিহার' দু প্রকারের মন্দির আছে। 'চৈত্য'—যে মন্দির ধর্ম্ম বা চেতনা জাগায় (গির্জ্জা—Church) এবং 'বিহার' যাতে সাধুরা স্বচ্ছন্দে বিহার করেন বা বাস করেন। আমরা ক্রমশ এই সকল বৌদ্ধ স্থাপত্যের কথা একে একে বলব।

বৌদ্ধ স্থাপত্যের দেহ-বিভাগ

স্তূপকে সিংহলে 'ডাগোবা' এবং ব্রহ্মদেশে 'প্যাগোডা'

বলে। বৌদ্ধগ্রন্থে আছে স্তূপের কথা, বুদ্ধদেব তাঁর জীবিত-কালে আনন্দকে বলেছিলেন, "প্রত্যেক চতুর্থ পথ-সঙ্গমে রাজরাজেশ্বরদের স্মৃতি-স্তূপ দেখতে পাওয়া

স্তূপ

যায়।" অনেকে তাই অনুমান করেন যে, বৌদ্ধযুগেরও পূর্ব্বে হিন্দুরা মৃত ব্যক্তির অস্থি এইরূপ মাটির স্তূপের মধ্যে সমাধি দিতেন, কিন্তু সেগুলিকে স্থায়ী করে রাখা প্রয়োজন মনে করেননি তাঁরা। বুদ্ধের জীবিত-কালে অবশ্য কোন স্তূপই নির্ম্মিত হয় নি তাঁর দ্বারা। তাঁর মৃত্যুর দুই শতাব্দীর পর অশোক প্রথম স্তূপ রচনা করান। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর জীব-হিংসাবৃত্তি ত্যাগ ক'রে অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে যখন মন দিলেন, তখনই তিনি এই সব স্তূপ রচনা করিয়েছিলেন এবং তাঁর পথ অনুসরণ ক'রে তাঁর পরবর্ত্তী অন্যান্য রাজারাও স্তূপ তৈরী করিয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে দেহের নশ্বরতারই কথা বিশেষভাবে বলা হয়েচে এবং তাই মনে হয় বৌদ্ধেরা জলবুদ্বুদের বা আকাশের আকারে অর্দ্ধবৃত্তাকার (hemispheric) এই স্তূপ তৈরী করাতেন। এই প্রাচীন স্তূপগুলির মধ্যে বুদ্ধদেবের নশ্বর দেহের অস্থি রাখা হতো। এই স্তূপের চারপাশে রেলিঙ দেওয়া হতো এবং চারদিকে চারটি তোরণ থাকতো। এই দ্বারগুলির নাম যথাক্রমে (১) 'বুদ্ধজাতি'— বুদ্ধের জন্মসূচক উদয়-তোরণ (পূর্ব্বদ্বার)। (২) 'সম্বোধি'— জ্ঞানপ্রাপ্তি (enlightenment) (দক্ষিণ দ্বার)। (৩) 'ধর্ম্ম-চক্র-প্রবর্ত্তন'—প্রচার (উত্তর দ্বার); এবং (৪) 'পরিনির্ব্বাণ' —মুক্তি (অস্তাচল-দ্বার)। স্তূপটিকে পরিবেষ্টন ক'রে এরই মধ্যে প্রদক্ষিণা-পথ বা পরিক্রমা-পথটি থাকত।

স্তূপের পাঁচটি বিশেষ দেহ-বিভাগ আছে। ঠিক মাটির উপরেই 'বেদিকা', যার উপরে স্তূপটি স্থাপিত হয়—সেটি (১) 'ক্ষিতি' বা মাটি। (২) তার উপরের অর্দ্ধবৃত্তাকার অংশটি—'অপ্' বা জল; (৩) তার উপরেব চৌকো অংশটি
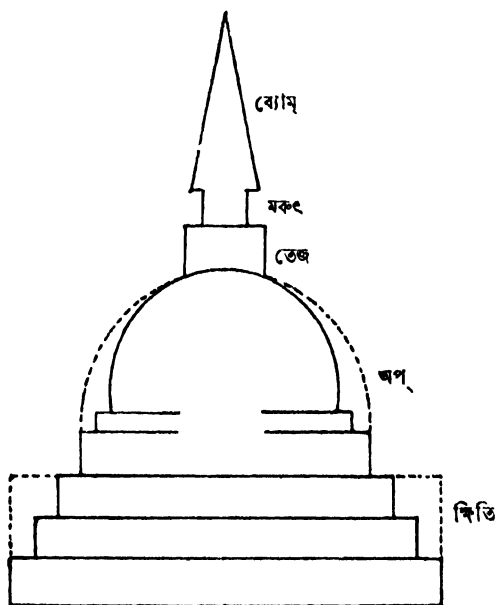
বৌদ্ধ স্তূপের দেহবিভাগ

'তেজ'—আগুন বা প্রাণ (৪) তার উপরের অংশ—'মরুৎ' বায়ু; (৫) এবং সকলের উপরে 'ব্যোম'—বা শূন্যতা বিরাজ করচে। স্তূপটি একটি পঞ্চভূতের জমাট সাকার প্রতীক-স্বরূপ। বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে অশোক স্বয়ং ৮৪,০০০ স্তূপ রচনা কবিয়েছিলেন। তার মধ্যে এখন সাঁচীর স্তূপটিকেই অশোকের বলে স্থির করা গেছে।

এইরূপ মৃত রাজন্য বা সাধুদের স্মৃতি-রক্ষা করবার জন্যে এসিয়াখণ্ডে মিসরে তিন কোনা পিরামিড কতকটা স্তূপের মত তৈরী হয়েছিল। তা' ছাড়া, স্তূপের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এরূপ অন্য কোনো দেশে কিছুই পাওয়া যায় না। এই বৌদ্ধস্তূপকেই অবলম্বন ক'রে যবদ্বীপে বরবুদরের (বড়বুদ্ধের) যে স্তূপ-মন্দিরটি সেখানে বৌদ্ধরা করে রেখে গেছেন, তা' পিরামিডের চেয়ে কম বিস্ময়কর নয়, বরং তার চেয়ে অনেক গুণে মনোরম। এই মন্দিরটিকে থাক্ থাক্ ভাবে সাজিয়ে উঁচু করে সার সার স্তূপাবলী দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েচে যে দূর থেকে সেটিকে অর্দ্ধবৃত্তাকার বিরাট স্তূপের চার পাশে কিরণ-ছটার মত মনে হয়। এটিকে পৃথিবীর পূর্ব্ব-দ্বারের 'স্থাপত্য-সূর্য্য' বলা যেতে পারে। এই স্থাপত্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এরূপ স্থাপত্য পশ্চিম দেশে কেন, পৃথিবীর কোথাও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। বৌদ্ধস্তূপেরই পরিণতি ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে এই বরবুদরের স্থাপত্যকলায়। ভারতবর্ষের মধ্যে সাঁচী, ভরহুৎ এবং অমরাবতীর স্তূপ যেমন বিখ্যাত, তেমনি লঙ্কাদ্বীপে অনুরাধাপুরের ডাগোবাগুলি এবং ব্রহ্মদেশে পেগানের প্যাগোডাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেঙ্গুনের 'শিউডেগন' প্যাগোডাটি প্রায় ৩৩০ ফুট উঁচু এবং এর মধ্যে বুদ্ধের কেশ ও দন্তাধার রাখা আছে।

চৈত্য ও বিহার গুহাগৃহ

"চৈত্য" হর্ম্ম্যগুলি ভজন-পূজনের জন্যে তৈরী, তা' পূর্ব্বেই বলা হয়েচে। গঠনও কতকটা ('চার্চ্চের' মত) অর্দ্ধবৃত্তাকার গরুর গাড়ীর চালার মত খিলান দেওয়া ঘর। এই ঘরের শেষের

দিকে থাকে একটি বিরাট স্তূপ। স্তূপটিকে বেষ্টন ক'রে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ দিয়ে তৈরী অলিন্দ-পরিক্রমা। 'বিহাব' গুহাগুলির সামনে অর্থাৎ বাইরের দিকে পাহাড়ের গা কেটে তৈরী সারি সারি থাম দেওয়া বারান্দা। বারান্দাতে প্রবেশ করলে সামনের দেয়ালের মধ্যে একটি বড় দ্বার, আর দু'পাশে দুটি জানালা; আবার তারই দুধারে ছোট ছোট দুটি দরজা। সামনের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেই একটি প্রকাণ্ড চারকোনা হলের মধ্যে এসে পড়তে হয়। সেই হলটির আবার চার পাশে দেয়ালের সমান্তরালভাবে নানাপ্রকার নক্সাকারী করা থামের সার। তাতে হলের চারপাশে একটি অলিন্দের মত আছে প্রদক্ষিণ করবার জন্যে। 'বিহার' হলের দক্ষিণ ও বামভাগের দেয়ালের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসোপযোগী সারি সারি কতকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। প্রধান প্রবেশ-দ্বার দিয়ে হলে প্রবেশ করলেই প্রথমেই চোখে পড়ে গর্ভগৃহটি, যার মধ্যে ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি বা স্তূপ থাকে। সব 'চৈত্য' ও 'বিহার' গুহাগুলিই এই একই প্রণালীতে তৈরী ভারতের সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

মধ্যপ্রদেশের যোগীমারা গুহাটিতে যেমন প্রাচীনতম চিত্রকলার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি গুহা-হর্ম্ম্যের মধ্যে তারই নিকটবর্ত্তী 'সীতাবেঙরা' গুহাটিকে একটি প্রাচীনতম গুহা-গৃহ বলতে পারি। স্থাপত্য-কলা হিসাবে তার মধ্যে খুব বেশী কারিগরী না থাকলেও এটিকে প্রত্নতত্ত্ববিদ ব্লকসাহেব ভারতের প্রাচীনতম নাট্যশালার নিদর্শন বলে উল্লেখ করেচেন। এই গুহা-গৃহের ভিতর তিনদিকে 'রোয়াক' বা বেদিকা, সামনে

গুহা-গৃহ
(কুষাণ, সঙ্ঘ ও অন্ধ্র যুগের নিদর্শন)

গোলভাবে সিঁড়ি এবং তার বাইরের দিকে বড় বড় চার কোণে চারটি ছিদ্র আছে। ব্লকসাহেব এই ছিদ্রের মধ্যে দৃশ্য-পটগুলি বা যবনিকা টাঙ্গাবার ব্যবস্থা ছিল বলে অনুমান করেন।*

এই গুহার ঠিক পরবর্ত্তী যুগে 'বরাবর' নামক গুহায় আমরা পাই প্রাচীন বৌদ্ধযুগের গুহা-হর্ম্ম্যের নিদর্শন। শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, এই 'ন্যগ্রোধ' নামক গুহাটি প্রিয়দর্শী (অশোক) অভিষেকের বারো বৎসর পরে আজীবক সাধুদের জন্যে তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। বাঙলাদেশের "শতপর্ন্নি" গুহাটিতে বুদ্ধের সময়ে একটি বিরাট সভা হয়েছিল বলে জানা যায়। অতএব এটি যে খৃঃ পূঃ ৫৮৩ অব্দের প্রাচীন গুহা, সে বিষয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের কোনো সন্দেহ নেই। এটি অপেক্ষাকৃত একটি ছোট গুহা-মন্দির; মাত্র ৩৩ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা এবং ১৭ ফুট চওড়া বিহার গুহা। বম্বের বন্দরের কাছে সালসেট দ্বীপে 'কেনহেরী' গুহাটি অজন্তার ঠিক পরবর্ত্তীকালের তৈরী বলে মনে হয়। কার্লে গুহাটি বম্বে ও পুনার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। ভারতবর্ষের সকল চৈত্য-গুহার মধ্যে উল্লিখিত গুহা দুটি সব চেয়ে বিরাট আকারের এবং স্থাপত্যকলার উচ্চতম আদর্শ। এটিতে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে মহারাজ 'ভূতি' বা দেবভূতির দ্বারা খৃঃ পূঃ ৭৮ অব্দে তৈরী হয়েছিল। এই গুহার সামনে রক্ষিত বিরাট সিংহস্তম্ভটি খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে অশোকের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। সেটিতে বোঝা যায় অশোক বৌদ্ধ-

* এ বিষয়ে গ্রন্থকার-রচিত 'বাগগুহা ও রামগড়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তীর্থ পরিক্রমাকালে সেখানে পদার্পণ করেছিলেন। কার্লে'রই চার মাইল উত্তরে 'ভাজা' গুহাটি বম্বে অঞ্চলের সব চেয়ে প্রাচীন গুহা, তা' শিলালিপি পাঠে জানা গেছে। কার্লে'র এগারো মাইল উত্তরে কয়েকটি চৈত্য গুহা আছে, সেগুলিকে 'বেদশা' বলে। বেদশা গুহার সামনেও অশোকের বড় বড় দুটি 'লাট' বা স্তম্ভ আছে।

নাসিকে যে গুহাহর্ম্ম্য আছে তার শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, অন্ধ্র-বৃত্তরাজ-কৃষ্ণ নাসিকের নগরবাসীদের এই গুহা উৎসর্গ করেছিলেন। এই গুহারই আরো একটি প্রাচীন শিলালিপিতে আছে যে সঙ্ঘযুগের ভদ্রকড়কারাজই এটি তৈরী করিয়াছিলেন। এই কারণে কার্লে'র গুহা অপেক্ষা এই গুহাকেই প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বেশী পুরাতন বলে অনুমান করেন। রাজপুতনায় কচ ও উজ্জয়িনীর মধ্যবর্ত্তী ধূমনারে অনেকগুলি গুহা আছে। ধূমনারের কাছাকাছি 'কোলভী'তে আরো কতকগুলি গুহা দেখতে পাওয়া যায়। তবে এগুলি তত প্রাচীন নয়। এগুলির মধ্যে অর্জ্জুন-গৃহমন্দির গুহাটি বিশেষ হিন্দুভাবাপন্ন। উড়িষ্যার প্রাচীন উদয়গিরি, খণ্ডগিরির গুহাগুলি দশম ও একাদশ শতাব্দীতে জৈনদের দখলে ছিল। খণ্ডগিরির শিখরে তাই এখনো একটি (অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের) জৈন মন্দির আছে। উদয়গিরির 'রাজারাণী' ও 'গণেশ' গুহা ছাড়াও 'ব্যাঘ্রমুখী' গুহাটি পাহাড়ের গায়ে এমনভাবে তৈরী, যেন মনে হয় একটি বাঘ মুখ-ব্যাদন করে আছে।

বম্বের নিকটবর্ত্তী একটি দ্বীপে বিখ্যাত হস্তীগুম্ফাটি (Elephanta) আছে। শিলালিপি পাঠে জানা যায়,

গুহাটি কলিঙ্গরাজ 'অহির' ১৪ বৎসর রাজত্ব করার পর তৈরী করিয়েছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি অসংখ্য প্রকারের দান ধ্যান করতেন বলে জানা যায়। গুহাটি যে কোনো হিন্দু রাজার তৈরী, তা' গুহার ভিতরকার ভাস্কর্য্যগুলি দেখলেই বোঝা যায়। তার সবিশেষ বিবরণ এই গ্রন্থের ভাস্কর্য্য অধ্যায়ে দেওয়া আছে। নাসিক ও পুণাব মাঝামাঝি স্থানে পুণীরে কতকগুলি গুহা আছে, তাহার মধ্যে একটি ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া গোল গুহাও আছে। তাতে একসার গোলভাবে সাজানো স্তম্ভ দিয়ে পরিক্রমাটি তৈরী। গুহাটিব মাঝখানে একটি স্তূপ আছে।

আওরাঙ্গাবাদের কাছে ইলোরা গুহাবলীতে বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈনদের নানাবিধ গুহা-মন্দির আছে। খৃঃ পূঃ ১৫০ শতাব্দী থেকে ২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে গুহা-স্থাপত্যের ক্রম পরিণতি ঘটেছিল তার যথেষ্ট পরিচয় এই গুহাগুলিতে আছে। এই গুহাগুলির বাইরের দিকটাও মন্দিরের মত করে কেটে পাহাড়ের কোল থেকে বার করা হয়েছে। এগুলিতে গুহা-স্থাপত্যের অপূর্ব্ব পরিণতি দেখা যায়। যবদ্বীপের বরবুদরের মতই এটি একটি আশ্চর্য্য শিল্পকলা। অজন্তার গুহাশ্রেণী* একটি ঘোড়ার নালের মত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ের গা কেটে সার সার তৈরী। তার নীচে একটি নদী বয়ে যাচ্চে এবং সেটি ঝরে পড়চে ঠিক গুহাগুলির এক প্রান্ত থেকে পর পর সাতটি জলের কুণ্ডের মধ্য দিয়ে। গুহাগুলি সর্ব্বদাই নির্জ্জন ও রমণীয় যায়গায় তৈরী করা হতো। বৌদ্ধেরা বর্ষাকালে নির্জ্জন-বাসের উপযুক্ত যায়গা নির্ব্বাচন করতেন।

* গ্রন্থকারের লেখা 'অজন্তা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অজন্তার সার সার ২৯টি গুহা আছে। বাগগুহাগুলিও বৌদ্ধদের কীর্ত্তি। অজন্তা থেকে ১৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত। খান্দেশ, পাতালখোরা, কোলাবা প্রদেশে আরো কতগুলি গুহা দেখা যায়, সেগুলি খৃঃ পূঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর বলে জানা গেছে। লঙ্কাদ্বীপের উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে দুটি চিত্রকলাশোভিত গুহা বেল সাহেব আবিষ্কার করেছিলেন। এ দুটিতে স্থাপত্যের কোনো বিশেষত্ব নেই।

মৌর্য্যযুগের স্থাপত্য

আজীবকদের জন্যে তৈরী বরাবরের গুহা ও সাঁচী স্তূপ রেলিঙ ছাড়াও অশোকের সময়ের বা তার পূর্ব্বের চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে পাটলীপুত্রের (পাটনায়) প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের খনন কার্য্যের দ্বারা। শত-স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদের ৮০টি পালিস করা থাম (ঠিক যেরূপ পালিস সারনাথে অশোকের থামে আছে) এবং কাঠের মঞ্চের ও পোড়া ইঁটের নমুনা (খুব বড় মাপের) পাওয়া গেছে। এই প্রাসাদটির বর্ণনা হিয়াঙসিয়াঙের লিপিতে পাওয়া যায়। তিনি এটিকে পারস্য দেশের রাজা পার্সিপলিসের শত-স্তম্ভশোভিত প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখিয়েছিলেন। তা থেকে এটি পারস্য স্থাপত্যকলার নকলে তৈরী হয়েছিল বলে প্রত্নতত্ত্ব-বিদেরা অনুমান করেন। সারনাথেও (কাশীর নিকটে) একটি মৌর্য্যযুগের বিহার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের দ্বারা মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েচে। এই বিহারটিতে নালন্দার মতই বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল বলে জানা যায়। বিহারের ছাত্রাবাস, জলের প্রণালী প্রভৃতি অনেক কিছু স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া

যায়। বিহার মন্দিরের এখন কেবল ভাঙাচোরা অংশই খানিকটা আছে; তাথেকে সেটি কিরূপ ছিল তা কেবল অনুমান করা যায় মাত্র।

মৌর্য্য রাজ্যের অবসানের পর সঙ্ঘ রাজ্যের শেষ পর্য্যন্ত অশোকের আমলের চলিত স্থাপত্যেরই উৎকর্ষ দেখা গেছে।

গুপ্ত ও মধ্যযুগের স্থাপত্য।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণ গুজরাটে এবং কঙ্কনে যখন ইন্দ্রদত্ত এবং মগধে যখন স্কন্দগুপ্ত রাজত্ব করতেন, তখনও ভারতের স্থাপত্য প্রাচীনভাবাপন্নই ছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি কুষাণ-যুগের একটি মন্দির। নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় ৫ম খৃষ্টাব্দীতে নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে শিক্ষার্থী ছাত্র আসতেন। সুমাত্রাদ্বীপের রাজা সেখানে একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করেছিলেন বলে জানা গেছে। চীন পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ এই নালন্দায় ১০০ ফুট উঁচু একটি ইটের তৈরী মন্দির দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করে গেছেন। এখন তার কোনো চিহ্নই আবিষ্কৃত হয়নি। রাজপুতানায় ও মধ্য ভারতে গুপ্ত যুগের অসংখ্য সূর্য্য-মন্দির ও দেবদেবীর মন্দির নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। কানপুর অঞ্চলে ভিতরগাঁওয়ে একটি ইটের প্রাচীন মন্দির আছে। এটিতে পোড়া ইটের ভাস্কর্য্য-শোভিত আছে। ভাস্কর্য্যগুলির বিশেষ বিবরণ পরে বলা হবে। পরবর্ত্তী গুপ্ত যুগের সিরপুরে একটি ইটের তৈরী প্রাচীন মন্দির আছে। এটিতেও ইটের কারুকার্য্য করা আছে এবং কুমারস্বামী এটিকে ইটের তৈরী প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলে উল্লেখ করেছেন। খৃঃ পূঃ ১ম

শতাব্দীর প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে রামনগরের অহিচ্ছত্রের মন্দিরটি একটি সুন্দর মন্দির। এই মন্দিরের দেয়ালেও পোড়ামাটির (terra-cotta) শিবের বিষয় অনেক চিত্র শোভিত আছে। মন্দিরটি আকারে কতকটা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মত 'মুকুট' ধরণের মন্দির। দেবঘরে, মধ্য ভারতে নাচনা-কাটারায়, সোলাপুরে ও কাঞ্চি রাজ্যে প্রাচীন গুপ্তযুগের হিন্দু মন্দির অনেক আছে, তার প্রত্যেকটির কারুকার্য্যের বিবরণ এই পুস্তিকায় দেওয়া অসম্ভব। সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক বিনষ্ট সোমনাথের শৈব মন্দিরটি এককালে গুজরাটের স্থাপত্যকলার বিশেষ সম্পদ ছিল।

উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ

উড়িষ্যায় নানা স্থানে ৮ম থেকে ১৩শ খৃষ্টাব্দী পর্য্যন্ত মন্দির স্থাপত্যের ক্রমপরিণতি দেখা যায়। পরশুরামেশ্বর মন্দির এবং লিঙ্গরাজের মন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য। কোনার্কের সূর্য্য মন্দির এবং পুরীর জগন্নাথের মন্দির সমসাময়িক। এগুলির গঠন-সৌকুমার্য্য ও গাম্ভীর্য্যের কথা বর্ণনার দ্বারা বোঝানো যায় না, প্রত্যক্ষ দেখবার ও অনুভব করবার জিনিষ। এই উড়িষ্যার মন্দির শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ৯ম খৃষ্টাব্দীর তৈরী বুন্দেলখণ্ডের খাজরাহো-মন্দিরাবলীর। ছত্রপুর রাজ্যের এই মন্দিরগুলি দেখলেই উড়িষ্যার মন্দিরের কথা মনে হয়। বাঙলাদেশের, বুন্দেল খণ্ডের, রাজপুতানার এবং আরো কোনো কোনো যায়গার স্থাপত্য-কলায় বেশ একটা ঐক্য কখন কখন দেখা যায়। কিভাবে এইরূপ কৃষ্টিগত যোগ ঘটেছিল তা গবেষণার যোগ্য। ইন্দোরের মেমাওয়ার

মন্দির। হিমালয়ে কাঙড়া উপত্যকার বৈজনাথের মন্দির প্রভৃতি এই একই ছাঁচে তৈরী। উড়িষ্যার প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে কোনার্কের সূর্য্যমন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটিকে 'ব্ল্যাক প্যাগোডা' (Black Pagoda) বলা হয়। মন্দিরটি পুরী থেকে ১৯ মাইল দূরে সমুদ্র-সৈকতে অবস্থিত। কোনো শিলালিপি না থাকায় মন্দিরটিকে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দ্বাদশ খৃষ্টাব্দীব তৈরী ব'লে অনুমান করেন। মন্দিরটি 'বিমান' আকৃতির এবং তার বেদিকার নীচের দিকে রথের চাকা খোদাই করা আছে। আসলে এটিকে সূর্য্যের রথের আকারেই তৈরী করা হয়েছিল।

বাঙলা দেশের স্থাপত্যের মধ্যে গৌড়ের কয়েকটি ভাঙা মন্দির ছাড়া সম্প্রতি আবিষ্কৃত পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পোড়া মাটির ভাস্কর্য্যচিত্র-সম্বলিত-মন্দির বাঙলাদেশে অনেককাল থেকে চলে আসচে। মুসলিম-অধিকারের পর অন্যান্য প্রদেশে পোড়া মাটির মূর্ত্তি গড়ার রেওয়াজ উঠে গিয়েছিল, কিন্তু বাঙলা দেশে শত বৎসর পূর্ব্বেও এইরূপ মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির নক্সার কাজ চলেছিল। বাঙলাদেশের ইটের তৈরী মন্দিরগুলির ছাদ ঠিক চালাঘরের অনুকরণে তৈরী হতো। বিষ্ণুপুর, শিবসাগর, মালদহ, গৌড়, পাণ্ডুয়া, দিনাজপুর, মথুরাপুর, জলপাইগুড়ি, বাগেরহাট, প্রভৃতি স্থানের নানাপ্রকার স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, বড়নগরের দেউল, বাঁকুড়া জেলার বাহুলারার সিদ্ধেশ্বরের মন্দির ও মসজিদ এবং সুন্দরবনের জটার দেউল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জটার দেউল এবং সিদ্ধেশ্বরের মন্দির ছুটি ভুবনেশ্বরের লিঙ্গ-রাজ প্রভৃতি মন্দিরের ধরণের প্রাচীন আর্য্য-হিন্দু-(Nagara style) স্থাপত্যের নিদর্শন। এগুলির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আনন্দ কুমারস্বামী সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরটি ১০ম শতাব্দীর বলে নির্দ্দেশ করেন। জটার দেউলের ইটগুলি দেখলে পাল-যুগের তৈরী বলে মনে হয়। একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে জয়ন্ত চন্দ্র রাজের দ্বারা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি ১০০ শত ফুট উঁচু। তার শিখরদেশে ছোট আকারে গড়া মন্দিরের মত ক'রে তৈরী নক্সাটি থেকে মন্দিরটি পূর্ব্বে কিরূপ ছিল কতকটা অনুমান করা যায়। এখন তার অবস্থা খুবই খারাপ। মন্দিরটি 'সর্ব্বতোভদ্র' রীতিতে গঠিত। ইহাতে চাপা খিলান অর্থাৎ সমান্তরাল (horizontal) খিলান আছে, গোল ধরণের (radiating) খিলান নেই। মুসলিম যুগের পূর্ব্বে ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ খিলান চলিত ছিল। তার বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে। সুখানপুর ষ্টেশনের নিকট মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানীর চিহ্ন।

বাঙলাদেশে বৌদ্ধযুগের অনেক স্থাপত্য শিল্পের কথা বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে জানা যায়, কিন্তু এখন সেগুলি যে কোথায় ছিল, তা' সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না। বিক্রমশিলা বিহারটি বাঙলাদেশের বিখ্যাত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। কিন্তু কোথায় যে সেটি অবস্থিত ছিল, তা' এখন আর জানবার কোনো উপায় নেই। পাল বংশের রাজা ধর্ম্মপাল সেটি ৮ম শতাব্দীতে স্থাপন করেছিলেন। এই মহাবিহারটি

প্রসিদ্ধ শিল্পী ধীমান ও বীতপালের পরিকল্পনায় তৈরী হয়েছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধেরা তখন এটিকে বিহার-রচনার আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই বিহার-বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন রত্নবজ্র (কাশ্মীরবাসী), জ্ঞানশ্রী, মিত্র (গৌড়বাসী), শ্রীজ্ঞান (বা অতীশ), শ্রীধর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বাস করতেন এবং এখান থেকেই বিস্তর সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ তিব্বতী ও নেপালী ভাষায় তর্জমা করা হয়েছিল। তক্ষশিলা ও নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় জগদ্দলবিহার বাঙলাদেশের রাজা রামপালের প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়। সেখানে তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী বাস করতেন। এখন সেটির স্থানও নির্ণয় করা যায় না। তা'ছাড়া বল্লভি বিদ্যালয়টিও বাঙলাদেশের কোনো একস্থানে ছিল বলে জানা যায়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, তক্ষশিলা ও নালন্দার ন্যায় অট্টালিকা প্রভৃতি ঐ সব স্থানেও নিশ্চয় ছিল। নালন্দায় 'রত্নদধি', 'রত্নসাগর' এবং 'রত্ন-কঞ্জক' নামে তিনটি সুবৃহৎ অট্টালিকা পাথর আর ইট দিয়ে তৈরী হয়েছিল। রত্নদধিটি নয় তলা উঁচু বাড়ী।

জৈন-স্থাপত্য

গুজরাটে অনেক জৈন-মন্দির আছে। সেগুলি ঠিক প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের ধরণের নয়; খুব বেশী কারুকার্য্য তাতে নেই। জৈন-মন্দিরগুলির মধ্যে আবু পাহাড়ের উপর দিলওয়ারা মন্দিরটি কেবল জৈনদের নয়—সমগ্র ভারতের স্থাপত্য-কলার একটি গৌরব-স্বরূপ। সাঙ্গেনীয়ারে জয়পুর রাজ্যে একটি সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত জৈন-মন্দির আছে। গুজরাটে গিরনারের বিখ্যাত নেমিনাথ ও তেজপালের মন্দির দুটিও উল্লেখযোগ্য।

বাঙলাদেশে (বর্ত্তমানে বিহারে) রাজমহলের উত্তরে পরেশ-নাথের মন্দিরের কথা অনেকেই জানেন। তা'ছাড়া গোয়ালিয়ারের ও খাজুরাহোর মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। পাটনার নিকট পাওয়াপুরীর গাঁওমন্দিরটি জৈনদের তীর্থস্থান। শিলালিপি-পাঠে জানা যায়, এটি সিতাম্বর শ্রীসঙ্ঘের দ্বারা ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রবাদ আছে, স্বয়ং মহাবীর এইস্থানে আসন গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লীতেও একটি প্রাচীন জৈন-মন্দির আছে। তার থামের উপর কারুকার্য্য দেখবার মতন।

দক্ষিণী মন্দিরগুলি বিরাট্ ব্যাপার। এগুলি এক একটি শহর বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তাই উরোপীয় পরিব্রাজকেরা

দক্ষিণী স্থাপত্য

এদেশে এসে মন্দিরগুলি দেখে "দক্ষিণ ভারতের এথেন্স" (The Athens of South India) বলে থাকেন। এই মন্দিরগুলির চার পাশে বিরাট আঙ্গিনা, উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং চার পাশে চারটি বিরাট তোরণদ্বার, সেগুলিকে 'গোপুরম্' বলে। এই গোপুরম্গুলিই ১৫০।২০০ ফুট উঁচু হয়। মন্দিরের চার পাশের আঙ্গিনাটি ৮৫০ ফুট × ৭৫০ ফুট লম্বা ও চওড়া এবং গোপুরমের গায়ে ৩৩ কোটি দেবতার মূর্ত্তি খোদাই করা থাকে। মন্দিরগুলির বিরাট আকার ও সূক্ষ্ম কারিগুরী দর্শককে বিস্মিত করে দেয়। মন্দিরগুলির মধ্যে বিরাট অলিন্দগুলি বা মণ্ডপগুলি সার সার থামের উপর দাঁড়িয়ে আছে দেখলে আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে হয়। তা'ছাড়া থামগুলির গায়ের ব্রাকেটে নানাপ্রকার পাথরের ভাস্কর্য্য দেখবার জিনিষ।

মান্দ্রাজের এই বিশেষ একটি ধরণের তৈরী মন্দিরাবলীর মধ্যে ভারতের শেষ উপান্তে সমুদ্রবেলায় অবস্থিত রামেশ্বরমের মন্দিরটি যেন ভারতের দিকে সমুদ্রযাত্রী নাবিকদের পথ নির্দ্দেশ করচে। তা'ছাড়া তাঞ্জোরের সুব্রাহ্মনীয়ের মন্দির, তিনাভেল্লি, মাতুরা, কোরঙ্গনাথ, শ্রীরঙ্গম, গাঙ্গেয়ীকুণ্ড কোলাপুরাম, ত্রিচিনাপল্লির গণেশ-মন্দির, মেরু-পর্ব্বতে তিরুপথির, ভেঙ্কটেশ্বরের মন্দির, কাঞ্জিভারাম প্রভৃতি মন্দিরের বিষয় বলা দরকার। গাঙ্গেয়ীকুণ্ড কোলাপুরামের মন্দিরটি চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্রের (১০১৮—১০৩৩ খৃঃ) রাজধানী ছিল। মাতুরার বিষয় আলেকজান্দারের পরবর্ত্তী গ্রীক্ রাজার দূত মেগাস্থেনিস্ (Megasthenes) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের আমলে খৃঃ পূঃ ৩০০ শতাব্দীতে মোদৌরা পানডিওন (Modoura Pandion) বা পাণ্ড্যদের রাজধানী ছিল বলে উল্লেখ করে গেছেন; এবং এই দক্ষিণের পাণ্ড্যরাজারাই ২০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অগাষ্টাসের (Augustus) সময় গ্রীসে দূত প্রেরণ করেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে উরোপে সেই সর্ব্বপ্রথম দূত-প্রেরণের খবর জানা যায়। মাতুরার এর ঠিক পরবর্ত্তী কালের বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। তারপরে একেবারে ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি-পাঠে জানা যায় যে পাণ্ড্যবংশ তখনো তথায় রাজত্ব কর্ছিলেন। ৯ম খৃষ্টাব্দ থেকে চোলরাজ্যের দখলে এল দক্ষিণ ভারত এবং দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে হয়সালা রাজবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চোলরাজ্যের হ'ল পতন। তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরের বিরাট মন্দিরটির চোলরাজাদের (১০০খ্রীঃ) একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এবং ওরাক্কাদামে বেদমাল্লি মন্দিরটিও ১০ম খৃষ্টাব্দের চোলরাজাদেরই তৈরী।

চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি মালিক কাফুর রাজ্য-বিস্তারের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্য দিয়ে কর্ণাট পার হয়ে মাতুরা আক্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর জয়লাভের চিহ্ন-স্বরূপ রামেশ্বরের মসজিদ আজও বিরাজ করছে। অল্পকাল মুসলিম রাজ্যের অধীনে থাকার পরই দক্ষিণে বিজয়নগরে হিন্দুরাজ্যের অভ্যুদয় হওয়ায় অপর তুই শতাব্দীকাল হিন্দু-সংস্কৃতিতে নানা প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যে গড়ে উঠেছিল। বিজয়নগরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদাবলী, মন্দির প্রভৃতি আজ পর্য্যন্ত তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মোগল-সম্রাট আকবরের মত বিজয়নগরের রাজারা স্থাপত্যপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁদের সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় তাঁদের রচিত স্থাপত্যকলার মধ্যে পাওয়া যায়। বিজয়নগরের সংখ্যাতীত ভগ্নাবশেষের মধ্যে হিন্দু-দ্রাবিড়ী সভ্যতার অনুরূপ বাস-ভবনাদির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে অনেকটা বাঙলাদেশের দোচালার মত একটি ছোট পাথরের সভা-মন্দির আছে। বিজয়নগরের কীর্ত্তি ভারতবর্ষের গৌরব করবার জিনিষ। হ্যাভেল সাহেব বিত্তলক্ষীর মন্দিরটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

মাতুরার মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরটি সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের একটি বিরাট ব্যাপার। মাতুরায় মীনাক্ষীর মন্দিরটি ছাড়া সুন্দরেশ্বরের বিরাট মন্দিরের মণ্ডপে থামের গায়ে সাত ফুট উঁচু তাণ্ডব প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। শ্রীরঙ্গমের মন্দিরটিও দক্ষিণ-স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য চিহ্ন। তা'ছাড়া ত্রিচিনাপল্লীর জম্বুকেশ্বরের মন্দিরটির কথা ব'লে দক্ষিণের স্থাপত্যের কথা শেষ করব। দক্ষিণে এগুলি ছাড়াও ছোট

বড় আরো অসংখ্য মন্দির নানাস্থানে আছে। জম্বুকেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে শান্ বাঁধানো পুষ্করিণী, চার ধারের দোতলা অলিন্দের থামগুলি এবং জলের মাঝখানের ছত্রিগুলি যখন জলের উপর প্রতিফলিত হয়, তখন খুবই সুন্দর দেখায়। সম্প্রতি ভারতের গ্রাম-পাঞ্চায়েতীর বিষয় বিলাতের Royal Society of Artsএ আলোচনা কালে SIR HENRY LAWRENCE বলেছিলেন—"দক্ষিণ ভারতের পুষ্করিণী ও কূপগুলির ব্যয়সাপেক্ষ পাথরের উপর কারুকার্য্যের জন্যে গ্রামগুলিতে কি ভাবে যে ধন সরবরাহ করা হয়েছিল, তা এখন একটি রহস্যবিশেষ। মনে হয়, গ্রামে নিশ্চয় ঋণ-গ্রহণ করবার কোনো একটি বিশেষ পন্থা ছিল, যা এখন একেবারে লোপ পেয়েছে।" (*Journal of the Royal Society of Arts*, Mar. 12, 1937)। স্থপতিরা মানুষের মনকে যে কত দূর সৌন্দর্য্যরসে অভিভূত করতে পারেন, তা' এই সকল স্থাপত্যকলা দেখলে সহজেই বোঝা যায়। দ্রাবিড়ের মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীনতম অনেকগুলি মন্দির এবং ইলোরার কৈলাস মন্দিরটি রাষ্ট্রকূটরাজাদের দ্বারা তৈরী হয়েছিল।

কাশ্মীরী প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ যা' কিছু অবশিষ্ট আছে, তা থেকে দেখা যায় খিলান, থাম প্রভৃতির ধরণ অনেকটা পারস্য ও গ্রীক স্থাপত্যের সংস্কৃতির অনুরূপ। পাঁচ মিশালী হওয়ায় স্থাপত্যকলা যে কিরূপ কদর্য্য হতে পারে, আলেকজান্দারের সঙ্গীরা এই সব প্রদেশেই তার কিছু কিছু নমুনা রেখে গেছেন। এই পাঁচ মিশালী শিল্পের বিষয় ইণ্ডিয়া

কাশ্মীরের প্রাচীন গান্ধার-স্থাপত্য

এ্যাসোসিয়েসনের স্থপতি ওয়েরটেল সাহেব (F. O. OERTEL, F. R. I. B. A) ১৯১৩ সালে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেছিলেন—"মেকলের মতানুসারে আরবী-সংস্কৃতের যায়গায় ভারতীয়দের রোমান ও গ্রীক শেখানোর চেষ্টা সৌভাগ্যক্রমে সফল হয়নি। শিল্প ও স্থাপত্যের বিষয়ও ঠিক ঐ একই কথা খাটে। উরোপেরই লোকসান হবে যদি ভারতীয় স্থাপত্যকে বাদ দিয়ে উরোপীয় স্থাপত্য চালাবার চেষ্টা করা হয়। যদি স্বপ্নেও ভাবা যায় যে সব ঘরবাড়ী এক ছাঁচের হয়ে গেছে—তা'হলে পৃথিবী কতদূর একঘেয়ে হয়ে যাবে সে কথা কেবল চিন্তা করলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।" গান্ধার-স্থাপত্য দেখলেও ঠিক এইরূপই মনে হয়। এইরূপ স্থাপত্যকলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আছে পান্দ্রেথানের গ্রীক্‌ভাবাপন্ন একটি মন্দির, লোদুভের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, নরস্‌স্থানের মন্দির ও মার্ত্তণ্ড মন্দির। পরিহাসপুরের স্তূপের ভগ্নাবশেষ ভেরীনাগের ঝরণার ধারে বাঁধানো হর্ম্ম্যাবলী ও পাটানের মন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুনীরে একটি ছোট্ট মন্দির আছে এবং মানসবল সরোবরে একটি সিঁদুরের কৌটার মত দেখতে ছোট্ট মন্দির আছে। সেটি যেন একটি পিরামিডের মাথায় আর একটি পিরামিড চাপানো, এইভাবে গড়া। তক্ষশিলায় বৌদ্ধযুগে একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তক্ষশীলার নাম মহাভারতে পাওয়া যায়, জন্মেজয় সেখানে সর্পযজ্ঞ করেছিলেন ; গ্রীকরা একেই 'ট্যাকশিলা' (Taxila) বলে গেছেন। চীন-পরিব্রাজক হিয়াঙসাঙের বর্ণনা পাঠে জানা যায়, তিনি

সেখানে স্থ'ধার গিয়েছিলেন। তক্ষশিলার গ্রীক্-ভাবাপন্ন ছাড়া অতি প্রাচীন পৌরাণিক স্থাপত্য এখনো মাটি খুঁড়ে বার করার চেষ্টা হয় নি। সম্প্রতি সালিমার উদ্যানের নিকটে হর্‌বানে কুষাণযুগের স্তূপ ও মন্দির প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পোড়ামাটির কারুকার্য্য ও চিত্র-ফলকগুলি খুবই উচু ধরণের কাজ।

মোগল বাদশাদের রাজ্যের প্রারম্ভকালে নানান্ অশান্তি ও অরাজকতার মধ্যে উত্তর ভারতের সময়গুলি অতিবাহিত হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণের বিজয়নগর, মহীশূর, তাঞ্জোর, মাদুরা; রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানেই স্থাপত্যকলার উন্নতি হয়। তার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

মুসলিম-স্থাপত্য

মোগল-স্থাপত্যের বিশেষত্ব হল তার গম্বুজ, 'ছায্‌জা' (অর্থাৎ ছায়া দেয় যাতে, এইরূপ কার্ণিস) এবং জালিকাটা ঝরোখা; তা'ছাড়া খিলানও চাপা বা সমান্তরাল হয় না, গোল ঘোরানো হয়ে থাকে। এই সব বিশেষত্বগুলি ইরাণ-দেশ থেকে মোগল সম্রাটেরা আমদানী করেছিলেন, কিম্বা এই দেশেই তার সূচনা হয়েছিল এবং তাঁরা কেবল তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁদের স্থাপত্যে—এ বিষয়ে অনেক তর্ক চলে। আমরা অজন্তার প্রাচীন চিত্রের মধ্যে আঁকা হর্ম্ম্যাবলীতে কখনো কখনো এইরূপ 'ছায্‌জা'র ছবি দেখতে পাই এবং ইলোরার ইন্দ্রসভা মন্দিরের সামনে ছোট মন্দিরটিতে, মাদুরার সুন্দরেশ্বরের মন্দিরে, হয়শালেশ্বরের মন্দির প্রভৃতিতে এইরূপ 'ছায্‌জা'র চলন দেখেছি। এইগুলি দেখলে মনে হয়, মোগল বাদশারা দক্ষিণ থেকেই এই বিশেষ পদ্ধতিটি

নিয়েছিলেন। অনেকে আবার বলেন, আমাদের দেশে প্রাচীনকালে গোল খিলান বা গম্বুজের চলন ছিল না; মোগলেরা ইরাণ থেকে আমদানী করেছিলেন এদেশে। এ বিষয়ে হ্যাভেল সাহেব তাঁর 'ভারতীয় স্থাপত্য কলা' পুস্তকে দেখিয়েছেন যে যবদ্বীপে চাঁদিসওয়ার হিন্দু মন্দিরের চূড়াতেও ঐরূপ গম্বুজাকৃতি আছে। দেখিয়েছেন, চাঁদিসওয়ার মন্দির-টির প্ল্যানের সঙ্গে তাজমহলের হুবহু মিল না থাকলেও উভয়ের মধ্যে ছন্দগত একটা মিল বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের চূড়ার উপর গম্বুজটিও (১০০ খৃষ্টাব্দের) দেখলে সেই কথাই মনে হয়। কানিঙহাম সাহেব বলেন যে, খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্বেও হিন্দুরা খিলান রচনা করতে জানতেন এবং তার প্রমাণ কাণপুরের নিকটবর্ত্তী কুষাণ যুগের রচিত ভিতরগাঁওয়ের মন্দিরটি এবং বিজয়নগরের প্রাচীন পাথরের তোরণদ্বার দেখলেই জানা যায়। ঝরোখার জালিকাটার প্রণালীর বিষয়ে প্রমাণ খৃঃ পূঃ ৩০০ শতাব্দীর বরাবরের লোমষ ঋষি গুহার দ্বারের উপর পাওয়া যায়। দ্বারের ঠিক যেখানে জালিকাটা নক্সাটি দেখানো আছে, তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে তাঁরা তখন তার প্রকৃত ব্যবহারও জানতেন। মোগল আমলের জালির কাজের অবশ্য খুবই উন্নতি হয়েছিল, কেননা মহিলাদের পর্দ্দায় রাখার উদ্দেশ্যে এই জালির ব্যবহার স্থাপতাকলার বিশেষ অঙ্গ-স্বরূপ হয়ে পড়েছিল। জালির নক্সাগুলি জ্যামিতিক নিয়মে তৈরী হয় তাই অনেকে জালির কাজ দেখলেই ইরাণ বা আরবের কথা ভাবেন। জ্যামিতিক আরব নক্সাকে ইংরাজীতে এ্যারাবেস্ক (Arabesque) বলে।

ভারতবর্ষে যখন দাসরাজ কুতবুদ্দিন দিল্লীতে মুসলিম-রাজ্যের গোড়াপত্তন করলেন, সেই সময়ে তিনি দিল্লীতে মিনার (১১৯৯ খৃঃ) ও মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন। মসজিদটি তিনি পৃথ্বীরাজ চৌহানের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে তৈরী করেছিলেন। এই ভাবে ভাঙা-গড়ার মধ্যে প্রথম মুসলিম ও হিন্দু-স্থাপত্যের মিলন ঘটল। মিনারটিতে নক্সাকাবীর মধ্যে আরবী হরফ এবং ইরাণী প্রভাব আছে, কিন্তু মসজিদটির মধ্যে কোথাও তার চিহ্ন নেই। তাই পঞ্চম খৃষ্টাব্দেব তৈরী লৌহস্তম্ভটি তার সামনে থাকায়, একেবারেই অসামঞ্জস্য ঠেকে না। এই ভাবেই পরবর্ত্তী মোগল-স্থাপত্য আরম্ভ হয়েছিল কুতবের সময় থেকেই। আজমীর-জয়ের স্মৃতি-স্বরূপ তাঁর রচিত 'আড়াই দিন কি ঝোপ্ড়া' অর্থাৎ আড়াই দিনে তৈরী স্থাপত্যটি আজও আজমীরে বিরাজ করচে। কুতবের সমসাময়িক আলতামাসের কবরস্থানটি এবং বাদাউনের প্রাচীন মসজিদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মোগল-স্থাপত্য। এই সব স্থাপত্যের মধ্যে ভারতের স্থানীয় প্রাচীন কারিকরদেব হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কুতবের পরবর্ত্তী ১৩১০ খৃষ্টাব্দের আলাউদ্দিন খিলিজির তৈবী তোরণদ্বারটি ভারত-ইরাণী স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাতে আরব্য ভাষায় লেখা বয়েৎ ও আলঙ্কারিক কাজ আছে। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে তোঘলক্ বংশের রাজত্বকালে খুব জমকালো বৃহৎ আয়তনের সাধাসিধা ধরণের মস্‌জিদ প্রভৃতি তৈরী হয়েছিল। জৌনপুরের অটলা মসজিদটিও প্রাচীন ভারতীয় ধরণের ও মোগল রীতির সংমিশ্রণে গঠিত একটি স্থাপত্য-

কলা। অটলা দেবীর মন্দিরটিকে ভেঙেই এই মসজিদটিকে তৈরী করা হয়েছিল। পাঁচ তলার মত উঁচু, দু'দিকে চৌকো থামের উপর পদ্মাকার খিলান এবং তাতে ঘুলঘুলি দেওয়া আছে। সামনেটা ঠিক একটি চৈত্য গুহাপথের মত। জৌনপুরের জুম্মা মস্‌জিদের গম্বুজের ছাদের নীচের কারিগরী দেখলেই বোঝা যায় পদ্ম ও আরবী নক্সার সামঞ্জস্যে কি ভাবে সেটি গঠিত হয়েছিল। পদ্মের নক্সাটি দেখলেই যে-কোনো প্রাচীন ভারতের নক্সাকারীর কথাই মনে আসে। মসজিদটি ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে মার্কী রাজ্যের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল এবং এই রাজ্য ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জৌনপুরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। গুজরাটেও অনেকগুলি মোগল-কীর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে বিশেষে উল্লেখযোগ্য আহমেদাবাদ। মালওয়ার (মালবের) মাণ্ডুর প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি বিশেষ দর্শনীয়। এগুলি গুজরাটের সুলতান আহমদ শাহের আমলে ১৪১১ খৃঃ থেকে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। আহমদ শাহের মসজিদে প্রাচীন ভারতীয় রীতির পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। সেখানে মহ্‌জিদ খাঁর তৈরী একটি স্থাপত্যে প্রাচীন ভারতের ছায়া খুব সুস্পষ্ট ভাবে আছে। আবুতু রাজের কবরে হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের মত থামগুলি দেখবার জিনিষ। দক্ষিণাত্য প্রদেশে বিজাপুরে আদিল শাহের কবরটি বেশ মাপ ও প্রমাণের সঙ্গে সুঠামভাবে গঠিত। গম্বুজটি মাপে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় এবং রোমের সেণ্টপিটার্সের গম্বুজটির পরেই উল্লেখযোগ্য। এ দুটি ছাড়া এত বড় গম্বুজ আর কোন দেশে পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত তৈরী হয় নি। সকল দেশের স্থপতির নিকট এটি একটি বিস্ময়কর

ব্যাপার। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি কালে তৈরী হলেও আজ পর্য্যন্ত অটুট ভাবে আছে।

মোগল-স্থাপত্যের মধ্যে নিম্নলিখিত মসজিদ ও সমাধিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাণ্ডুর (মালওয়ার) জুম্মা মসজিদ, গৌড়ের সোনা মসজিদ ও সৈয়দ মবরকের সমাধি, আহমেদাবাদের জুম্মা মসজিদ, রাণী রূপবতীব মসজিদ, সিদি সৈয়াদের মসজিদ (যার খিলানে পাথরের আশ্চর্য্য জালির কাজ আছে), আহমদাবাদের নিকটবর্ত্তী সারখেজের মসজিদ ও সমাধিগুলি। তা'ছাড়া চম্পানীরেব নগীনা মস্‌জিদ, জুম্মা মসজিদ ঢোলকার মসজিদগুলির কথা বলা যায়। তা' ছাড়া গোয়ালিয়রের শেখ মহম্মদ গয়াসের মোকবারা (১৫৬২ খৃঃ) গোল-কোণ্ডার মহম্মদ কোয়ালি কুতবশার মোকবারা (১৬২৫ খৃঃ) বিদারের বাদশার হামাম (স্নানাগার) (১৫০০ খৃঃ) দিল্লীর ফিরোজ শা তোগলকের সমাধি (১৩৪৪ খৃঃ) দিল্লীর আলাই দরওয়াজা (১৩১১ খৃঃ) আলতামাসের কবর প্রভৃতি অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

সাসেরামের 'সুর' রাজ্যের প্রধান সম্রাট সের শাহের যে কবরটি আছে, সেটি মোগল যুগের একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। বিরাট গম্বুজটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে স্থাপত্যটিকে এমন ভাবে রচনা করা হয়েচে যে, মনে হয় যেন একটি পুষ্পের মতই আপনা থেকে মাটির উপর বিকশিত হয়ে উঠেছে। হ্যাভেল সাহেব এটিকে তাজমহলের মতই গৌরব দেন। মোটামুটি স্থাপত্যের ভাবটি যেন বৌদ্ধ যুগের স্তূপের মতই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

তাজমহলের মধ্যে যেমন হাওয়ার উপর গড়া হাল্কা ভাব

আছে, এটিতেও তেমনি একটা স্তূপের মত স্তম্ভিত ভাব পাওয়া যায়।

সম্রাট বাবরের সময়কার স্থাপত্য-কীর্ত্তির মধ্যে সাম্ভালের জুম্মা মসজিদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুমায়ূন রাজ্য-রক্ষার জন্যে অস্থৈর্য্যের অবস্থায় কাল কাটিয়ে গেছেন—বেশীর ভাগ কাল নির্ব্বাসনেই তাঁর অতিবাহিত হয়েছিল। তাই তাঁর আমলের উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি একেবারেই বিরল। তাঁর কবরটি তাঁর বেগম সাহেবা তৈরী করিয়েছিলেন আকবরের সময়।

আকবরের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে (১৫৫৬—১৬০৪ খৃষ্টাব্দ) দেশের অশান্তি অরাজকতা দমন করবার যেমন তিনি চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণও করে গেছেন। তাঁর বিপুল কীর্ত্তি সমগ্র মোগল শাসনের একটি স্বর্ণ-যুগ হয়ে রয়ে গেছে। আকবর ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন এবং সকল ধর্ম্মের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা ছিল এবং সকল প্রকার কারুকলা, স্থাপত্য ও চিত্রকলার অনুরাগী ছিলেন। তিনি বেশীর ভাগ হিন্দু কারিকর ও স্থপতিদের দিয়েই কাজ করাতেন। তাই দেখা যায়, ফতেপুর-সিক্রির স্থাপত্যের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম কৃষ্টির কেমন সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তাঁর সময়। তিনি শিল্পকলায় এত অনুরাগী ছিলেন যে শোনা যায়, সম্রাট স্বয়ং রাজমজুর ও কারিকরদের কাজ নিজে তদারক করে করাতেন। আকবর নিজে তদারক করে ফতেপুর-সিক্রির দুর্গ তৈরী করাচ্ছেন, এইরূপ একটি চিত্র তাঁরই সভা-শিল্পীর আঁকা পাওয়া গেছে। তিনি নিজে একবর্ণ লিখতে পড়তে জানতেন না, কিন্তু নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা

পণ্ডিতদের নিকট লাভ করতেন। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের রেখে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ও শিল্পকলা বিষয়ে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তারই ফলে তাঁর সময়ের স্থাপত্য ও শিল্পকলায় এত প্রাণ ও শক্তি জেগেছিল। তাই তার সৌন্দর্য্য শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোকের কাছে এত সহজে আজও ধরা পড়ে। স্থপতি ওয়েরটেল (Mr. Oertel) বলেছিলেন, "যদি কোনো ছাত্র আমায় জিজ্ঞাসা করেন যে বিশেষ একটি ভারতীয় ধরণের স্থাপত্যকলা শিক্ষা করতে তিনি চান, তবে তাঁকে আগ্রায় এবং ফতেপুর-সিক্রিতে সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত আশ্চর্য্য স্থাপত্য কলা দেখে আসতে বলব।" পৃথিবীর নানা দেশে রাজপ্রাসাদ আছে বটে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটা অবোনেদি ভাব আছে। মনে হয়, বাহ্য-ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্যে অসম্ভব রকমের বড় বড় কামরা, এবং তাতে অনর্থক গিল্‌টি করা কতকগুলি লতাপাতার নক্সা তৈরী করা হয়েছে। আকবরের ফতেপুর-সিক্রির প্রাসাদে ঠিক তার বিপরীত ভাব আনে। মনে হয় যেন ঠিক মানুষেরই বাসের উপযোগী করেই প্রাসাদটি তৈরী করা হয়েছিল। ঘরগুলি, দালান ও আঙ্গিনা প্রভৃতি দেখলে মনে হয়, এইমাত্র বুঝি লোকজনেরা কোথায় চলে গেছে। প্রবাদ আছে, আকবর মাঝে মাঝে নির্জ্জনে উপাসনা করতে ভালবাসতেন। একবার তিনি আগ্রা থেকে ঘোড়ায় চড়ে ঐরূপ নির্জ্জনে উপাসনা করতে বেরিয়েছিলেন, ফতেপুর অঞ্চলে তাঁর ঘোড়াটি ছাড়া পেয়ে হঠাৎ তাঁকে সেখানে ফেলে রেখে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। উপাসনা শেষ হওয়ার পর আকবর দেখেন তাঁর পাশেই তাঁর প্রিয় অশ্বটি এসে দাঁড়িয়ে আছে। এই ফতেপুরে

সেই সময়ে সেলিমচিস্তি নামক একটি সাধু বাস করতেন। এই ফকিরটিকে দেখে আকবর শা অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হন এবং অনেকের অমতে সেই সাধুর আদেশে নূতন রাজধানী ফতেপুর-সিক্রিতে তৈরী করান। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে ঘরবাড়ী তৈরী হতে আরম্ভ হয় এবং ১৫ বৎসরে প্রাসাদাবলী তৈরী শেষ হয়। এই প্রাসাদের তোরণদ্বার বুলান্দ দরওয়াজাটি খুব উঁচু। এরূপ সুন্দর স্থাপত্যকলা পৃথিবীতে খুব কমই আছে। দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের প্রাসাদাবলীর মধ্যে দিল্লী ও আগ্রার দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাসের স্থাপত্য মোগল আমলের খুবই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

জাহাঙ্গীরের কীর্ত্তির মধ্যে আকবরের কবরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটিকে মর্ম্মর প্রস্তরে তৈরী করতে ৪১১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮২৬ টাকা সাত আনা দু পয়সা খরচ হয়েছিল বলে জাহাঙ্গীরের বাদশানামা পুস্তকে লেখা আছে। শাজাহানের তাজমহলের কীর্ত্তি জগতের একটি অমূল্য ও অপূর্ব্ব সম্পদ-স্বরূপ। মনে হয় যেন শ্বেত পাথরের একটি মায়াপুরী কে যেন যাদু দিয়ে গড়েছে, মানুষের হাতের তৈরী কাজ বলে মনেই হয় না। এই অলৌকিক ভাবাপন্ন মর্ম্মর কবরের মর্ম্ম-কথা কত কবি কত চিত্রকর লিখে ও এঁকে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই এবং যুগে যুগে আরো কত অনুপ্রাণনা যোগাবে তা' কে বলতে পারে? শিল্পগুরু শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা "তাজের স্বপ্ন", "শাজাহানের অন্তিম শয্যা" প্রভৃতি ছবিগুলিতে তাজের সৌন্দর্য্যের নূতন পরিচয় পাওয়া যায়। শাজাহান তাঁর নিজের সমাধির জন্যে তাজের বিপরীত দিকে

যমুনার পরপারে কালো কষ্টিপাথরেব একটি তাজ-নির্ম্মাণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একটি তাজ গড়তেই ধন-ভাণ্ডার প্রায় শেষ হয়ে আসায় তাঁর সে বাসনা অপূর্ণই থেকে গেছে।

আওরঙজীবের সময় আবার মোগল-স্থাপত্য নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল। তাঁব কীর্ত্তি কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজার মসজিদটি বিরাজ করচে। কাশীর মত দুইটি মিনার-বিশিষ্ট মসজিদ তিনি যেখানে যেখানে পদার্পণ করেচেন, সেখানেই রেখে গেছেন। এইরূপ তাঁর আমলের মসজিদ লাহোরে, লক্ষ্ণৌএ, ও জয়পুরের অম্বর প্রাসাদের নিকটে আছে। অযোধ্যার নবাব সাফ্‌দারজঙের কবরটি, যেটি দিল্লীতে আছে, সেটি তাঁরই আমলের কীর্ত্তি।

মোগল আমলের স্থাপত্যের আরো অধোগতির বিষয় জানতে হলে লক্ষ্ণৌএ আসতে হয়। দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্যকল্পে আসাফ্‌উদ্দৌলার তৈরী বিরাট ইমামবাড়াটি ছাড়া লক্ষ্ণৌএ দেখবার মত স্থাপত্য কিছুই নেই বল্লেই হয়। আসাফ্‌উদ্দৌলার ইমামবাড়াটিতে যে বিরাট 'হল' আছে, সেরূপ 'হলঘর' উরোপের 'লুভ' 'ভার্সাই' ছাড়া অন্যত্র কোথাও নেই। এটিকে এরূপ ভাবে রচনা করা হয়েছে যে সামান্য একটু শব্দও বেশ স্পষ্ট ভাবে শোনা যায়,—'হলটির' মধ্যে কোনো প্রতিধ্বনি ওঠে না। ইহা (acoustic) ছাড়াও ইমামবাড়ার হলটির অভ্যন্তরের ছাদের গঠনেরও বৈচিত্র্য আছে। কোনো ছাদের গঠন 'খরবুজার' মত, কোনোটি বা বরফি-কাটা, কোনোটি বা সাধাসিধা চ্যাপ্টা ধরণের তৈরী। একই বাড়ীতে এত প্রকারের রকমারী ছাদের নীচের গঠন খিলানের উপর তৈরী করার বিষয় অন্যত্র

কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এটি ছাড়া সানাজাফের ইমামবাড়াটি চাপা গম্বুজের. অনেকটা পানের বাটার মত দেখতে। বৌদ্ধ স্তূপের মত ইমামবাড়াটি মাটির মধ্যে থেকে গজিয়ে উঠেচে বলে মনে হয়।

এখন যেমন রাজপ্রতিনিধিদের ধনী ও রাজন্যদেব গ্রীষ্মাবকাশে শৈলবাসের ব্যবস্থা আছে, আকববের সময়ই তাব গোড়াপত্তন হতে দেখা যায় কাশ্মীরে। বাগ-ই-নগীন ছোট্ট উদ্যানটির ভগ্নাবশেষ এখনো তার সাক্ষ্য দিচ্চে। পরবর্ত্তী বাদশারা সেই আদর্শেরই অনুসরণ করে সুন্দর সুন্দর উদ্যান রচনা করেছিলেন। কাশ্মীরে শাজাহানের সালিমারবাগ ধাপে ধাপে সিঁড়ির মত উঠে গেছে এবং তার মধ্যে ঝরণা, জলাশয়, ফোয়ারা প্রভৃতি দেখলে উদ্যানটি একেবারে একটি স্বর্গপুরী বলে ভ্রম হয়। জাহাঙ্গীরের সময়কার লাহোরেব উদ্যানটি এবং কাশ্মীরের নিসাদবাগ, উদ্যান-রচনার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। মোগল-আমলের হিন্দু রাজাদের উদ্যানের মধ্যে অম্বর প্রাসাদের নিকটস্থ উদ্যানও এককালে একটি দেখবার জিনিষ ছিল, এখন অযত্নে একেবারে ধ্বংস প্রায়। মোগল আমলে গ্রীষ্মাবাসের আরো একটি ব্যবস্থা ছিল। উদ্যানের মধ্যে মাটির নীচে ঘর তৈরী করে তাঁরা কখন কখন বাস করতেন। তাকে 'তয়খানা' বলে। সব বাড়ীতেই 'তয়খানা'র ব্যবস্থা থাকত। লক্ষ্ণৌয়ের প্রাচীন রেসিডেন্সিতে এই প্রকার 'তয়খানা' এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

মোগল উদ্যানেব স্থাপত্য

মোগল আমলের হিন্দু রাজাদের কীর্ত্তির মধ্যে জয়পুরের সহর পত্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়সিংহ যখন

বাঙালাদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তাঁরই এক বাঙালী কর্ম্মচারী পণ্ডিত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য শিল্প-শাস্ত্রানুযায়ী শহরটির নক্সা তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। যদিও প্রাচীন পদ্ধতিতে এই সহরটির গোড়া পত্তন তিনি ক'রে গিয়েছিলেন, কিন্তু আধুনিক সময়োপযোগী সুপ্রশস্ত রাজপথ, ফুটপাথ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির সুব্যবস্থা আছে। সারা সহরটিকে গোলাপী রঙের একটি ছবির মত দেখায়। সহরটিকে ছয়টি সমান ভাগে ভাগ ক'রে তৈরী করা হয়েচে। প্রত্যেক ভাগের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জ্যামিতিক রীতিতে তৈরী। 'হাওয়া মহল' প্রাসাদটি একটি বাঙালাদেশের দুর্গা প্রতিমার চাল চিত্রের মত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে তৈরী। বাকি সব ঘর বাড়ী প্রায় একই ধরণে তৈরী এবং বেশ একটি সামঞ্জস্য মণ্ডিত। সহরটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং বড় বড় তোরণদ্বার আছে। জয়সিংহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং 'কল্পদ্রুম' ও 'সম্রাট' নামক দুখানি গ্রন্থে গ্রহ-নক্ষত্রগণের গতি সম্বন্ধে সবিশেষ গবেষণা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দিল্লী, কাশী, জয়পুর ও উজ্জয়িনীর মানমন্দিরগুলিতে নানা প্রকারের যন্ত্রতন্ত্রের স্থাপত্য চিহ্ন এখনো অটুটভাবে আছে। এই সকল স্থানের মানমন্দিরগুলি তিনি মোগলসম্রাট মহাম্মদ শার পৃষ্ঠ-পোষকতায় তৈরী করিয়েছিলেন বলে জানা যায়। মোগল-যুগের হিন্দু স্থাপত্যের মধ্যে মানসিংহের প্রাসাদ, গোয়ালিয়রে (১৫০০ খৃঃ) এবং আহমেদাবাদের নিকটবর্ত্তী দাদাহরির কূপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য উদয়পুরের, যোধপুরের, বিকানের প্রাসাদাবলীর মধ্যেও তার পরিচয়

জয়পুর ও মোগল-আমলের স্থাপত্য

আছে। আজমীর, যোধপুর, মিবার প্রভৃতি রাজ্যে প্রাচীন-কালের ভাবধারা এখনো অনেকটা বজায় আছে। নতুবা আধুনিক ব্যবসাদারী স্থাপত্যে ভারতের জনপদগুলি একেবারে বিকৃত হ'তে বসেচে।

আধুনিক স্থাপত্য

আধুনিক স্থাপত্যকলার মধ্যে লক্ষ্ণৌয়ের বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, জয়পুরের মিউজিয়াম, কাশীর হিন্দু ইউনিভার্সিটি, কানপুরের কৃষি বিদ্যালয় প্রভৃতির মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন ধারা কতকটা রক্ষা করা হয়েছে। নতুবা সরকারী পূর্ত্তবিভাগের স্থপতিদের দ্বারা তৈরী ঘর-বাড়ীতেই আধুনিক শহরগুলি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কলিকাতা শহরে একমাত্র আধুনিক কয়েকটি নাট্যমন্দিরে দেশী ভাব দেখা গেলেও অতি আধুনিক সোজাসুজি ধরণের স্থাপত্যের দিকে ঝোঁক বেশী দেখা যাচ্চে আমাদের মধ্যে। প্রাচীন স্থাপত্যে নক্সার নানা প্রকারের কারুকার্য্য সময় ও অর্থসাপেক্ষ এবং তাই তা' এখন সকলের পক্ষে দুঃসাধ্য। তথাপি দরিয়াবাদের রাজা রায় রাজেশ্বর বালির মত এবং শান্তিনিকেতনে পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কেহ কেহ দেশী স্থাপত্যকলার জন্যে অনেক চেষ্টা করচেন। হ্যাভেল সাহেব কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটি দেশী ছাঁচে গড়বার জন্যে এবং নব-দিল্লীর স্থাপনার পূর্ব্বে সেখানকার প্রাসাদাবলীও দেশী স্থপতিদের দ্বারা করাবার জন্যে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যদের দিয়ে প্রস্তাব করিয়েছিলেন। কোনো দেশের জাতীয় শিল্পকলা গড়ে তুলতে গেলে তার স্থাপত্যকলার সংস্কার আগে দরকার। ভারতবর্ষের স্থাপত্যকলা যুগে যুগে নানা

সংস্কারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেচে এবং তারই ভিতের উপর আস্থা রেখে যদি নব শিল্পকলা গড়ে ওঠে, তবেই দেশের পক্ষে মঙ্গল। নতুবা কেবল একটা অবোনোদি ও অসামঞ্জস্য ভাবে গড়ে-ওঠা স্থাপত্যকলা দেশের রুচির অন্তরায় হবে। অবশ্য জাতীয় ঐতিহ্যকে বজায় রেখে স্থাপত্যকলা গড়ে তোলবার চেষ্টার মধ্যে একটি ভয়েরও কারণ এই আছে যে অতিরিক্ত উৎসাহে বৌদ্ধের সঙ্গে মোগল এবং মোগলের সঙ্গে দ্রাবিড়ী-স্থাপত্যের উৎকট সংমিশ্রণ সাধনার ব্যর্থ চেষ্টাও হয়ত চলতে পারে।

ভাস্কর্য্যকলা

ছবি যেমন কেবল চোখেই দেখতে হয়, ছোঁয়া যায় না, ভাস্কর্য্যকলা তা নয়। ভাস্কর্য্য একটি জমাট (plastic) জিনিষ, তাকে দেখাও যায় এবং ছোঁয়াও যায়। তার প্রকাশ বিশেষ একটি অংশকে নিয়েই নয়, তার আয়তন চারিদিক থেকে নেড়েচেড়ে আমরা দেখতে পারি। ছবিতে যেমন পারিপার্শ্বিক ও আনুসঙ্গিক নানা প্রকার বস্তু সমাবেশের দ্বারা এবং রঙ প্রভৃতি দিয়ে বক্তব্য বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলা যায়, ভাস্কর্য্যে তা সম্ভব নয়। সেই কারণেই ভাস্কর্য্যকলা খুবই সাধাসিধাভাবে ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। শিল্পীর হাতে যখন যেখানে এসে সেটি শেষ হয়ে গড়ে উঠে—তার উর্দ্ধে যাবার তার উপায় নেই। পাথরের মূর্ত্তিটি স্বয়ং তার বক্তব্যটিকে জমাটভাবে ধরে রাখে, তার আশপাশের আনুসঙ্গিক উপকরণের কোনই প্রয়োজন নেই চিত্রকলার মত। ভাস্কর্য্যে তাই ভাবকে খুবই সুস্পষ্ট ক'রে গড়ে তুলতে হয়, কেননা ছবির মত রঙ ও রেখার হেঁয়ালী তাতে দেওয়া চলে না।

প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগ—খৃঃ পূঃ ৩৩০০

মোহেন-জো-দড়ো এবং হারাপ্পার সিন্ধুতটস্থ প্রাগ-ঐতিহাসিক ভাস্কর্য্যের নমুনার মধ্যেও এই একই কথা খাটে। খৃঃ পূঃ ৩৩০০ বৎসরের সভ্যতার মধ্যেও ভাস্কর্য্য-কলা বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে আছে। সে সময়কার বস্ত্রবয়ন শিল্প, তামার বাসন তৈরীর এবং

পালিস করা চিনামাটির বাসনের উপর চিত্র-বিচিত্র আঁকা ছাড়াও মাটির শিল-মোহরের উপর চিত্রলিপির (pictographic writing) সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের মূর্ত্তি-গড়ার ক্ষমতার বিষয় যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক রেনি গ্রুসে (Rene Grousset) এই প্রাগ্ঐতিহাসিক ভাস্কর্য্যকলার সঙ্গে মৌর্য্যযুগের খৃঃ পূঃ ৩০০ বৎসরের অশোকের আমলের সারনাথের প্রাপ্ত স্তম্ভের গায়ে গড়া হাতী, ঘোড়া, হরিণ প্রভৃতি জন্তুগুলির এবং তার পরবর্ত্তীকালের পাথরের তৈরী মহাবালীপুরমের জন্তু-মূর্ত্তিগুলির তুলনা করে দেখিয়েছেন যে ভারতের ভাস্কর্য্য-শিল্পকলার ধারা কি ভাবে যুগে যুগে এগিয়ে চলেছিল। হারাপ্পায় একটি পোড়ামাটির তৈরী সিলের মধ্যে ধরিত্রীমাতার প্রতিমূর্ত্তি; তা'ছাড়া উপাসকদের প্রতিমূর্ত্তি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসা, একটি তেপায়া মঞ্চাসনে বসা মূর্ত্তি, মাতৃমূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক ছোটখাট ভাস্কর্য্যকলার নমুনাও পাওয়া গেছে।

মোহেন-জো-দড়ো এবং হারাপ্পার প্রাপ্ত মনুষ্য-মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি সবল পুরুষের নিটোল দেহের আদর্শ এবং অপর একটি নারীমূর্ত্তিতে রমণীসুলভ-কমনীয়তা খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। বেশীর ভাগ মূর্ত্তির মাথা, হাত, পা ভাঙ্গা পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে একটি ভগ্ন নারীর মূর্ত্তি হঠাৎ দেখলে গ্রীক ভিনাসের মত অতি-বাস্তব বলে বোধ হয়। এই সকল ভাস্কর্য্যের ভিতর বাস্তব ভাব বেশ থাকলেও মানুষ বা জন্তু যা কিছু গড়া হয়েছে তার দেহের রেখা-ছন্দেরই উপর শিল্পীদের দৃষ্টি ছিল, সেগুলি

আতসচিত্রের (photograph) মত কল্পনাকে খর্ব্ব করেনি। এখানেই হ'ল ভারত-শিল্পের বিশেষত্ব। হারাপ্পার একটি মহিলা-মূর্ত্তির কোমরে হাত দেওয়ার ভঙ্গীটি এবং হাতে কঙ্কন ও চুড়ির বাড়াবাড়ি দেখলে বেশ বোঝা যায়, ভারতবর্ষে এখনো এই ভাবে মেয়েদের অলঙ্কার আধিক্যের অভাব নেই। সিন্ধুতটের সভ্যতার সঙ্গে ভারতের পরবর্ত্তী কালের যে যোগ ছিল, তা' শৈব-উপাসকদের শিব-পূজার উপচার প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের চক্ষে এই আদিম সভ্যতা বর্ব্বরোচিত বলে মনে হলেও পরিবর্ত্তনশীল সময় ও কালের কথা ভাবলে এইগুলির মধ্যে পরবর্ত্তী কালের পরিণতির বিষয় অনেক জানবার ও ভাববার আছে। ভারতের সনাতনী শিল্পের (classical art) পূর্ব্বেকার ইতিহাস এই সকল প্রাগ্-ঐতিহাসিক শিল্পীদের কাজের মধ্যেই আমরা প্রথমে পাই।

শিল্প-শাস্ত্র ও ভাস্কর্য্যকলা

স্থাপত্যের ন্যায় ভাস্কর্য্যকলার বিষয়ও শিল্পশাস্ত্রে অনেক কিছু জানা যায়। শুক্রনীতি, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি ছাড়াও নেপালে প্রাপ্ত দশতাল-ন্যায়-পরিমণ্ডল-বুদ্ধ-প্রতিমা-লক্ষণ এবং সম্বুদ্ধ-বশিষ্ঠ-প্রতিমা-লক্ষণ-গ্রন্থেও ভাস্কর্য্যকলার বিষয় অনেক তথ্য জানা যায়। ভাস্কর্য্যকলার প্রাচীন শিল্পীরা রূপ-লক্ষণ, দেহ-লক্ষণ, মান-প্রমাণ, ভঙ্গী প্রভৃতির বিষয় খুঁটিনাটি সকল বিষয় দেখতেন। মৎস্যপুরাণে বিধান আছে—সত্যযুগে সোনার, ত্রেতাযুগে রূপার, দ্বাপরে তামার এবং কলিযুগে মিশ্রধাতুর মূর্ত্তি-গড়ার। নানা প্রকারের আসন ও মুদ্রার বিষয় পরবর্ত্তী চিত্রকলা-অধ্যায়ে বলা

হয়েছে।' ভাস্কর্য্যে সাধারণতঃ হস্ত-ভঙ্গী বা মুদ্রা ১৫ প্রকারের দেখা যায়। যথাঃ বরদ, অভয়, কথকহস্ত, সূচীহস্ত, তর্জ্জনী, কটি-অবলম্বিত, দান, অঞ্জলিহস্ত, বিস্ময়, জ্ঞান, যোগ, ধর্ম্মচক্র (বৌদ্ধ) বর্দ্ধ (বৌদ্ধ) সমাধি (বৌদ্ধ) ভূমিস্পর্শ (বৌদ্ধ)। এ-গুলির মধ্যে বরদ ও অভয় মুদ্রারই চলন বেশী দেবদেবীর মূর্ত্তিতে। (এই ধরণের কয়েকটি মুদ্রা চিত্রে দেওয়া গেল) তা'ছাড়া নানাপ্রকারের অস্ত্র আছে। যথাঃ চক্র, গদা, অঙ্কুশ, শঙ্খ, পাশ, টঙ্ক, ধনুক, বাণ, অগ্নি, বজ্র,

(১) অভয়মুদ্রা (২) দানমুদ্রা (৩) অঞ্জলিহস্ত

খড়্গ, শূল, শক্তি, পরশু, মুষল, হল। বাদ্যের মধ্যে ডমরু, শঙ্খ, ঘণ্টা, বীণা ও মুরলীই দেখা যায়। দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে কমণ্ডলু, দর্পণ, অজপাত্র, শ্রুক বা শ্রুভ, কপাল (নরমুণ্ড), অক্ষমালা (রুদ্রাক্ষ), পদ্ম দেখা যায়। কালভেদে ধ্যানী বুদ্ধেরও পাঁচ প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। (১) বিরোচন বুদ্ধ—এঁর বর্ণ শ্বেত এবং হস্তমুদ্রা রথচক্রমুদ্রা এঁর কাল হেমন্ত। (২) রত্নসম্ভব বুদ্ধ—বর্ণ হলুদ, বরদমুদ্রা—বসন্ত-কাল। (৩) অমিতাভ বুদ্ধ—বর্ণ লাল, সমাধিমুদ্রা—গ্রীষ্মকাল। (৪) অমোঘসিদ্ধি বুদ্ধ—বর্ণ সবুজ, অভয়মুদ্রা—

বর্ষাকাল (৫) অক্ষোভবুদ্ধ—বর্ণ নীল, ভূমিস্পর্শ মুদ্রা—শীতকাল বোঝায়। এইভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের খুঁটিনাটি

(৪) কথকহস্ত (৫) বরদহস্ত (৬) বিস্ময়হস্ত

(৭) অস্তব-ধ্যান মুদ্রা (৮) স্চিহস্ত

(৯) ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন মুদ্রা (১০) লোলহস্ত

অবলম্বন ক'রে সকল দেবদেবীর বিশেষভাবে বিধান শিল্প-শাস্ত্রে দেওয়া আছে। রূপদক্ষ শিল্পীরা সেই সব শাস্ত্র-মত

জেনে-শুনে তবে মূর্ত্তি গড়তেন। তাই দেখা যায়, ভারতবর্ষের যে কোনো স্থানের একই দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বেশ

(১১) যোগমুদ্রা

(১২) কর্ত্তরি মুদ্রা

(১৩) কটি-অবলম্বিত হস্ত

(১৪) জ্ঞানমুদ্রা

(১৫) ভূমিস্পর্শ মুদ্রা

একটা আগাগোড়া ঐক্য আছে। এই ভাবেই ভারতের

সনাতনী (classical) ভাস্কর্য্যকলা গড়ে উঠেছিল।

ভারতের সনাতনী (classical) ভাস্কর্য্যের যুগ বুদ্ধের জীবিতকাল পর্য্যন্ত ধরা যেতে পারে। ঠিক তার আগেকার নিদর্শন একমাত্র পূর্ব্বোল্লিখিত হারাপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োতেই যা কিছু পাওয়া গেছে; তা' ছাড়া লৌরিয়া নন্দনগড়ের সোনার একটি দেবীমূর্ত্তি ছাড়া বেশী কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। বুদ্ধের সময়কার

ভারতের সনাতনী ভাস্কর্য্য (Classical-period) খৃঃ পূঃ ৫৪৪-২৬৫।

পৌরাণিক বা সনাতনী জনপদগুলির মধ্যে চম্পা, মগধ, কাশী কোশল, বিজয়ী, মল্ল, চেদী, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গান্ধার, কম্বোজ, কৌশাম্বী, পাটলিপুত্র, বৈশালী, নালন্দা, পাবা ও কুশীনগর, রাজগৃহ, হস্তিনাপুর শ্রাবস্তী প্রভৃতির বিষয় ইতিহাস-পাঠে জানা যায়। এ-গুলি ছাড়া আরো অনেক জনপদের নাম জানা থাকলেও ঠিক কোন্‌খানে সে-গুলি ছিল, এখন স্থান নির্ণয় করা যায় না। এই সব প্রাচীন সহরের ও প্রদেশের মধ্যে ভাস্কর্য্যকলার নিদর্শন এখন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঠিক পুরাতনী বা সনাতনী (classical) শিল্পের নিদর্শন এখন দুর্লভ। এই সব জনপদের নাম রামায়ণ মহাভারতে উল্লেখ থাকলেও সে সময়কার ভাস্কর্য্য-চিত্রে পৌরাণিক ঘটনার কোনোই খোঁজ পাওয়া যায় না। রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধীয় ভাস্কর্য্যকলা তার অনেক পরে সপ্তম খৃষ্টাব্দীর শেষ-ভাগে দেখা দিয়াছিল। কৌশাম্বী ও মথুরার রাজধানী শূরসেন প্রদেশে যে সকল পোড়া মাটির মূর্ত্তি-চিত্র পাওয়া যায়, সে-গুলি থেকে তখনকার কাজের উৎকর্ষের বিষয় কতকটা অনুমান করা যায়। এই সকল

স্থানে পোড়া মাটির খেলনা ও চিত্রফলক ছাড়াও পরবর্ত্তী যুগের রেলিঙে খোদাই করা ভাস্কর্য্য প্রভৃতিও কিছু কিছু পাওয়া গেছে। মহাভারত-বর্ণিত পরীক্ষিতের চার পুরুষ পরে পাণ্ডব-বংশেই উদয়ন রাজা জন্মেছিলেন এবং তাঁরই রাজধানী কৌশাম্বীতে পরিত্যক্ত মাটির ঢিবির মধ্যে যা' অল্প-স্বল্প মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া যায়, তারই উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। এখনো এ সব স্থান অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে। এখানেই কণিষ্ক রাজের আমলের বিরাট আকারের দাঁড়ানো বুদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। কৌশাম্বীতে অধিসীমকৃষ্ণ নামে এক রাজা রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ের অনেক কীর্ত্তি দেখা যায়। এলাহাবাদ-মিউনিসিপ্যাল-যাদুঘরে অনেক উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্যের উদাহরণ রাখা আছে। অধিসীমকৃষ্ণ সে সময় ভারতের একটি প্রাচীন ইতিহাস-লেখার চেষ্টা করেছিলেন। অনেকে বলেন, রামায়ণ মহাভারত তাঁর আমলেই প্রথমে পুঁথিতে লেখা হয়; পূর্ব্বে মুখে মুখেই প্রচারিত হতো। এই সময় মগধে খৃষ্টের জন্মাবার চার শত বৎসর পূর্ব্বে নন্দ রাজাদের অধীনেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যকলার এবং বিবিধ কারু-চারুশিল্পের একটি মধুচক্র গড়ে উঠেছিল।

ভারতের ভাস্কর্য্যকলাকে চুল চিরে ভাগ করা চলে না। কেননা, এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে এক যুগ থেকে অন্য যুগে ঐতিহ্যের যোগে এমন একটা ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল যে কোন্‌টিকে যে কোন্ কোঠায় ফেলা হবে, তা' বলা শক্ত। ভারতীয় ভাস্কর্য্যকলাকে আমরা নিম্নলিখিত-ভাবে ভাগ করতে পারি।

বৌদ্ধ	১।	মৌর্য্য ও কুষাণ
	২।	গান্ধার
	৩।	তিব্বতী ও নেপালী
	৪।	লঙ্কা দ্বীপ
হিন্দু	৫।	গুপ্ত যুগ
	৬।	দ্রাবিড়ী বা দক্ষিণী
	৭।	গৌড়ীয়
	৮।	উড়িষ্যা
জৈন	৯।	শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী
বৃহত্তর ভারত	১০।	মঙ্গোলিয়া বা মধ্য এসিয়া
	১১।	শ্যাম } চাম, খামির, মোন
	১২।	কম্বোজ } চাম, খামির, মোন
	১৩।	যবদ্বীপ
	১৪।	বোর্ণিও দ্বীপ ও সুমাত্রা দ্বীপ
	১৫।	বালী দ্বীপ
	১৬।	ব্রহ্মদেশ

ভারতীয় ভাস্কর্য্য প্রধানতঃ দু'রকমের পাওয়া যায়। একটি হ'ল যা প্রতিমারূপে পূজা হতো এবং দ্বিতীয়টি যা মন্দিরের গায়ে খোদাই-করা মন্দিরের শোভা-বর্দ্ধনের জন্যে হতো। মন্দিরের গায়ে সাধারণতঃ রাহু, কেতু, কুবের, ইন্দ্র, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবতা ও উপদেবতাদের মূর্ত্তি দেওয়া হতো মন্দিরের রক্ষক-দেবতা হিসাবে। দ্বারদেশে মাঙ্গলিক দেবতা গঙ্গা ও যমুনার মূর্ত্তি থাকত; আবার অনেক সময় তারই মধ্যে মন্দির-প্রতিষ্ঠাকারী রাজন্যদের প্রতিমূর্ত্তি গড়বারও রীতি ছিল। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরে তার অনেক প্রমাণ

পাওয়া যায়। আমরা পরে তার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। ভারতের পুরাতনী (classical) ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন কুষাণ, * মৌর্য্য, কণিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি বংশের রাজাদের আমলের তৈরী মন্দিরগুলিতে সমগ্র ভারতবর্ষে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। সারনাথ, অমরবতী, ভরহুৎ, সাঁচী, মথুরা ও গণ্টুর (মান্দ্রাজ) প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন মৌর্য্য, কুষাণ ও কণিষ্ক-রাজের আমলের ভাস্কর্য্যের বহু নমুনা দেখা যায়। মধ্য ভারতে নাচ্‌না-কাট্‌রা, বিওয়া, ছত্রপুর প্রভৃতি বুন্দেলখণ্ডের নানাস্থানে গুপ্তবংশীয় রাজাদের সময়কার পাথরের মূর্ত্তি অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে। অশোকের সময়-কার সাঁচী, বুদ্ধগয়া, ভরহুৎ প্রভৃতির রেলিঙে খোদিত ভাস্কর্য্য-চিত্র (Bas-relief) দেখলে বেশ বোঝা যায় যে এ-গুলির উৎকর্ষের কারণ তারও পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পীদের প্রচেষ্টা। এখন অবশ্য তাঁদের কাজ বেশীর ভাগ অনাবিষ্কৃত অবস্থায় মাটির গর্ভে থেকে গেছে। খুব অল্পদিন পূর্ব্বে তাই সিন্ধু-নদের তটভূমিতে মোহেন-জো-দড়ো এবং হারাপ্‌পার নিদর্শনগুলি পাওয়া গেল। কে বলতে পারে আরো কত লুক্কায়িত আছে মাটির তলায়!

---

* কুষাণ রাজাদের বিষয় তাঁদের প্রবর্ত্তিত প্রাচীন মুদ্রায় গ্রীক ও ব্রাহ্মী-হরফে লেখা লিপি থেকে জানা যায়। (১) কদপিস্স (প্রথম) খৃঃ পূ ৩০ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে রাজত্ব করেছিলেন এবং তিনি কাবুলে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন বলে জানা যায়। (২) দ্বিতীয় কদপিস্স ৪০-৭০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন এবং কাশী পর্য্যন্ত জয় করেছিলেন। (৩) কণিষ্করাজ ৭০-১০২ খৃষ্টাব্দে, (৪) হুবিষ্করাজ ১০২-১৩২ বাসুদেব ১৩২-১৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন।

অশোকের রেলিঙগুলিতে বুদ্ধের জীবনী ও বাণীর সকল ইতিহাস খোদাই ক'রে গড়া আছে। প্রাচীনতম ভাস্কর্য্যের মধ্যে মথুরায় প্রাপ্ত কুষাণরাজ কণিষ্ক ও কদপিস্থের দুটি বিরাট প্রতিমূর্ত্তির (Heroic size) কথা বলা যেতে পারে। এ দুটি ১২০ খৃষ্টাব্দের তৈরী বলে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন। কণিষ্ক বংশের আরো একটি বিরাট প্রতিমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ মথুরায় পাওয়া গেছে এবং তা'তে যে লিপিটি আছে, তা থেকে সেটিকে কাস্থানা (Chestna) বা কৃষ্ণা রাজের (৮০-১১০ খৃষ্টাব্দের) প্রতিমূর্ত্তি বলে জানা যায়। কদপিস্থের মূর্ত্তিটির নীচে খোদিত লিপিতে 'দেবকুল', 'উদ্যান' ও 'সরোবরের' উল্লেখ আছে। কবি ভাস তাঁর 'প্রতিমা' নাটিকায় এইরূপ দেবকুলে পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিমূর্ত্তি রাখার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে পূর্ব্বপুরুষের সঠিক প্রতিকৃতি-চিত্র গড়া ভারতের একটি প্রাচীন পদ্ধতি। পেশওয়ারে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের খননকার্য্যে সর্‌হি-ভালোলের (Shari-Bahlol) প্রতিকৃতি-প্রতিমূর্ত্তির অনেক উদাহরণ পাওয়া গেছে। মান্দ্রাজ মিউজিয়মে রক্ষিত রাজা গোতমীপুত্র শতকর্ণীর প্রতিমূর্ত্তিটি অমরাবতী স্তূপের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। সেটি দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের বলে জানা যায়। এটিকে দক্ষিণের প্রতিকৃতি-মূর্ত্তির মধ্যে প্রাচীনতম ব'লে ধরা যেতে পারে।

মিসর ও আসিরিয়ার রাজাদের বিরাট মূর্ত্তিগুলির মধ্যে যেরূপ একটি গুরুগম্ভীর ভাব আছে, ভারতবর্ষের বিরাট প্রতিমূর্ত্তিগুলির মত দৃঢ় ঋজুভাব সে-গুলিতে নেই। এ-গুলিতে আছে রেখার সাবলীল ভঙ্গীর মধ্যে গুরুত্ব। ঠিক এই

ধরণের প্রাচীন মূর্ত্তি বেসনগরে যেটি পাওয়া গেছে সেটিকে যক্ষিণী-মূর্ত্তি বলা হয় এবং এটি খৃঃ পূঃ ১০০ বৎসরের ব'লে অনেকে অনুমান করেন। ঠিক এরই সমসাময়িক পাটলি-পুত্রে (পাটনায়) অপর একটি চামরধারী যক্ষিণী-মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। এটি ছাড়াও পাটলিপুত্রের প্রতিষ্ঠাতা শিশু-নাগরাজ উদয়ন-অজ ও নন্দীবর্দ্ধনের দুটি বিরাট দাঁড়ানো মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। এ দুটি যথাক্রমে খৃঃ পূঃ ৪৮৪-৪৬৭ এবং খৃঃ পূঃ ৪৪৯-৪০৯ অব্দের বলেই জানা যায়। মথুরায় পূর্ব্বোল্লিখিত কণিষ্ক ও কদপিস্মের মূর্ত্তি ছাড়াও কুণিক অজাত-শত্রুর একটি অতি প্রাচীন বিরাট প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গেছে। এটিকেও খৃঃ পূঃ ৫১৫ অব্দের বলে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা নির্দ্ধারিত করেছেন। এই সকল প্রতিমূর্ত্তিগুলির লিপি অতি প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি, তাই সে-গুলির সঠিক পাঠোদ্ধার হওয়া কঠিন। অজাতশত্রুর রাজধানী ছিল রাজগৃহে (রাজগিরে) কিন্তু তাঁর প্রতিকৃতিটি পাওয়া গেছে মথুরায়। তাঁর মথুরা অভিযানেই হয়ত জয়-চিহ্নস্বরূপ সেটিকে ওখানে তখন গড়া হয়েছিল। মথুরায় অজাতশত্রুর পরবর্ত্তী দর্শকরাজের ও ভাঙা প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গেছে। এটি একটি গোল মোড়াতে বসা প্রতিমূর্ত্তি এবং খৃঃ পূঃ ৪৭০ অব্দের ব'লে অনুমিত। এটি ছাড়া পূর্ব্বোল্লিখিত অন্য সকল মূর্ত্তিই দাঁড়ানো-ভাবে তৈরী। উল্লিখিত অন্য সকল মূর্ত্তিগুলি মৌর্য্যযুগেরও আগেকার এবং এ-গুলি রাজাদের জয়-ঘোষণার জন্যেই তৈরী হতো। পুণা ও নাসিকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নানঘাটের গুহার গায়ে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভের ভাস্কর্য্য দেখতে পাওয়া যায়। ভাস্কর্য্যচিত্রে রাজা, রাণী, রাজার পিতা এবং তিনটি

রাজপুত্রের সারি সারি প্রতিমূর্ত্তি আছে। এ-গুলির নীচে যে শিলালিপিটি আছে তা থেকে জানা যায় যে শতকর্ণী রাজা সিমুক (সম্মুখ ?) শতবাহনের মৃত্যুর পর তাঁর রাণী নয়নিকা দেবী এই মূর্ত্তিগুলি গড়িয়েছিলেন। কার্লী ও কান্হাবা গুহার সামনে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি আছে, সে-গুলি যে অন্ধ্র-রাজদেরই প্রতিকৃতি তা এখন জানা গেছে। কোনডেনেব চৈত্যগুহায় একটি ধ্বংসপ্রায় প্রতিমূর্ত্তির নীচে লেখা আছে যে 'কন্নর' (কৃষ্ণের) ছাত্র 'বালকের' তৈরী। উড়িষ্যায় প্রাচীনতম গুহা-গৃহে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে দাতাদের প্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে। এই সকল গুহাগুলিব প্রতিকৃতি-চিত্রে দেখলে বোঝা যায় যে ভাস্কর্য্য কলায় প্রতিকৃতি গড়ার চলন খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই ভারতবর্ষে ছিল। এগুলিই কুষাণ রাজাদেব আমলেব ভাস্কর্য্যকলার কীর্ত্তি-ঘোষণা করে। রাজপুতানায় রাজাদের মৃত্যুর পর অস্থির উপর ছত্রি স্থাপনার প্রথা আছে। বাঙলাদেশেও মঠ বা মন্দির স্থাপনা করা হতো বলে জানা যায়। বিকানীরে রাজাদের সমাধি মন্দিরকে (ছত্রিকে) 'দেবগড়' বলে। দক্ষিণের ভাস্কর্য্যকলায় রাজাদের প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়, তার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

সনাতনী বা পুরাতনী (classical) ভাস্কর্য্যকলার মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাবই বেশী দেখা যায়। যদিও ভরহুতে রেলিঙের গায়ে গজ-লক্ষ্মী, শ্রীদেবতা প্রভৃতি বিরল নয়। মথুরা ও গান্ধার ভাস্কর্য্যকলায় কুবের, দেবতা, যক্ষ, নাগরাজ ও ইন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি আছে। বৌদ্ধেরা এ-গুলিকে বুদ্ধদেবের প্রিয় বাহন বা উপদেবতা হিসাবেই দেখিয়েছিলেন। তা'ছাড়া মহাযান

বৌদ্ধধর্ম্মে ক্রমশঃ হিন্দু দেবদেবীর স্থান হয়েছিল। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে দেবতার প্রতিমা গড়াব রীতি ছিল না। অতি প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থ ঋক্‌বেদে দেবতাদেব প্রতিমূর্ত্তিব বর্ণনা আছে। তা'ছাড়া একমাত্র খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের পাণিনি ও পাতঞ্জলিতে দেব প্রতিমার বিষয় উল্লেখ আছে। কিন্তু ঠিক সে সময়কার খুব কমই হিন্দু রাজাদের প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

গান্ধার-ভাস্কর্য্যেই প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গেছে। তার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ কীর্ত্তিগুলিতে অর্থাৎ সাঁচী ভরহুৎ প্রভৃতিতে বুদ্ধের স্থলে বোধিবৃক্ষ, ধর্ম্ম-চক্রেব ও পদচিহ্নেবই চিত্র দেখা যায়। বোধিদ্রুমের সামনে ভক্তদেব ছবি বেশী দেখা যায়। অবশ্য এই ভক্তদের মধ্যে যোগাসনে বসা বুদ্ধের মত ধ্যানী উপাসকেব ছবিও আছে। তাদের কানের কুণ্ডল ও মাথার শিবস্ত্রাণ খুলে দিলে ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তির সঙ্গে কিছুমাত্র অমিল হয় না। বুদ্ধদেবেব প্রতিমূর্ত্তির সূচনা যে এই চিত্রগুলিতেই হয়েছিল, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নয়। গোড়ায় যে ধর্ম্ম, চক্র ও সঙ্ঘের পূজা হতো তারও সূচনা হয়েছিল ব্রাহ্মী হরফের য, ব, ল, ব এবং ন এই কটিকে নিয়েই। বৌদ্ধেরা যথাক্রমে মরুৎ,
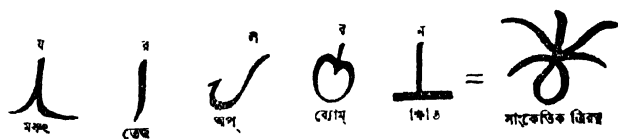
তেজ (অগ্নি) অপ্ (জল) ক্ষিতি ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের বীজ বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই পঞ্চভূতকে জয় ক'রে তবে বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হতে পারা যায় এবং

তাই ধর্ম্ম, বুদ্ধ, সঙ্ঘ নিয়ে ত্রিত্ববাদের (trinity) সৃষ্টি হয়েছিল।

চূড়ায় ত্রিশূল ধর্ম্মসূচক, মধ্যে চক্র বুদ্ধবোধক এবং নীচে সঙ্ঘ অর্থাৎ একত্রে বাস করা বা ঐক্যসূচক চিহ্ন বোঝায়। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি-পূজা বৌদ্ধ ধর্ম্মেও
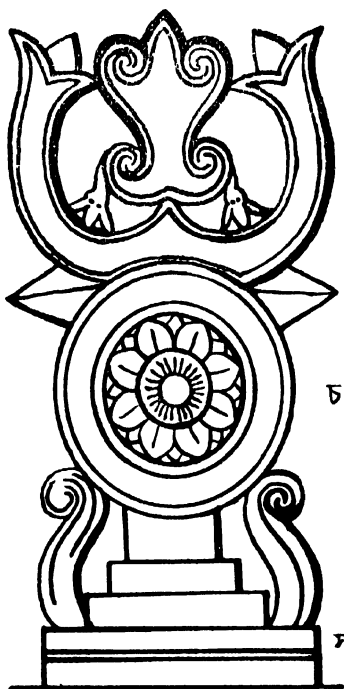
প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। তাই বুদ্ধের মৃত্যুর কিছুকাল পরে প্রায় ২০০ বৎসর হীনযানী বৌদ্ধদের দ্বারা তাঁর মূর্ত্তি গড়া বা পূজা হয় নি। ডাঃ কুমারস্বামী তাঁর The Origin of the Buddha Image নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে কুষাণ যুগের

শিল্পীরা প্রাচীনতম মূর্ত্তি-চিত্র-প্রণালীকে অবলম্বন করেই বুদ্ধের প্রতিকৃতি প্রথমে গড়েছিলেন এবং তার জন্যে গ্রীক সভ্যতার আবহাওয়া বা শিক্ষার প্রয়োজন হয়নি তাঁদের।

মথুরাতে কুষাণযুগের যে বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি পাওয়া গেছে, তাতে তাঁর কৌপীন বস্ত্রের ভাঁজগুলি হঠাৎ দেখলে গ্রীক-ধরণের মূর্ত্তির অনুরূপ মনে হওয়ায় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা গ্রীক-প্রভাবের কথা মনে করেন। কিন্তু সম্প্রতি শিল্প-রসিক অরুণ সেন মহাশয় দেখিয়েছেন যে গ্রীক-মূর্ত্তির কাপড়ের ভাঁজ এবং এই মথুরায় প্রাপ্ত কুষাণ-যুগের বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তির কাপড়ের ভাঁজের আসলে কোনোই মিল নেই। এটিতে আলঙ্কারিক রীতিতে (decorative) খাঁজ কেটে কাপড়ের ভাঁজ দেখানো হয়েছে আর গ্রীক শিল্পীরা প্ল্যাস্টারে কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে মানুষের গায়ে জড়িয়ে রেখে তারই হুবহু নকল করার দ্বারা স্বাভাবিক ধরণের ভাঁজগুলিকে গড়ে তুলতেন। মথুরার বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে আলঙ্কারিক রীতিতে এবং গ্রীকগান্ধার বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে স্বাভাবিকভাবে কাপড়ের ভাঁজ-গুলির গঠন দেখানো হয়েছে। মথুরায় প্রাচীনতম যে বুদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া গেছে তার চেয়ে পুরাতন গান্ধারের বুদ্ধ-মূর্ত্তি ছাড়া আর কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি।

বৌদ্ধযুগে হিন্দুদেবদেবীর বেশী কিছু চিহ্ন পাওয়া না গেলেও তখনকার রাজাদের প্রচলিত মুদ্রায় দেবদেবীর পরিচয় আছে। মগধের অগ্নিমিত্র রাজার আমলের (খৃঃ পূঃ ১০০) প্রচলিত মুদ্রায় অগ্নিদেবতার ছবি উৎকীর্ণ আছে। তা'ছাড়া কুষাণ-রাজাদের দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের প্রচলিত মুদ্রায় চতুর্ভুজ শিবের ছবি আছে। এ থেকে ধরা যেতে পারে যে

তখনকার সময়ের প্রতিমা-প্রতিমূর্ত্তি লুপ্ত হয়ে গেলেও তার চলন তখন থেকেই ছিল। এই সময়কার স্বামী-ব্রাহ্মণ্য-যুদ্ধেয়-রাজের ২য় খৃষ্টাব্দীর তৈরী মুদ্রায় ষড়ানন কার্ত্তিকেয়ের ছবি উৎকীর্ণ আছে। সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রাতে কমলাসীনা লক্ষ্মীর ছবি আছে।

ভারতবর্ষে নানাস্থানে প্রাচীনকালের মুদ্রাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে পারস্য ও গ্রীকমুদ্রাও ভূগর্ভ থেকে আমরা পাই। গচ্ছিত তহবিল মাটিতে পুঁতে রাখাই তখন প্রথা ছিল। তাই দেশবিদেশের পণ্যের আদানপ্রদানের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে আনীত এই সকল মুদ্রাগুলির দ্বারা সঠিক কোনো ইতিহাসের পথ আবিষ্কৃত হওয়া শক্ত। লক্ষ্মী চঞ্চলা তাই প্রাচীনকালেও দেশ-বিদেশ থেকে বাণিজ্যসূত্রে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা এদেশে চালান আসা অসম্ভব নয়।

পাহাড়ের গা কেটে তৈরী বম্বে অঞ্চলের ভিক্ষুদের বর্ষা-বাসের নিমিত্ত গুহাহর্ম্ম্যগুলির মধ্যে সনাতনী ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন আছে। এগুলির মধ্যে ভাজার গুহাগুলিতে ২য় খৃষ্টাব্দীর, বেদশায় খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর, নাসিকে দ্বিতীয় শতাব্দীর, কার্লেতে দ্বিতীয় শতাব্দীর তৈরী অনেক ভাস্কর্য্যকলা আছে। এ-গুলিতে বুদ্ধের এবং বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ে ভাস্কর্য্যচিত্রই প্রধান। বিজাপুরের ৫ম খৃষ্টাব্দীর তৈরী বাদামী গুহাটিতে হিন্দুভাস্কর্য্যের অনেক নিদর্শন—মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা-মূর্ত্তি, নরসিংহ-মূর্ত্তি, বিষ্ণুর ভোগানন্দ-মূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক প্রতিমূর্ত্তিই আছে। সে-গুলি অনেকটা ইলোরার কৈলাসমন্দিরের হিন্দু-ভাস্কর্য্যের মত। মথুরায় প্রাপ্ত পদ্মাঙ্কিত রেলিঙে অনেক ভাস্কর্য্যকলার পরিচয় পাওয়া

যায়। একটি থামের গায়ে গড়া ভাস্কর্য্যচিত্রে তত্বতাবাসী থালের উপর ঝুড়ি ঢেকে একটি মহিলা সহাস্য বদনে চলেচেন সন্দেশ বহন করে এইরূপ দেখানো হয়েচে। মহিলার মুখের আনন্দরেখা পাথরের মূর্ত্তিটিতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেচে। আর একটি রেলিঙের থামে একটি মেয়ে পিছু ফিরে পুষ্প-চয়নে রত দেখানো হয়েচে। এগুলির গঠন-লালিত্য ও ভঙ্গী দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। তার শারীবতত্ত্ব-হিসাবে (anatomy) দোষগুণের কথা মনেই আসে না। মথুরার এই চিত্র-ভাস্কর্য্যের মধ্যে একটিতে কণিষ্কের সময়কার শিলালিপি আছে। মথুরায় প্রাপ্ত এইরূপ একটি কুষাণ-যুগের রেলিঙের চিত্রে বুদ্ধদেবের নিকট ইন্দ্রশিলায় দেবরাজ ইন্দ্রের শুভা-গমনের ছবি গড়া আছে। সনাতনী উন্নতিশীল ভাস্কর্য্যশিল্পের নমুনা দেখতে হ'লে সারনাথের ২য় খৃষ্টাব্দীর তৈরী বিরাট (দাঁড়ানো) বোধিসত্বের মূর্ত্তিটি এবং ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দের অবলো-কিতেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি দেখতে যেতে হয়।

ভরহুৎ
খৃঃ পূঃ ২০০

উত্তর ভারতে যখন সঙ্ঘরাজদের খুব প্রতিপত্তি ছিল, তখন খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দের ভরহুতের স্তূপ, রেলিঙ, তোরণ প্রভৃতি নির্ম্মাণ হয়েছিল। ভরহুতের ভাস্কর্য্যে নানা প্রকার বৌদ্ধ জাতকের ছবি এবং যক্ষ, যক্ষিণী, নাগরাজ প্রভৃতি উপ-দেবতাদের ছবি আছে। এগুলির বর্ণনা ভাস্কর্য্য-চিত্রের গায়ে শিলালিপিতে দেওয়া আছে। শিলালিপি থেকেই জানা যায় যে স্তূপ, তোরণ ও রেলিঙগুলি তৈরী করতে ধনভূতি রাজার ধনভাণ্ডার একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল। ভরহুতের শিল্পে প্রাচীন-ভারতীয় ধারারই সন্ধান পাওয়া যায়।

উরোপের অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এ-গুলির মধ্যে ইজিপ্ত বা আসিরিয়ার প্রভাব অনুভব করেন। কিন্তু বৌদ্ধস্তূপ বা রেলিঙের অনুরূপ কাজ সে সব স্থানে কিছুই পাওয়া যায় না। ভরহুতের রেলিঙের মাঝে মাঝে পদ্মের মধ্যে যক্ষ ও যক্ষিণীর মূর্ত্তি আছে। ঘণ্টার-মালা-সাজানো এক প্রকার বিশেষ নক্সাকারী কাজ দেখা যায়, যা পরবর্ত্তী অনেক ভাস্কর্য্যে আছে। ভরহুতের ভাস্কর্য্যের বর্ণনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় বুদ্ধের জীবনীর চিত্র থেকে নিয়ে তার শেষ পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনাবলীর কথা। তার মধ্যে আবার জাতক বর্ণিত বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের কাহিনীও আছে এবং বিশেষ করে চোখে পড়ে অনাথপিণ্ডদের বুদ্ধদেবকে জেতবন দান করার গল্পটির ছবি। তিনি বনটির মালিককে বনভূমির আয়তনব্যাপী সোনা বিছিয়ে দিয়ে সেই স্বর্ণ-মূল্যে বুদ্ধদেবের জন্য বনটি কিনে দিয়েছিলেন। এই জেতবনের ছবিটিতে একটি শিলালিপি আছে তাতেই এই ঘটনাটি বিবৃত। প্রসেনজিৎ ও অজাতশত্রু রাজার বুদ্ধের নিকট দীক্ষা নেবার ছবিও আছে। কতকগুলি ভাস্কর্য্য-চিত্রে হাস্যরসাত্মক ভাবও পাওয়া যায় এবং সেগুলিও কোনো-না-কোনো প্রচলিত বৌদ্ধ-গল্প অবলম্বনে রচিত বলেই মনে হয়। 'যবমাযক্য' (Yavamajhakiya) জাতকের ছবিটিতে আছে, 'অমরা' নামে একটি মহিলার ঘরে তার স্বামীর অবর্ত্তমানে চারজন দুষ্ট লোক রাত্রে প্রবেশ করেছে। অমরা এক একটি দস্যুকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আহ্বান করছেন; আর যেই একজন ঢুকছে অমনি তাকে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখছেন এই ভেবে যে তাঁর স্বামীর হঠাৎ

বাড়ী-ফেরার সম্ভাবনা আছে; অতএব তাদের লুকিয়ে না রাখলে বিপদ! প্রত্যেকেই এই ভাবে অমরার ঘরে ঝুড়ি চাপা রইল সারারাত। মহিলাটির স্বামী পরের দিন আসবামাত্র একে একে ঝুড়ি খুলে দেখ্ছেন যে তার মধ্যে সম্রাট স্বয়ং ধরা পড়ে গেছেন। রাজা অধোবদনে রইলেন খুবই সন্তপ্ত চিত্তে। শেষ ছবিটিতে আছে, রাজা পরিষদবর্গ-পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন এবং তাঁব সামনে জয়যুক্তভাবে অমরা দাঁড়িয়ে আছেন; তিনটি দস্যু ঝুড়িতে বন্ধ-অবস্থায় আছে। এই গুলির মধ্যে মহাকপি জাতকের গল্পটিও উৎকীর্ণ আছে। বোধিসত্ব এক সময় হিমালয়ে হনুমানদের রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। তিনি গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার তীরে ডুমুরেব ফল খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। দৈবাৎ একটি ডুমুর জলে প'ড়ে গঙ্গার স্রোতে ভাসতে ভাসতে কাশীতে উপস্থিত হয়। কাশী-নরেশ সেটি খেয়ে এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে নদীর তীব বেয়ে হিমালয়ের দিকে লোক পাঠালেন সেই ডুমুব গাছের সন্ধানে। অনেক দিন ধরে হাঁটাব পর কাশী-নরেশের লোক-গুলি যখন সেই ডুমুর গাছের নিকট গঙ্গোত্রীতে পৌছল, তখন হয়ে গেল রাত। রাত্রের মধ্যে ঐ ডুমুর গাছটিকে তারা তুলে নিয়ে যাবে স্থির করলে এবং চার পাশ থেকে সেটিকে ঘিরে ফেল্‌লে। সেই গাছের উপর তখন রাত্রি-বাস করছিলেন বাঁদর-রাজ বোধিসত্ব তাঁর দলবল-নিয়ে। তিনি তখন নিরুপায় দেখে নিজের লেজের সঙ্গে ডুমুর গাছের ডাল জড়িয়ে নিয়ে কাছাকাছি আর একটি গাছে লাফিয়ে ঝুলে পড়লেন। এই ভাবে তাঁর তৈরী দেহ-সেতুটির উপর দিয়ে অন্য সব বাঁদরেরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। এইরূপ

শ্বেতহস্তী জাতক ও বুদ্ধ-মাতা মায়াদেবীর স্বপ্নের ছবিও আছে। অজাতশত্রুর বুদ্ধের পদাঙ্ক পূজা, কোশল-রাজ প্রসেনজিতের ভগবৎ-ধর্ম্মচক্রের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ, বুদ্ধের মহাবন বিহারে দেবতাদের নিকট মহাসাম্যসূত্রের ব্যাখ্যান, অপ্সরাদেব নৃত্যগীত, হাতী, ঘোড়া, সিংহ, হরিণ প্রভৃতি জীব-ছবি বিস্তর আছে ভরহুতের ভাস্কর্য্যে। এই সব সনাতনী ভাস্কর্য্যে যে মানুষের মাথার উষ্ণীষ ও মেয়েদের গহনা প্রভৃতি দেখা যায়, তার চলন এখনো ভারতবর্ষে কোনো না কোনো স্থানে আছে। মোগল যুগে অবশ্য বিশেষ ক'রে উত্তর ও মধ্য ভারতের পোষাক পরিচ্ছদে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন এসেছিল। মণিপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলে এখনো প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার অনুরূপ পোষাক, মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু প্রচলিত আছে দেখা যায়। সাঁচী-স্তূপের সামনে অশোকের স্তম্ভটি থাকায় মৌর্য্যযুগের কথাই মনে আসে। সাঁচীর বিরাট ব্যাপারটি একদিনে সমাধা হয়নি। এটি অশোকের আদেশে তাঁর সময়ে তৈরী হয়েছিল বটে, কিন্তু তার কাজ শেষ হয়েছিল অনেক পরে। তাই মৌর্য্যের পরবর্ত্তী সুঙ্গ-যুগের কাজেরও পরিচয় সাঁচীতে পাওয়া যায়। উত্তর-তোরণের এক যায়গায় শিলা-লিপি থেকে জানা গেছে যে, খৃঃ পূঃ ৭৫থেকে ২০ শতাব্দীর মধ্যে অন্ধ্রাজ শতকর্নীর দ্বারা সেটি তৈরী হয়েছিল। তা'ছাড়া অন্য একটি তোরণের মধ্যে বিদিশার (ভিলসার) হস্তিদন্ত-শিল্পীর দ্বারা তৈরী হয়েছিল বলে শিলালিপি পাঠে জানা গেছে। সার জন মার্শেল প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সাধারণত সাঁচীর বেশীর

সাঁচী স্তূপ
খৃঃ পূঃ ২০০

ভাগ কীর্ত্তির কাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী বলে অনুমান করেন। মার্শেল সাহেব অবশ্য তার মধ্যে গ্রীক (Hellenistic spirit) গন্ধ পেয়েছিলেন। অবশ্য এটি তাঁর একটি ব্যক্তিগত মতামত। পূর্ব্বেই বলা হয়েচে যে গ্রীস বা অন্যত্র কোথাও স্থাপত্য কলায় বৌদ্ধ তোরণ বা রেলিঙের অনুরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। এ-গুলি একেবারেই ভারতের নিজস্ব এবং প্রাচীনতম ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর এ-গুলির প্রতিষ্ঠা। এ-গুলি একদিনে কখনো হঠাৎ গড়ে ওঠেনি। সাঁচীর তোরণের ভাস্কর্য্যের ছবিগুলির মধ্যে এক-আধটি সিংহের ডানাযুক্ত ছবি দেখে পারস্যের (পারসিপলিসের) প্রভাব আছে ব'লে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। তা'ছাড়া এই ভাবে কয়েকটি ফুলের নক্সাকারীর সামান্য আকারগত মিলও তাঁরা দেখিয়েছেন। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে ভারতীয়দের পারস্য-অভিযানের ফলেও হয়ত এইরূপ প্রভাব আসতে পারে। এ বিষয় সঠিক গবেষণা এখনো করা হয়নি। ভরহুতের ভাস্কর্য্য-চিত্রের মত সাঁচীতে হিন্দু-দেবদেবীর ছবি আছে। পদ্মাসনে লক্ষ্মীমূর্ত্তি বা গজলক্ষ্মীমূর্ত্তি বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে প্রায় দেখা যায়।

সাঁচীর তোরণের দু-পাশে দুটি ক'রে যক্ষিণীমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলির বিশেষ ভঙ্গী এবং গঠন-পারিপাট্য বেশ চমৎকার। ভরহুতের ন্যায় সাঁচীর ভাস্কর্য্য-চিত্রে প্রাচীন লিপি কোথাও না থাকায় বোঝার পক্ষে সহজ নয়। তবে সাধারণতঃ ভরহুতের ন্যায় সেখানেও বুদ্ধের জীবনী-বিষয়ক চিত্রই বেশীর ভাগ আছে। বুদ্ধদেবকে মারের বিভীষিকা-দেখানো, কাশীতে বুদ্ধের প্রথম ধর্ম্মপ্রচার, বুদ্ধের গৃহত্যাগ, বুদ্ধের ইন্দ্রশিলা-

গুহা ও জেতবনে গমন, নিরঞ্জনা নদীতে বিহার, উরুবিল্লীর কাল-সাপের কাহিনী, অগ্নি ও জলের অলৌকিক ব্যাপার প্রভৃতি কাহিনী বর্ণিত চিত্রগুলির কথা জানা যায়। সাঁচী-রেলিঙের জাতকের গল্পের মধ্যে ছ'দন্ত জাতক, অলম্বুষা জাতক, মহাকপি ও শ্যামা জাতকের ছবিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মাঝে অবস্থিত অমরাবতী একটি অতি প্রাচীন নগর। ভরহুৎ বা সাঁচীর শিল্পকলা যেমন ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্য-কলারই খবর দেয়, তেমনি অমরাবতীর ভাস্কর্য্যকলা পরবর্ত্তী হিন্দু শিল্প এবং বৌদ্ধ শিল্প-কৃষ্টিকে যোগযুক্ত করে। তা'ছাড়া অমরাবতীর শিল্পকলায় গ্রীক-গন্ধের কথা কেহ বড় একটা বলেন না।

অমবাবতী স্তূপ
খৃঃ পূঃ ২০০

অমরাবতীর স্তূপ ভরহুৎ ও সাঁচীর পরে বা সমসাময়িক কালের কোনো একসময় তৈরী হয়েছিল এবং শিলালিপি-পাঠে জানা যায় যে ১৫০ খৃষ্টাব্দে পুলুমায়ী বা শীতিপুত্রের দ্বারা সংস্কার করা হয়েছিল। অন্ধ্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যে এইরূপ আরো অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্য-চিহ্ন ছড়ানো আছে বলে জানা যায়। এ-গুলির মধ্যে অবশ্য অমরাবতীর স্তূপ ও রেলিঙই মুখ্য। ভাত্তিপ্রলু (Bhattiporlu) জগজ্জয়পেটা (Jaggayyapeta) এবং ঘণ্টাশালা (Ghantasala) প্রভৃতিতে কিছু কিছু ভাস্কর্য্যের চিহ্ন যা পাওয়া যায়, তা থেকে সে-গুলিকে অমরাবতীর সমসাময়িক কালের বলেই মনে হয়। অমরাবতীর স্তম্ভে প্রভা-মণ্ডল দেওয়া বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি এবং বোধিসত্ত্ব কপিলাবস্তুতে

অশ্বারোহণে যাচ্ছেন, এরূপ চিত্র আছে। বুদ্ধের চিত্রে বরাভয়-মুদ্রাটি প্রাচীন হিন্দু মুদ্রা। ভূমিস্পর্শ মুদ্রা, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন মুদ্রা প্রভৃতি জটিল বৌদ্ধ মুদ্রাগুলির তখনো চলন হয়নি। অন্তর্বাস ও বহিঃবাসের মধ্যে বেশ সরলভাবে ভাঁজগুলি দেখানো হয়েচে। মাথায় উষ্ণীষ ও পায়ের নীচে পদ্ম বুদ্ধের মূর্ত্তিটিতে আছে। ভাস্কর্য্য-চিত্রগুলির মধ্যে তখনকার প্রচলিত রাজাদের সিংহাসন, মোড়া, কৌচ, প্রভৃতি অনেক রকম আসনের ছবি এবং আসবাব-পত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। চেয়ার ও কৌচের মত একজন এবং দুজনার একত্রে বসবার আসনগুলি বেশ সুন্দর ভাবে দেখানো আছে। অমরাবতীর ভাস্কর্য্য-চিত্রের জের ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী যুগের কাজে মহাবালিপুরমে এবং সুদূর কাম্বোজের ওঙ্কারধামের (Ankor Vat) ভাস্কর্য্যের মধ্যে পাওয়া গেছে।

কৌশাম্বীর কথা স্থাপত্য-অধ্যায়ে বলা হয়েচে। এর উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণে আছে। হস্তিনাপুর (দিল্লী) বিনষ্ট হওয়ায় পরীক্ষিতের অধস্থ পঞ্চম পুরুষ নেমিচক্র কৌশাম্বীতে রাজপাট উঠিয়ে এনেছিলেন। কৌশাম্বীতে পণ্ডিত ব্রজমোহন ব্যাসজী একটি চারি ফুট উঁচু পাথরের বুদ্ধ মূর্ত্তি আবিষ্কার করেছেন। শিলালিপি-পাঠে জানা গেছে, কনিষ্করাজের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে বুদ্ধমিত্রা ভিক্ষুণী-কর্ত্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি সেটি উপর্য্যুপরি কয়েকবার বুদ্ধদেবের কৌশাম্বীতে শুভাগমনের ও থাকার স্মৃতি-রক্ষার জন্যেই নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছিলেন। তা' ছাড়া কৌশাম্বীতে যে কুষাণ যুগের রেলিঙ ও থাম পাওয়া গেছে, তার কথা পূর্ব্বেই বলা

কৌশাম্বী
খৃঃ পৃঃ ৮০০—১০০

হয়েচে। পণ্ডিত ব্যাসজী এলাহাবাদের মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ামের জন্য বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রভৃতি ছাড়াও আরো অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও পোড়ামাটির চিত্রফলক সংগ্রহ করেছেন কৌশাম্বী থেকেই। বুদ্ধের সময় কৌশাম্বীর উপকণ্ঠে বুদ্ধের জীবিতকালেই চারটি 'আরাম' বা 'পার্ক' ছিল। সেগুলির নাম ছিল, 'বদরিকারাম,' 'কুক্কুটারাম', 'ঘোষিতারাম' ও 'পাবারিয়া আম্রবাটিকা'। এই সকল আরামগুলির মধ্যে কোনো-না-কোনো একটিতে বুদ্ধদেব তাঁর বাণী প্রচার করবার জন্যে এসে বাস করেছিলেন ব'লে জানা যায়। ফা-হিয়াঙ ও হিয়াঙসাঙের বিবরণ-পাঠে জানা যায় যে, তাঁরা ঘোষিতারামের ভগ্নাবশেষ যমুনার তীরে কৌশাম্বীতে দেখেছিলেন। এটি ঘোষিত নামক একটি কৌশাম্বীর ধনী বণিক বুদ্ধদেবের জন্যে শহরের উপান্তে তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। দিব্যাবদানে আছে, অশোক বুদ্ধের জীবনী-সম্পর্ক-পূত সকল তীর্থস্থান তাঁর ধর্ম্মগুরু উপগুপ্তের সঙ্গে পর্য্যটন করেছিলেন এবং তাতেই কৌশাম্বীরও উল্লেখ আছে। হিয়াঙসাঙের বর্ণনা পাঠে জানা যায়, কৌশাম্বীর জনপদটি ৫ মাইল ব্যাপী ছিল। তিনি সেখানে ৬০ ফুট উঁচু উদয়নরাজের তৈরী বিহার হর্ম্ম্য দেখেছিলেন এবং তার মধ্যে চন্দন কাঠের তৈরী বুদ্ধ-মূর্ত্তি রাখা আছে দেখেছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, কৌশাম্বীর দক্ষিণপূর্ব্বে বিষাক্ত নাগের একটি শৈলাবাস ছিল। বুদ্ধদেব নাগকে পরাজিত ক'রে গুহার মধ্যে নিজের ছায়া রেখে গিয়েছিলেন। এই গল্পটি যিশুখৃষ্টের ভক্তের রুমালে তাঁর মূর্ত্তি-ছায়া-প্রকাশের কিম্বদন্তীর মত কতকটা। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, উদয়নের

সময় কৌশাম্বীতেই প্রথম বুদ্ধের প্রতিকৃতি গড়া বা আঁকা হয়েছিল। যদিও এ বিষয় সঠিক ভাবে কিছু বলা শক্ত।

অশোকের অনুশাসন-লিপি থেকেই জানা যায়, ভারতবর্ষে এমন কি ব্রহ্মদেশে ও আফগানিস্থানেও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারের তিনি চেষ্টা করেছিলেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণেও তাঁর শিলালিপি করনুল জেলায় মান্দ্রাজে সিদ্ধাপুর, রামেশ্বর, ব্রহ্ম-গিরি, মাসচির পাল্কী গুম্ফা পর্ব্বতে অনেক যায়গায় পাওয়া যায়। অন্ধ্র, পারিন্দ্র্য, চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্র-পর্ণীতে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্যে অশোক দূত প্রেরণ করেছিলেন। এরগুির অনুশাসন লিপিতে আছে যে অশোক ধর্ম্ম-প্রচারের জন্যে ব্রাহ্মণ প্রচারক, হস্তীচালক, রথচালক, এবং ভেরীবাদক নিযুক্ত করেছিলেন। সিংহলের দীপবংশ ও মহাবংশ পুরাণেও আমরা অশোকের ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য দূত পাঠানোর বিষয় জানতে পারি। অশোক মহিষমণ্ডলে (বর্ত্তমান মহীশূরে) রক্ষিৎ ও মহাদেবকে ধর্ম্মদূত হিসাবে পাঠিয়ে-ছিলেন বলে জানা যায়। এই ভাবে বনবাসীতে (উত্তর কানাড়ায়) তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। এই বনবাসী খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের একটি কেন্দ্র ছিল। ভারতবর্ষ থেকে লঙ্কা-রাজের নিমন্ত্রণ পেয়ে ৮০,০০০ ভিক্ষু বনবাসী থেকে একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মহাথের (মহাস্থবির) লঙ্কায় গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। নাগার্জ্জুনীকুণ্ডের লিপিতে জানা যায় যে কাশ্মীর, গান্ধার, চীন, তোসলী, অবরন্ত, বঙ্গ, বনবাসী, যবন, দমীড়, পলুর

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ ও বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার

(দন্তপুর) ও তম্বপন্নি (তাম্রপর্ণী) দ্বীপ থেকে শ্রমণেরা ভারতবর্ষে আসতেন। হায়দ্রাবাদের নিকট নাগার্জ্জুনীকুণ্ড ও জগজ্জয়পেটা নামক দুটি স্থান কৃষ্ণানদীর উভয় তীরে অবস্থিত। ইক্ষাকুবংশের রাজাদের রাজত্ব কালে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে একটি মহাচৈত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব'লে জানা যায়। নানা দেশ থেকে ভিক্ষুরা এসে সেখানে বাস করতেন।

সাঁচী, অমরাবতী, কৌশাম্বী ছাড়াও সনাতনী যুগের গান্ধার-ভাস্কার্য্যের নিদর্শনও ভারত-শিল্প-ইতিহাসের একটি দিক খুলে দেয়। পূর্ব্বেই বলেছি ট্যাকশিলা এবং মহাভারত-বর্ণিত তক্ষশিলা—যেখানে জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞের বিষয় উল্লেখ আছে—একই যায়গা। তবে পৌরাণিক কোনো নিদর্শন আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দীতে পারস্য-অভিযানের কথা জানা যায়। দরায়ুস (Darius), সায়রাস (Cyrus), একসারেক্সে (Xerxes) প্রভৃতি রাজারা বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কালে তক্ষশিলা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন বলে জানা গেছে। গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখা নামগুলি অবশ্য ভারতীয় রীতিতে যে কি ছিল, তা' কেবল অনুমান মাত্র করা যেতে পারে। খৃঃ পূঃ ৩২৬ শতাব্দীতে ম্যাসিডোনিয়ার (Macedonia) সম্রাট আলেকজাণ্ডার অম্ভি রাজকে পরাস্ত ক'রে তক্ষশিলা দখল করেছিলেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের ফলে কাশ্মীর অঞ্চলে যে প্রাচীন উরোপীয় ধরণের মূর্ত্তি গড়ার প্রচলন হয়েছিল, তার নিদর্শন এখনো সেখানে প্রচুর পাওয়া যায়। এই গান্ধার-ভাস্কর্য্য-শিল্প

গান্ধারের ভাস্কর্য্য
খৃঃ পূঃ ৩২৬

তাদের স্থাপত্যেরই মত গ্রীক শৈলীর আদর্শে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে কেবল ভারতীয় আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছিল। সেই কারণেই তার মধ্যে কোনো প্রাণ নেই। গান্ধারের গড়া একটি অস্থিকঙ্কালসার ধ্যানী-বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি আছে। হ্যাভেল সাহেব দেখিয়েছেন যে গান্ধারের শিল্পীরা বুদ্ধের বৌদ্ধত্ব অপেক্ষা তাঁর চল্লিশ দিন উপবাসের দরুণ ক্ষীণভাব-প্রাপ্তির কথাটাই বেশী ফুটিয়ে তুলেছেন। অপর ক্ষেত্রে খাঁটি ভারতীয় বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি স্তব্ধ নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার মত ধ্যান-ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাই এই উরোপীয় বাস্তব-ভাবাপন্ন গান্ধার-শিল্প কাশ্মীর উপত্যকায় সমাধি লাভ করেছিল, পরবর্ত্তী ভারত-শিল্পে তাই তার প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না।

আফগানিস্থানে কাবুল থেকে ১৫০ মাইল দূরে বামিয়ান (Bamiyan) গুহার ধারে যে বিরাট বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিগুলি আছে, সে-গুলির বিষয় চীন পরিব্রাজক হিয়াঙসাঙ (৬৩২ খৃষ্টাব্দে) বিশেষভাবে উল্লেখ ক'রে গেছেন। এই গুহার কার্ণিস ছোট ছোট ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি দিয়ে সুচারুরূপে সজ্জিত। এ-গুলিতে গান্ধার-প্রভাব বেশ ধরা যায়। তিনটি বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তি ৩০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের গা কেটে বার করা হয়েছে। সব চেয়ে বড় মূর্ত্তিটি ১৭৫ ফুট উঁচু। তার মুখের দিকে ঠোঁট ও দাড়ি-টুকু আছে, বাকি অংশ ভেঙে গেছে এবং হাত পা দুটিও ভাঙা। অপর মূর্ত্তি দুটির মধ্যে দাঁড়ানো বুদ্ধটি ১২০ ফুট উঁচু এবং বসা বুদ্ধটি ৩০ ফুট উঁচু। দেয়ালের গায়ে ভিত্তি-চিত্রগুলি দেখলে বোঝা যায়, কত অত্যাচার

যুগ যুগ ধ'রে সহ্য করেও আজ পর্য্যন্ত এ-গুলির গৌরব অটুট রয়েছে। কাবুলের সংলগ্ন স্থানগুলি গ্রীক সাম্রাজ্যের অধীনে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল। তার প্রমাণ আমরা তখনকার প্রচলিত প্রাচীন মুদ্রাগুলি থেকে এবং জালালাবাদের গ্রীক ধরণের স্থাপত্য-লক্ষণ-যুক্ত স্তূপ থেকে প্রধানতঃ জানতে পারি। দেমেত্রিয়স (Demetrios), ইউক্রাটিডিয়াস্ (Eukratidus), এ্যাপোলো-ডোটস্ (Apollodotos), এবং মিনান্দার (Menander) প্রভৃতি রাজাদের নাম জানতে পারা যায়। মিনান্দার বা মিলিন্দরাজ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে পূর্ব্বদিকে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত রাজ্য-বিস্তার করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং তাঁর প্রবর্ত্তিত মুদ্রায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-চক্রের ছবি দেওয়া আছে। খৃঃ পূঃ ১৩৫ অব্দে গ্রীকরা ব্যাকৃট্রিয়া (Bactria) থেকে বিতাড়িত হলেন এবং তার কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষ থেকেও তাঁদের যেতে হয়েছিল। এই সময় 'পার্থিয়ান' জাতি (Parthian) কিছুকাল গান্ধাররাজ্য দখল করে, এবং পার্থিয়ান গোণ্ডো-ফার্ণেসের (Gondopharnes) রাজত্ব-কালে সেণ্ট টমাস (St. Thomas) খৃষ্টের মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পরে তক্ষশিলায় এসেছিলেন বলে জানা যায়। ভারতবর্ষে সেই প্রথম খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক পদার্পণ করেছিলেন। এই সময় মধ্য-এসিয়াখণ্ড থেকে গ্রীকদের সঙ্গে ব্যবসা-সূত্রে ভারতবর্ষে সিথিয়ান (Scythian) নামক এক জাতি এসেছিল। এরা ক্রমে পূর্ব্ব-ইরাণ থেকে নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্য্যন্ত "ইন্দো-সিথিয়ান" (Indo-Scythian) সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল

এই রাজ্যকে তখন 'কুষাণা' রাজ্য বলা হতো। কণিষ্করাজ এই কুষাণ রাজ্য স্থাপনা ক'রে ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্য-বিস্তার করেছিলেন। এঁদের সাম্রাজ্যের সকল রীতিই তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীকদেরই মত ছিল, এমন কি মুদ্রার মধ্যে গ্রীকভাষাও প্রচলিত হয়েছিল। মিলিন্দরাজের মত কণিষ্করাজও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রচলিত মুদ্রায় 'বোদো' (Boddo) অর্থাৎ 'বুদ্ধ' এই কথাটি পাওয়া যায়। কাশ্মীর অঞ্চলে গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা সেই সময়কার গান্ধার-ভাস্কর্য্যে বেশ জানা যায়।

মহাভারত-বর্ণিত রাণী 'গান্ধারী' এই গান্ধার দেশেরই মেয়ে ছিলেন। কাশ্মীর অঞ্চলের আবহাওয়া উরোপীয়দের বাসের পক্ষে অনুকূল হওয়ায় তাঁরা নিজেদের দেশ ছেড়ে এত দীর্ঘকাল এদেশে থাকতে পেরেছিলেন। তক্ষশিলা রাজধানীর নানা স্থান খনন ক'রে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে অনেকে বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য, স্তূপ প্রভৃতি আবিষ্কার করা হয়েছে। সে-গুলির মধ্যে গ্রীক-প্রভাব (Hellenism) খুব চূড়ান্ত ভাবে ফুটে আছে। মূর্ত্তিগুলি দেখলেই এই সব উরোপীয় ভাবাপন্ন শিল্পীদের যে মন বাস্তব-শিল্পের দিকেই ঝুঁকে ছিল, তারও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তিব্বতী ও নেপালী ভাস্কর্য্য

তিব্বতের ভাস্কর্য্যের পরিচয় আমরা পাই প্রধানতঃ নানা প্রকার তান্ত্রিক ধাতু মূর্ত্তি এবং মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত দেবতা ও উপদেবতাদের মূর্ত্তিতে। সে গুলি বেশীর ভাগ লামাদের আদেশে লাসার কারখানায় তৈরী হয়েছিল। জানা যায়, ভারতীয় রাজকন্যা ভ্রুকুটিকার সঙ্গে তিব্বতের

কোনো প্রধান শাসনকর্ত্তার বিবাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রবেশ লাভ করেছিল। ক্রমশ তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বী লামারাও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তান্ত্রিক হিন্দু ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণে উৎপন্ন এই এক বিশেষ ধারা সমগ্র তিব্বতের ধর্ম্মরূপে প্রচলিত হয়। ভারতীয় রাজকন্যা ভ্রুকুটিকাকে এখন 'শ্যামতারা' নামে তিব্বতীয়েরা পূজা করেন। পদ্মপাণি, বজ্রপাণি, বোধিসত্ব, মঞ্জুশ্রী, তারা, মহাতারা, রুদ্রতারা প্রভৃতি মূর্ত্তির পূজা তিব্বতে বুদ্ধদেবের পূজার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হয়েছিল। এইরূপ নেপালেও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। নেপালের ও তিব্বতের ধাতু মূর্ত্তিগুলি খুব নিখুঁৎভাবে ঢালাই করা হয়। তিব্বত ও নেপালেই একমাত্র পাতলা ও হাল্কাভাবে ঢালাই করার রীতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। এইরূপ রীতি ফরাসী-দেশে (Cire perdu) একমাত্র তখন প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ধাতুমূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত ভারি। নেপাল ও তিব্বতী মূর্ত্তিগুলি দেখলেই চীনদেশের শিল্পকলার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের কৃষ্টির যোগে এক অপূর্ব্ব জিনিষ গড়ে উঠেছিল ব'লে বোঝা যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ এইরূপ একটি তারা মূর্ত্তি, যা' কলিকাতা যাদুঘরে রাখা আছে, সেটির বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যক্ষ পার্শি ব্রাউন সাহেব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে বলেছেন যে লিওনার্দোর (Leonardo) মোনালিসার (Mona Lisa) বর্ণনা করতে যেমন ওয়ালটার পেটারের (Walter Pater) মত ক্ষমতাবান লেখকের লেখনীর প্রয়োজন হয়েছিল

এই মূর্ত্তিগুলির বর্ণনা লিখতে গেলেও তেমনি জোর লেখনীর প্রয়োজন। তিব্বতে ও নেপালে ধাতুমূর্ত্তি ছাড়াও কাঠের উপর মূর্ত্তি খোদাই প্রভৃতিও অনেক আছে। মকর, গরুড়, কৃত্তিমুখ (কৃত্তিবাসের অর্থাৎ শিবের রুদ্র মুখ) প্রভৃতি অনেক সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য্যের আলঙ্কারিক কাজ দেখা যায়। কাশীতে একটি নেপালী মন্দিরে এইরূপ কাঠের উপর কারিগরির কাজ আছে। তিব্বতী শিল্পীদের হাতের নক্সাকারী কাজ বাড়ীর প্রবেশ-দ্বারের উপর এবং ব্রাকেট প্রভৃতির মধ্যে বেশী দেখা যায়। তিব্বতে মৃত মানুষের হাড় কেটে নানা প্রকার তান্ত্রিক দেবতাদের মূর্ত্তি সূক্ষ্মভাবে তৈরী করতে দেখা গেছে। মন্ত্রতন্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী হওয়ায় তিব্বতী ও নেপালী লোকেরা রূপক চিহ্নের (symbols) দ্বারাই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাধা ক'রে থাকেন। তাই তাঁদের কারুকার্য্যের বেশী প্রয়োজন হয়। নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র উৎকীর্ণ করা কারুকার্য্যমণ্ডিত চক্রের আকারে বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের সহস্র নাম লেখা একটি যন্ত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁরা ধর্ম্ম-চর্চ্চা করেন। এই যন্ত্রের মধ্যে বোধিসত্ত্বের বা নানা প্রকার তান্ত্রিক দেবতাদের মূর্ত্তিও উৎকীর্ণ করা থাকে। তিব্বতী মন্দির বা ধর্ম্মসঙ্ঘের জন্য প্রদীপ ও অন্যান্য পূজার তৈজসপত্রের উপর ও ছোট-বড় দেবতার মূর্ত্তি প্রভৃতি গড়া হয়ে থাকে। তিব্বতের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মূর্ত্তি-লক্ষণের বিষয় ব্যাখ্যা করা আছে; তার বিষয় আমি পূর্ব্বেই বলেছি। বৃহৎসংহিতা, শুক্রনীতি, ময়শাস্ত্র, প্রতিমা-লক্ষণ প্রভৃতি সবই তিব্বতী গ্রন্থ। তা'ছাড়া দেবতাদের অনেক প্রকার মাঙ্গলিক চিহ্ন আছে। মূর্ত্তি-হিসাবে তার লক্ষণ থাকবে শঙ্খ, পদ্ম, ধ্বজ,

বজ্র, অঙ্কুশ, ত্রিশূল, চক্র, জপমালা, স্বস্তিক, কলস প্রভৃতি। এই সব লক্ষণেরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। তিব্বতী ও হিন্দু ভাস্কর্য্য জানতে হ'লে এই সকল বিষয় বিশেষভাবে জানতে হয়; এবং হিন্দু দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার। আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিস্তারিত-ভাবে বলা অসম্ভব।

এই সকল তিব্বতী ও নেপালী হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের দেহভাগ ও গঠনের মধ্যে সামঞ্জস্যের ত্রুটি ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। এ-গুলিতে যদিও গ্রীক শারীরতত্ত্ববিদের মত মাংস-পেশীগুলিকে এক একটি ক'রে চুল চিরে দেখানোর চেষ্টা হয়নি, কিন্তু এমন সুঠাম ভঙ্গীতে সে-গুলি গড়া যে তার সৌন্দর্য্য সকলেরই চোখে ধরা পড়ে। তা'ছাড়া এই সব মূর্ত্তি যে-সকল মোক্ষপ্রত্যাশী ধনী গড়াতেন, তাঁরা সর্ব্বতোভাবে সুন্দর করাবার চেষ্টা করতেন। তা'ছাড়া, যে শিল্পীরা সে-গুলি গড়তেন, তাঁরাও মনে মনে মোক্ষকামী যে ছিলেন,তা' তাঁদের গড়া-কাজের মধ্যে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়;—কোথাও এতটুকু ফাঁকি নেই তাঁদের কাজে। তাঁরা পেশী-গঠনের চেয়ে মূর্ত্তিতে ভাব ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিকেই বেশী দৃষ্টি দিতেন। ইহাই ভারতীয় শিল্পের একটি বিশেষত্ব। বাঙলা দেশের সকল পূজায় কুমোরদের গড়া মৃণ্ময়ী প্রতিমায় পুরোহিতেরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রথা বাঙলাদেশে এখনো থেকে গেছে। বাঙলাদেশ থেকেই নেপালে ও তিব্বতে দীপঙ্কর গিয়েছিলেন তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্যে এবং তারই ফলে আজও তিব্বত ও বাঙলা দেশের শিল্পে ভাবগত নানা প্রকার যোগ দেখতে পাই আমরা। তারানাথ নামক

তিব্বতের এক লামা ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে একটি বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর পুস্তকে জানা যায়, প্রাচীন-কালে বিম্বিসার নামক একটি বিচক্ষণ শিল্পী ছিলেন। তিনি মধ্যভারতে (মগধে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে তাঁকে 'মধ্যদেশী' শিল্পী বলা হতো। ঠিক সেই সময় বাঙলাদেশে পাল রাজাদের আমলে দেবপালের সময় ধীমান্ ও বীতপাল ছিলেন দু-জন বিখ্যাত শিল্পী। তাঁরা চিত্র ও ভাস্কর্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁদের কাজের প্রভাব আজও নেপালে জাজ্জ্বল্যমান আছে।

লঙ্কাদ্বীপের ভাস্কর্য্য
খৃঃ পূঃ ৪০০—
১০৬৫ খৃষ্টাব্দ

তিব্বতের ও নেপালের ন্যায় ভারত-শিল্পের ধারা লঙ্কা-দ্বীপেও পাওয়া যায়। লঙ্কাদ্বীপের (সিংহলের) পুরাতত্ত্বের বিষয় প্রধানতঃ জানা যায় সেখানকার পালিভাষায় লিখিত ৫ম খৃষ্টাব্দীর মহাবংশ পুরাণে। তা থেকে জানা যায় যে ভারতের বিজয়রাজ—খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে প্রথমে লঙ্কা জয় করেন এবং পরবর্ত্তীকালে (খৃঃ পূঃ ২৪৫) অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাই বৌদ্ধধর্ম্ম সেখানে প্রথমে প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সেখানে আনা বোধি-দ্রুমের শাখা আজও অনুরাধাপুরে (সিংহলে) বিদ্যমান আছে। (দেবনপ্রিয়) দেবপ্রিয়-তিস্য রাজার নিকটেই মহেন্দ্র এই বোধিদ্রুমের শাখা ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমে বহন ক'রে আনেন উত্তর ভারত থেকে সমুদ্রপথে। এ বিষয় অনেক রকম প্রবাদ প্রচলিত আছে সিংহলে। ১০৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়বাহু তামিল দেশ থেকে সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে লঙ্কাদ্বীপে এসে রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল পোলানারওয়ায়। সেখানে

তাঁরও আরো পূর্ব্বেকার প্রাচীন কীর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। ইটের তৈরী তপারাম মন্দিরটি দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে পরাক্রমবাহুর আমলেই তৈরী হয়েছিল। ভাটা দাগোবাটির (স্তূপের) কাছে যে বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি আছে, সেটির সৌম্য স্নিগ্ধ ভাবটি বিশেষ উপভোগ্য। বেতবনাবামের (বেতবন পার্কের) ইটের তৈরী বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি এখন কালের করাল কবলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার মাথার দিকটা একেবারে লোপ পেয়েছে। ইউরোপীয় গথিক ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের মধ্যে যে একটি দৃঢ় ও ঋজু এবং উঁচুর দিকে ওঠার ভাব মনে আসে—এই দাঁড়ানো বুদ্ধ-মূর্ত্তিটিতেও ঠিক সেই ভাব আনে। মূর্ত্তিটির দু-পাশে দুটি মিনারেটের মত স্তম্ভ আছে এবং সে দুটির মাঝখানে গবাক্ষ-আসনে মূর্ত্তিটি দাঁড়িয়ে আছে। এই বিরাট স্তম্ভ দুটির সঙ্গে মনে হয় যেন মূর্ত্তিটি পাল্লা দিয়ে উঁচুর দিকে ঠেলে উঠেছে। তাই বুদ্ধের মূর্ত্তিটিকে এত বেশী বিরাট ব'লে মনে হয়। পরাক্রমবাহুর আমলের একটি পুঁথি হাতে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা বিরাট মূর্ত্তি পোলানারওয়ায় আছে। সেটি রাজা পরাক্রমবাহুরই মূর্ত্তি বলে প্রচলিত। 'ক্ষণভঙ্গ' ভঙ্গিমায় (শিল্পশাস্ত্রের লক্ষণ-অনুসারে মূর্ত্তির নানা প্রকার ভঙ্গিমার বিষয় চিত্রকলা নিবন্ধে পরে বলা হবে) কটিপট্টবাস পরিধান ক'রে দু-হাতে একটি পুঁথি ধ'রে দাড়ি ও উষ্ণীষধারী সৌম্য মূর্ত্তিটি দেখলে বেশ বোঝা যায় যে শিল্পীর এটিকে গড়বার সময় কত উৎসাহ ও আনন্দ মনের মধ্যে জমা ছিল। 'গল'-বিহারে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দের বিরাট মূর্ত্তিটি বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের বিরাট শায়িত মূর্ত্তির শিয়রে দাঁড়ানো ভাবে তৈরী। মুখে তাঁর একটি স্নিগ্ধ ভাব

এবং হাত দুটি সামনের বুকের দিকে মোড়া ভাবে আছে; যেন বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকল মানসিক সুখ দুঃখের অতীত কোনো একটি স্থানে নিজেকে নিয়ে গেছেন। এই মূর্ত্তি দুটির কাছেই একটি খুব নক্সাকারী কাজ করা সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট ধ্যানস্থ বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি একটি হাত অন্য হাতের উপর রেখে বসে আছেন এইভাবে গড়া।

খৃঃ পূঃ ৪৩৭ শতাব্দীতে অনুরাধাপুরের রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এখন তার যতটা পর্য্যন্ত সীমা দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বড় (প্রায় ৫ মাইল ব্যাপী) সহরটি ছিল। তামিল ও সিংহলীয় রাজাদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হবার পর নবম খৃষ্টাব্দীতে অনুরাধাপুর থেকে পোলানারওয়ায় রাজধানী উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এখন অনুরাধাপুরের বেশীর ভাগ স্থান বন-জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ৫ম খৃষ্টাব্দীর তৈরী একটি বিরাট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এইস্থানে বনের মধ্যে প'ড়ে আছে। এটির বিষয় হ্যাভেল সাহেব ও কুমারস্বামী তাঁদের বহু গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অনুরাধাপুরে 'বনওয়েলি' স্তূপের পাশে দত্তগমুনিরাজের (খৃঃ পূঃ ১৬১-১৩৭) একটি মূর্ত্তি আছে। হ্যাভেল সাহেব এটিকে পরবর্ত্তী কোনো যুগের বলে মনে করেন। কিন্তু প্রবাদ আছে যে দত্তগমুনিরাজই এই স্তূপটি রচনা করান। সেখানেই ঈশ্বরমুনি পাহাড়টি খুঁদে সঙ্ঘ-মন্দিরটি দেবপ্রিয় তিস্যরাজ তৈরী করিয়েছিলেন। তারই আবার নিকটবর্ত্তী একটি আধুনিক মন্দিরের পাশে পাহাড়ের গায়ে কপিল ঋষির একটি ছোট ভাস্কর্য্য চিত্র আছে। এটিতে সগর রাজার অশ্বমেধের ঘোড়া মুনির

পাশে এসে লুকিয়ে আছে দেখানো হয়েছে। ভাস্কর্য্যটির আতপচিত্রে (photographএ) তার আকার বিরাট দেখায় মূর্ত্তিটির এই বিশেষত্ব। মূর্ত্তিটিতে বসার ভঙ্গীটি খুব সহজ; একটি হাঁটুর উপর হাত রেখে অপর হাতের উপর ভর দিয়ে বসা। তারই নিকটে ছাদের নীচে রাজারাণীর মূর্ত্তি খোদাই করা আছে। খুব সম্ভব, রাজা দেবপ্রিয়-তিস্য ও রাণীর প্রতিমূর্ত্তি। এ-গুলি ছাড়া অনুরাধাপুরে ভাস্কর্য্যকলার ধ্বংসাবশেষ অনেক আছে। বিশেষতঃ বাস্তুভিটার সামনে দালানে উঠবার সিঁড়ির দুপাশে পাথরের দেবদ্বারীর মূর্ত্তি এবং হংসমিথুন ও পদ্মকারী নক্সা, অর্দ্ধচন্দ্রাকার পৈঠা (চন্দ্র পিঁড়ে) অনেক দেখা যায়। তিস্যরাজের জন্যে মহেন্দ্রর আনীত বোধিবৃক্ষটি যে মহাবিহারের সামনে আছে তার চন্দ্র-পৈঁঠাটি খুবই সুন্দর। মিহিনতাল পাহাড়ে মহেন্দ্রের সমাধি স্থান আছে এবং এখনো বৌদ্ধেরা সেটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা যেমন ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি সুদূর সিংহলে ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্যাম, চম্পা, সুমাত্রা, কম্বোজ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল বলে জানা গেছে।

ব্রহ্মদেশের ভাস্বর্য্য
৬৩৯-১২৮৪ খৃষ্টাব্দ

দৈবাৎ গ্রীক্ সভ্যতার আমেজ আলেকজাণ্ডার এদেশে রেখে গেলেও তার বীজ অঙ্কুরেতেই বিনাশ পেয়েছিল তার অধিকৃত রাজ্যটুকুর মধ্যেই,—কিন্তু ভারতের অতি প্রাচীন পৌরাণিক যুগের শিল্প-সাধনার মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি ছিল তারই পরিচয় আমরা এই সকল স্থানের (সুদূর দেশের) প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে পাই। প্রথমেই তিব্বত ও নেপালের কথাই আমরা

বলেছি, কেননা সেই পথ দিয়েই চীন ও সুদূর প্রাচ্য-দেশে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির প্রসার লাভ ঘটেছিল। আর ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ-লাভ করেছিল বঙ্গ ও কলিঙ্গ থেকে বাণিজ্যসূত্রে জলপথে এবং প্রধানতঃ স্থলপথে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচারকদের দ্বারা; আসাম ও মণিপুরের মধ্য দিয়েই ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রবেশ করেছিলেন। ধর্ম্ম ও শিক্ষা-সংস্কার, সকল বিষয়েই ভারতীয় কৃষ্টির সঙ্গে ব্রহ্মদেশ যোগযুক্ত। তাই দেখা যায় যে বৌদ্ধ-স্তূপ ও মন্দিরের গায়ে নানা প্রকারের হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য্য-চিত্রও খোদাই করা আছে। ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে 'থেনিয়াইরাজা' প্রথম ব্রহ্মদেশে পেগানে সাম্রাজ্য স্থাপনা করেন এবং একাদশ খৃষ্টাব্দীতে অন্-ব্রতরাজ পেগানকে একটি বৌদ্ধ-প্রধান সহর ক'রে তোলেন। ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে চীন-মঙল জাতীয় অভিযানে পেগান বিদ্ধস্ত হয়। সেই সময় অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যায়। অলম্-প্রারাজ (১৭৮৩ খৃঃ) পেগান থেকে আভায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই আরাকান থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের সীমা পর্য্যন্ত (আসাম) অধিকার করেন। প্রোমের পাহাড়ের উপর শিওশান্দোর (শিব-সুন্দর ?) প্যাগোডার (স্তূপের) পাশে আধুনিক ভাস্করের হাতের গড়া একটি অতিকায় বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তি সম্প্রতি তৈরী হয়েছে। প্রোমে এখনো পাথরের বুদ্ধ-মূর্ত্তি তৈরীর রেওয়াজ আছে। বুদ্ধ-মূর্ত্তি উপহার দেওয়া বা গড়া সে দেশে একটি বিশেষ পুণ্যকর্ম্ম ব'লে সকলে মনে করেন। রেঙ্গুন, মান্দালে, অমরপুর, মণিয়াওয়া, পেগান প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধ প্যাগোডা বা স্তূপ আছে। একমাত্র পেগানেই ১৩,০০০

প্যাগোডা আছে বলে জানা যায়। এই প্যাগোডাগুলির গায়ে গবাক্ষ-বেদীতে ছোট বড় অনেক পাথরের ও পোড়া মাটির বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। এই সব প্যাগোডার ভাস্কর্য্য বেশীর ভাগ ১০৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী। বাঙলাদেশে যেমন মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির মূর্ত্তি প্রভৃতি থাকে ব্রহ্মদেশের স্তূপ ও মন্দিরগুলিতেও ঠিক ঐ একই প্রকারের কাজ দেখা যায়। ব্রহ্মদেশের শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙলাদেশের এইখানে বিশেষ মিল আছে। তা'ছাড়া পেগানের সুবিখ্যাত প্রাচীন আনন্দ মন্দিরটির সঙ্গে নবাবিষ্কৃত রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের অতি প্রাচীন বিহার মন্দিরটির খুব বেশী আকারগত সাদৃশ্য দেখা যায়। এমন কি, ভিত্তির নক্সাটিরও বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বাঙলাদেশের প্রাচীন মন্দিরের মত দেখতে এটি ছাড়াও এমন অনেক প্রাচীন মন্দির ব্রহ্মদেশে আছে। আনন্দ মন্দিরটির চার পাশে চারটি বিরাট দাঁড়ানো বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে। এ-গুলি এক একটি প্রায় ৩০ ফুট উঁচু মূর্ত্তি। এইখানেই থান-দাও-গয়ার ইঁটের গাঁথা বিপুল বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি এক কালে একটি মন্দিরের মধ্যে ছিল, কিন্তু এখন তার চার পাশের দেয়াল খসে পড়েছে। পেগানের অপর একটি বিরাট বুদ্ধের মূর্ত্তি যে মন্দিরটিতে আছে, তার বাইরের দেয়ালের কুলুঙ্গিতে (গবাক্ষাসনে) দ্বাদশ অবতারের হিন্দু প্রতিমা আছে। সেখানকার নান্‌ছায়া প্যাগোডায় যে হিন্দু দেবতাদের ভাস্কর্য্য-চিত্র খুব নীচু করে গড়া (low relief) আছে, ঠিক সেই রীতিতে গড়া ভাস্কর্য্য-চিত্র সুদূর শ্যাম ও কাম্বোজের মন্দিরে দেখা যায়। এই মন্দিরটি ১০৫৯ খৃষ্টাব্দীর বলে জানা যায়। এই সকল বৌদ্ধ ও হিন্দু-

বৌদ্ধ মন্দির ও স্তূপের ভাস্কর্য্য চিত্রগুলি থেকে ভারতের শিল্প-সাধনার প্রভাব কিরূপ বিস্তার লাভ করেছিল সে-দেশে, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নালান্দায় প্রাপ্ত একটি তাম্রলিপি থেকে জানা গেছে যে সুমাত্রার এক রাজার অর্থে—ভিক্ষু-আবাস সেখানে স্থাপিত হয়েছিল। দেশদেশান্তর থেকে বুদ্ধ-ধর্ম্মে বুৎপত্তিলাভ করতে এবং ভারতের বৌদ্ধ তীর্থগুলি পর্য্যটন করতে লোকেরা আসতেন এবং এই ভাবেই ভারতের কৃষ্টির প্রভাব তখনকার এসিয়া-খণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

তারই প্রমাণ শ্যামদেশের প্রাচীন ভাস্কর্য্যে যা' পাওয়া যায়, সে-গুলিকে (১) সঠিক ভারতীয়, (২) ভারত ও শ্যামের মিশ্রণ, (৩) হিন্দু ও যবদ্বীপ ধরণের, (৪) খামির, থাই, মোন ও আঙ্কোর প্রভৃতি শাখায় ভাগ করা যেতে পারে। শ্যামের রাজধানী বঙ্ককের নিকটবর্ত্তী পঙটুকে (Pog-Tuk) যে মূর্ত্তিগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, সে-গুলি দেখলেই ভারতের প্রাচীন অমরাবতীর ভাস্কর্য্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বৃহত্তর ভারত শ্যাম, চম্পা, কাম্বোজ, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি।

এই সব মূর্ত্তি-চিত্রগুলির ভারতীয় ভাস্কর্য্যের সঙ্গে এত সাদৃশ্য বেশী আছে যে সে গুলিকে ভারত থেকে আনা হয়েছিল, কিম্বা ভারতীয় শিল্পীরাই সে দেশে গিয়ে তৈরী করেছিলেন, এ বিষয় সঠিক ভাবে বলা শক্ত। তবে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ থেকে যে ভারতীয়েরা শ্যাম ও কাম্বোজে বসবাস করবার জন্যে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে প্রবাদ আছে।

প্রাচীন ভাস্কর্য্যের মধ্যে বুদ্ধের ধর্ম্মচক্রের ছবি প্রা-পট-অমের প্রাচীন বস্তীতে পাওয়া গেছে। চীন পরিব্রাজক সপ্তম খৃষ্টাব্দীতে যদিও শ্যামদেশে পদার্পণ করেননি, তবে ব্রহ্মদেশ ও কাম্বোজের মধ্যবর্ত্তী কোনো স্থানে ভারতবর্ষীয় লোকদের স্থাপিত 'দেবারবতী' রাজ্য যে একটি ছিল, তার বিষয় তাঁরা লিখে রেখে গেছেন। প্রাচীন চীন গ্রন্থেও দেবারবতীর উল্লেখ আছে। নামটিও সংস্কৃত ঘেঁষা হওয়ায় ভারতীয় প্রভাবের কথাই ঘোষণা করে। শ্যামের ভাস্কর্য্যগুলিতে বেশীর ভাগ হিন্দু দেবতাদের মূর্ত্তি আছে এবং ভারতীয় গুপ্তরাজ্যের সময়কার প্রভাব যেন বেশী তাতে দেখা যায়। 'মোন' ভাস্কর্য্যের একটি ভাল দৃষ্টান্ত আছে প্রা-পট-অমের বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তি। এটি ৩০ ফুট উঁচু এবং খুব কঠিন পাথরের (quartz) তৈরী। এত কঠিন পাথর কেটে এত বড় মূর্ত্তি যে কি করে তারা গড়েছিলেন তা' বলা শক্ত। বাটালি বা ছেনি দিয়ে কেটে সহজে তৈরী করা যায় না, চুণি পান্নার মত এই পাথর ঘসে ঘসে ক্রমশ ক্ষয় করে গড়ে তুলতে হয়। এই মূর্ত্তিটিকে তৈরী করতে যে শিল্পীরা কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তা বলা শক্ত। 'মোন-ভারতীয়' ভাস্কর্য্যের মধ্যে আরো দুটি রাহু ও কেতুর মূর্ত্তি উল্লিখিত বুদ্ধের দুই পাশে আছে। কাল ব্রঞ্জের (মিশ্র ধাতুর) একটি 'মোন-ভারতীয়' মূর্ত্তিতে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ভঙ্গিমা দেওয়া আছে। মোনের পরবর্ত্তী যুগের 'থাই' শ্রেণীর ভাস্কর্য্যের মধ্যে এই ভাবটি স্থায়ী হয়নি ক্রমশ 'মঙল' ভাবই বেশী দেখা দিয়েছিল তাতে, তবে মধ্য-শ্যামে এই ধরণের ভাস্কর্য্য-কলার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। মোনেরা ছয় শত বৎসর একাধিপত্য এই সকল স্থানে

করেছিলেন এবং তাঁদেরই দ্বারা ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের বিস্তার তখন হয়েছিল।

বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের মধ্যে জানা যায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মই শ্যাম ও কাম্বোজে ভারতবর্ষ থেকেই গিয়েছিল, যদিও হীন-যানেরও কিছু কিছু চিহ্ন সেখানে আছে। বুদ্ধের সঙ্গে বোধিসত্ব, লোকেশ্বর প্রভৃতি মূর্ত্তিও আছে। পূর্ব্ব-শ্যামে আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অর্দ্ধনারীশ্বর, যক্ষমূর্ত্তি প্রভৃতি হিন্দু প্রতিমাও পাওয়া যায়। শ্যামদেশে, মলয়, জাভা (যবদ্বীপ) ও সুমাত্রার (সুবর্ণ দ্বীপ) রাজাদের বারবার অভিযানের এবং রাজ্য-স্থাপনের কথা জানা যায়। এই সময় পরস্পরের মধ্যে অনেক কিছু ভাব বিনিময় ও ধর্ম্মের আদান-প্রদান এই সব দেশে চলেছিল। 'জয়' ও 'নিকোনশ্রী-তামারাত' প্রদেশেই তার কেন্দ্র ছিল। জাভা ও সুমাত্রা থেকেই খুব সম্ভব শ্যামদেশের লোকেরা মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষালাভ করেছিলেন। খামিরের শিল্পকলা যে কি ভাবে গড়ে উঠেছিল, তার এখনো কোনো মীমাংসা হয়নি। তবে এই সকল আদান-প্রদানের ব্যাপার থেকেই যে একটি নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল, তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। 'লোপবুরী' প্রদেশেই খামির-শিল্প প্রধানতঃ দেখা যায়। 'মোন' থেকে ক্রমশ 'খামির' শিল্পের দিকে কি ভাবে শিল্পকলার গতি চালিত হয়েছিল, তার খবর তখনকার ভাস্কর্য্য কলার নমুনাগুলির মধ্যেই নিহিত আছে—সে-গুলিকে ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখলে বেশ বোঝা যায়। তাই দেখা যায়, কোনো কোনো ভাস্কর্য্যে 'মোন' ও খামিরে'র কৃষ্টির যোগ তখনো পুরোপুরি স্থাপিত না হওয়ায় দুয়েরই পরিচয় একই কাজের মধ্যে কখন কখন পাওয়া যায়

এই ধরণের ভাস্কর্য্যগুলিকে তাই 'মোণ-খামির' নাম দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ভাগ করা যেতে পারে। খামির থেকে যখন আবার 'থাই' যুগ আরম্ভ হল, তখন ক্রমশ পাথরের স্থলে ধাতুমূর্ত্তি প্রচলন হতে লাগল। তখনকার ধাতুমূর্ত্তিগুলির গঠন ও রঙের বেশ বিশেষত্ব আছে।

ভারতীয় শিল্প-কৃষ্টির প্রভাব পদে পদে শ্যাম, কাম্বোজ ও চম্পায় পাওয়া যায়, আঙ্কোব-ভাট (ওঙ্কার ধাম) ও দেবারবতী রাজ্যের হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলিতে যথেষ্ট তার পরিচয় আছে। 'নামসাক' নদীর তীরে প্রাপ্ত একটি নন্দীর ভগ্নমূর্ত্তিতে সংস্কৃত ভাষায় লেখা শিলা লিপিও পাওয়া গেছে। ইজিপ্তের স্ফিনিক্সের মত ওঙ্কার ধামের (Ankor Thom) মন্দিরটি একটি বিরাট চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি। মন্দিরটিতে ব্রহ্মার কেবল চারিদিকে চারিটি মুখই দেখানো হয়েছে। মনে হয় যেন মাটি ফুঁড়ে ব্রহ্মার আবির্ভাব হচ্চে। ভারতের হিন্দু ধর্ম্মের বীজ গভীর ভাবে সেখানে তখন অঙ্কুরিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। যবদ্বীপের বিখ্যাত বরবোদরের (বড় বুদ্ধের) মন্দিরের গায়ে ১৪৬০টি মূর্ত্তিযুক্ত ভাস্কর্য্য-চিত্রে যেমন বৌদ্ধ কাহিনী জাতকের গল্প প্রভৃতি বর্ণিত আছে, তেমনি শ্যাম, চম্পা ও কম্বোজের মন্দিরের গায়ে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক হিন্দু ভাস্কর্য্য-চিত্রই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। শ্যামের প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল 'আয়ুথিয়া' বা 'অয়ুধ্যা'। এটি অযোধ্যারই অপভ্রংশ মাত্র। শ্যাম ও কাম্বোজের মাঝামাঝি অরণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি বিরাট মিশ্র-ধাতুর তৈরী বুদ্ধমূর্ত্তি যেন যুগ যুগান্তর ধরে কালকে পরিহাস করছে। একজন আমেরিকাবাসী এই

কীর্ত্তিটি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন—"এই মন্দিরগুলির ভাস্কর্য্য কি কেবল আমাদের নিকট প্রাচীন ইতিহাসেরই কথা জানায়? তা নয়; যে সব ব্যক্তির মনে এই ওঙ্কারধামের পরিকল্পনার বাসা বেঁধেচে, তাঁরা এই মন্দিরগুলিতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে যেন মূর্ত্ত করে রেখে গেছেন ভাস্কর্য্য-কলায়। এই পাথরের বিরাট কারখানা দেখলে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়! যন্ত্রের দ্বারা আমরা প্রকৃতিকে আজ বাঁধবার চেষ্টা করচি, কিন্তু এই মানসপ্রসূত কীর্ত্তিকলার উপর প্রকৃতি তার প্রভাব বিস্তার করতে আজও পারেনি; এ-গুলির উপর বনজঙ্গল বিস্তার করেছে এবং সে-গুলি পুনরায় শুকিয়েও যাচ্চে, আবার জন্মাচ্চে, কিন্তু এই (শ্যামের) প্রাচীন কীর্ত্তি-গুলি অটুট রয়েচে আজও।" আমরা মিশরের মরুভূমির অধিপতি স্ফিংক্সের সঙ্গে বনাধিপতি ওঙ্কারধামের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার আকারের মন্দিরটির তুলনা করতে পারি এই হিসাবে যে এই কীর্ত্তিগুলি দেখলে বেশ বোঝা যায় যে শিল্পকলার দ্বারাই মানুষ 'অমৃতস্য পুত্র' হতে পারে।

শ্যামের নবাবিষ্কৃত 'শ্রীদেবে'র কতকগুলি ভাস্কর্য্যকলার পরিচয় যা' পাওয়া যায়, তার কথা বলা প্রয়োজন। ডাঃ কোয়ারিশ ওয়েলস্ (Dr. Quaritch Wales) শ্যাম-গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ১৯৩৫ সালে এই সকল বহুমূল্য হিন্দু-ভাস্কর্য্য শ্যামে আবিষ্কার করেছেন। শ্রীদেবকে সেখানে 'সি-টেপ' বলে। এখানকার ভাস্কর্য্যের মধ্যে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি-মাটি দেখলেই গুপ্তযুগের যে কোনো ভাস্কর্য্যের কথাই মনে হয়। শ্রীদেবের প্রাচীন শহরটিও ইন্দোচীন সহর পত্তনের মত নয়, সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রভাবাপন্ন। সহরটির মধ্যে ছোট-

বড় অনেক মন্দির ছিল। তার মধ্যে ৫টি এখন বেশ ভাল বোঝা যায়। অপরগুলি সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের কতকগুলি লোক শ্যামে উপনিবেশ স্থাপন ক'রে নিজেদের ভাষা, নিজেদের স্থাপত্য ও নিজেদের ভাস্কর্য্য বাহাল রেখে কিছুকাল ধরে বাস করেছিলেন তা' এইগুলি থেকে বেশ জানা যায়।

শ্রীদেবের বিষ্ণুমূর্ত্তিটি সেখানকার প্রাপ্ত সকল মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার গঠন-পরিপাট্য ও ভঙ্গী-মাধুর্য্যের কথা প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বিশেষ ভাবে বলেছেন। তা' ছাড়া ডাঃ ষ্টেলা ক্রাম্‌রিশ সে-গুলিকে ৫ম খৃষ্টাব্দীর ভূমাবার ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে তুলনা করেচেন। সেখানকার একটি শিলালিপির "বৈষ্ণবস্থুর ··সত্যসন্ধি" কথাটি থেকে অনেকে অনুমান করেন যে বঙ্গের স্থুর রাজাদের আমলেই হয়ত কতকগুলি লোক বঙ্গদেশ থেকে সেখানে গিয়েছিলেন উপনিবেশ স্থাপন করতে। তা' ছাড়া মন্দিরগুলি সবই ইটের তৈরী এবং পাহাড়পুর, জটার দেউল প্রভৃতি মন্দিরগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় এরূপ অনুমান অসঙ্গত বলে মনে হয় না।

ভারতবর্ষ থেকে বৃহত্তর ভারতে পরের পর চারটি ঔপনিবেশিকদের ঢেউ বোঝা যায়। প্রথমেই চম্পার শিলালিপিতে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ প্রভাব কি ভাবে শ্যাম কাম্বোজে গিয়েছিল, তা' জানা যায়। হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মই তার প্রথমে প্রাণস্বরূপ ছিল; ক্রমশ মহাযানী ধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তখনকার ভাস্কর্য্যে প্রধানত অমরাবতীর প্রভাবই দেখা যায়। তার দৃষ্টান্ত কতকগুলি বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যে স্থুবর্ণভূমিতে (স্থুমাত্রায়) প্রাপ্ত বুদ্ধের

ধাতু-মূর্ত্তিতে, যবদ্বীপের (South Djember), চম্পার (Dong-Duong), শ্যামের (P'ong Tv'k), এবং কাম্বোজের (Wat Romlok) কতকগুলি ভারতীয় রীতিতে গড়া বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দফা ঔপনিবেশিক-দের ঢেউ এসে অমরাবতীর স্থানে গুপ্তযুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যের প্রভাব রেখে গিয়েছিল। তার মধ্যে বৈষ্ণব ও শৈব প্রভাব মহাযান বৌদ্ধের সঙ্গে তখন স্থান পেয়েছিল। এই ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দের নমুনা শ্যামের (Wieg Sra) ব্রহ্মমূর্ত্তিতে, 'ফু-নান' রীতিতে গড়া কাম্বোজের (Wat Romlok) মূর্ত্তিগুলিতে এবং পশ্চিম বোর্ণিও দ্বীপের (Batoc-Pahat) ভাস্কর্য্যে জাজ্জ্বল্যমান আছে।

ভারতীয় ভিক্ষু গুণবর্ম্মণ যবদ্বীপে ৫ম খৃষ্টাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন জানা যায়। চীন পরিব্রাজকদের লেখা রোজনামচা থেকে জানা যায় যে সুবর্ণভূমিতে (সুমাত্রা দ্বীপে) ৭ম খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। বাটেভিয়ার শিলালিপিতে জানা যায় যে যবদ্বীপের সম্রাট্ পূর্ণবর্ম্মণ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। শৈবধর্ম্মের পরিচয় আবার পূর্ব্ব-বোর্ণিও দ্বীপে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে পাওয়া গেছে। তৃতীয় ঔপনিবেশিক ঢেউ বৃহত্তর-ভারতে পৌঁছেছিল দক্ষিণ-ভারতের শৈব-কৃষ্টি পহ্লবীদের প্রভাব নিয়ে। তার নমুনা পূর্ব্বখামির শিল্পে 'ফু-নান' ধরণের মধ্যে শ্যাম ও কাম্বোজে এবং যবদ্বীপের নানা স্থানের ভাস্কর্য্যকলায় পরি-লক্ষিত হয়। চতুর্থ ঢেউ পৌঁছেছিল শৈলেন্দ্ররাজের আমোলে এবং সে সময়কার শিল্পকলায় তার বিশেষত্ব টের পাওয়া যায়। এই সময় তারই প্রভাবে শ্যামে খামির

শিল্পের উদ্ভব হয়। এই খামির শিল্পের ভাল দৃষ্টান্ত ওঙ্কারের মন্দিরাবলী ছাড়া শ্যামের প্রা-বিহানের (বিহার) (Pra-Vihan) মন্দিরের বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মন্দিরটি ১৫০০ ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। সিঁড়ি দিয়ে উঠ্তে গেলেই নাগরাজের ১০ ফুট উঁচু পাথরের ফণাগুলি সিঁড়ির দু-পাশে প্রথমেই চোখে পড়ে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ্লেই একটি তোরণ-দ্বার এবং তাতে অসংখ্য কারুকার্য্য করা আছে। দ্বারের মাথায় ঠিক মাঝখানে দেব-দানবের সমুদ্র-মন্থনের ভাস্কর্য্য চিত্রটি এবং দ্বারের সামনের বেদিকার দু-পাশে দুটি সিংহ-মূর্ত্তি আছে। এ দুটির সঙ্গে দক্ষিণের পহ্লবী যুগের ভাস্কর্য্যের বেশ একটু সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়। জানালাগুলিতে খরাতে তৈরী কাঠের গোল গোল খাঁজ-কাটা কাজের মত রেলিঙ পাথরে খোদাই করা আছে। মন্দিরটি খামিররাজ ইন্দ্রবর্ম্মণের আমলের তৈরী একটি হিন্দু-মন্দির। বৌদ্ধ-প্রভাব এর মধ্যে কিছুই পাওয়া যায় না। বালী দ্বীপে বৈদিক রীতির হিন্দু-ধর্ম্ম চলেছিল বহুকাল ধরে এবং সেইজন্যেই সেখানে বেশীর ভাগ আশ্রমবাসেরই চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। পাকা প্রাসাদাবলী বা পাথরের মন্দির বেশী কিছু নেই। কখন কখন অতি প্রাচীন মাটির আবাসগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে একেবারে অটুট। কোনো কোনো প্রাচীন কীর্ত্তিতে দেয়ালের গায়ে পৌরাণিক গল্পগুলি খোদাই করা আছে। জলাধারের মুখগুলিতেও নানা প্রকারের আলঙ্কারিক ভাস্কর্য্য দেখা যায়। অনেক যায়গায় স্নান-পুণ্য লাভের জন্য তৈরী শান-বাঁধানো জলাশয়ের ধারে এবং পাথরের বড় বড়

জলাধারের গায়ে কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যবদ্বীপের মত পাথরের মন্দির সেখানে বেশী না থাকলেও কতকগুলি পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা 'চণ্ডী' (চণ্ডীমণ্ডপ?) মন্দির আছে। তাতে ভাস্কর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাস্কর্য্যের বিশেষ পরিচয় ছাড়াও প্রাচীনকাল থেকে চিত্রকলা বালীদ্বীপে চলে আসছে। গরুড়, নাগ ও কূর্ম্মঅবতার প্রভৃতির আলঙ্কারিক নক্সা অনেক পাওয়া যায়।

ভারতের বৈদিক যুগের 'ত্রিবংশ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই ভাবে অর্থবিভাগ বালীদ্বীপে এখনো আছে। শূদ্রেরাই আসলে বালীদ্বীপের আদিম বাসিন্দা এবং পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুরা বাণিজ্য-সূত্রে এসে যখন অধিকার বিস্তার করলেন, তখন তাঁরা 'শূদ্র' অর্থাৎ, 'ক্ষুদ্র' শ্রেণীতে গিয়ে পড়লেন। বালীদ্বীপের রাজাদের নামগুলি সবই শ্যামদেশের মতই সংস্কৃত ঘেঁষা এখনো চলে আসছে। হিন্দু-সভ্যতার চিহ্নস্বরূপ প্রতিমা, মন্দির, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র-মন্ত্র, সবই আছে। তা'ছাড়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় শিল্পকলার মধ্যে (বিশেষ স্তূপ ও স্তূপের নিকট প্রাপ্ত পোড়ামাটির শিলমোহরগুলিতে) পাওয়া যায়। সে-গুলিতে যে সব তান্ত্রিক মন্ত্র পাওয়া গেছে, তা বাঙলা দেশ ও নেপালের মত তান্ত্রিক-বৌদ্ধ ভাবাপন্ন। তা'থেকে বোঝা যায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ছাড়াও সমুদ্রপথে তান্ত্রিক-বৌদ্ধ ধর্ম্মও নেপাল ও বাঙলাদেশ থেকে সেখানে গিয়েছিল। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়াঙের গ্রন্থে জানা যায় যে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম সেখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তান্ত্রিক-মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম বালীদ্বীপে

প্রবেশ করেছিল। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ করে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেবেরই তাঁরা আরাধনা করতেন। পরে কিছুকাল হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ একটি যোগ সেখানে ঘটেছিল যে, শিব ও বুদ্ধের একই সঙ্গে পূজা চলেছিল। তাই আজও একদল পুরোহিতকে 'বুদ্ধ' বলা হয় যদিও বৌদ্ধধর্ম্ম বলে কোনো একটি বিশেষ স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বালীদ্বীপে এখন দেখা যায় না। বালীদ্বীপের সঠিক প্রাচীন ইতিহাসের বিষয় সম্পূর্ণ জানা যায়নি। তবে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে সঞ্জয়রাজ যে বালী, যবদ্বীপ, ও সুমাত্রা প্রভৃতির একছত্র অধিপতি ছিলেন, তা জানা যায়। তাই বালীদ্বীপের ভাস্কর্য্যের মধ্যে কখনো কখনো যবদ্বীপের ছাপ অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। সঞ্জয়রাজের পরবর্ত্তী রাজা 'পঞ্চপণ্য' (Pancapana) ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মধ্য-যবদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সেখানে তিনি 'কালাসন' নামক স্থানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরটি তান্ত্রিক বৌদ্ধমন্দির এবং তারাদেবীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

এঁরই সময়ে মহাযান বৌদ্ধের প্রভাব বালীদ্বীপে বেশী দেখা যায়। এই সময় দেব নাগরী অক্ষর সেখানে চলেছিল এবং পরে পহ্লবী যুগের কাওয়ী (Kawi) হরফের আমদানী হওয়ায় তার সংমিশ্রণে একটি বিশেষ হরফের আবির্ভাব হয়েছিল। দশম খৃষ্টাব্দে রাজা কেশরীবর্ম্মদেব অশোকের মত কীর্ত্তি-স্তম্ভ তৈরী করে রেখে গেছেন। তাতে সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী অক্ষরে এবং বালীদেশের প্রচলিত বিশেষ অক্ষরে বালীভাষায় দুটি শিলালিপি রেখে গেছেন। ৯৬২ খৃষ্টাব্দে রাজা চন্দ্রভয়-সিংহ-বর্ম্মদেব একটি

জল রাখবার পাথরের প্রকাণ্ড কুণ্ড রচনা করেছিলেন। এই স্থানটি সেখানে এখন একটি তীর্থে পরিণত হয়েছে এবং সেখানকার লোকেরা সেটিকে "তীর্থ-সপূল" বলে। সংস্কৃত 'তীর্থ' কথাটির মত বালীদ্বীপে আরো অনেক সংস্কৃত কথার চলন আছে বলে জানা যায়। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ-বিষয় অনেক গবেষণা করেছেন। যবদ্বীপের রাজকন্যা যাঁর সঙ্গে বালীদ্বীপের বর্ম্মদেববংশের রাজার বিবাহ হয়েছিল তাঁর নাম পাওয়া যায় "গুণপ্রিয়ধর্ম্মপত্নী।" যবদ্বীপ ও বালীতে সম্রাটকে "মহারাজ শ্রীলোকেশ্বর" বলে অভিহিত করে। এ-গুলি সবই সংস্কৃত নাম।

বালী ও যবদ্বীপ ইতিহাসের মধ্যে এরলঙ্গ রাজের সকরুণ কাহিনীর কথা বল্লে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইনি ৯৯১ খৃষ্টাব্দে বালীদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং যবদ্বীপের রাজা ধর্ম্মবংশের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং যবদ্বীপের রাজ্য রাজার অবর্ত্তমানে তিনিই লাভ করেছিলেন। ১০০৬ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ শত্রুরা রাজপুরী লুণ্ঠন করে এবং বিশ্বাস-ঘাতক কর্ম্মচারীর সাহায্যে রাজ-পরিবারের সকলকে হত্যা করে। ভাগ্যক্রমে এরলিঙ্গ রাজ অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। তিনি সেই সময় বনে বনে ভ্রমণ করে সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে কি ভাবে কাটিয়েছিলেন, তাঁর সংস্কৃত ও যবদ্বীপের বিশেষ ভাষায় লেখা একটি করুণ ইতিহাস থেকে তা জানা যায়। এখন সেটির পাণ্ডুলিপি কলিকাতার যাদুঘরে সযত্নে রাখা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডচ কর্ত্তৃক বালীদ্বীপ সম্পূর্ণ অধিকৃত না হলেও তাঁদের

আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তবে প্রাচীন ভাবের জের এখনো রাজ-দরবার থেকে যায়নি।

প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির মধ্যে মণ্ডপ, মন্দির ও স্তূপ অনেক দেখতে পাওয়া যায়। স্তূপগুলি শুখনো মাটির তৈরী এবং মাটি-চাপা অবস্থায় বহু যুগ থাকা সত্ত্বেও এখনো হৃতশ্রী হয়ে যায়নি। অনেক স্থলেই খুঁড়ে সম্পূর্ণ মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। যে সকল পাথরের মূর্ত্তি পাওয়া গেছে, সে-গুলিকে স্থানীয় লোকেরা আকাশ থেকে পড়া দেবতা বলে অভিহিত করেন। প্রাসাদ ও চণ্ডীমণ্ডপের অনেক চিহ্ন আছে। এইরূপ প্রাচীন প্রাসাদগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি আবার পাহাড়ের গায়ে খোদাই ক'রে বার করা হয়েছে এবং তারই গায়ে মূর্ত্তি-চিত্র খোদিত। কোনো কোনো স্থলে রাজাদের প্রতিকৃতিও ভাস্কর্য্য-চিত্রে আছে। বেদুলু (Bedulu) নামক স্থানে এরূপ অনেক চণ্ডীমণ্ডপ ও প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। মন্দিরের চারপাশে কোনো কোনোটিতে মহিষা-সুরমর্দ্দিনী দুর্গা, গণেশ, মহাদেবী প্রভৃতির ভাস্কর্য্য-চিত্র আছে। বালীদ্বীপে শিব-পূজার খুবই প্রচলন ছিল জানা যায়। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে মোহেন-জো-দড়োতেও শৈব ধর্ম্মের কথাই জানতে পারা যায়। শ্যাম, কাম্বোজ, জাভা (যবদ্বীপ) ও বালীর প্রাচীন ভাস্কর্য্যগুলি দেখলে বোঝা যায় যে সে-গুলি মন্দিরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে ভিত্তি-চিত্রের (Fresco) স্থান অধিকার করেছিল। শ্যাম কাম্বোজে যেমন হিন্দু পৌরাণিক সমুদ্র-মন্থন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রভৃতি ভাস্কর্য্য-চিত্র আছে, তেমনি যবদ্বীপ (জাভায়) বরবুদরের স্তূপ-মন্দিরের পাথরের ভিত্তিতে বুদ্ধের জীবনী ও

জাতকের কাহিনী খোদাই করা আছে। এ-গুলির মধ্যে একটি বিশেষ ছন্দবদ্ধ (Composition) ভাব খুবই সুন্দর। পারামবানামের পাথরের মন্দিরে শ্যামদেশে যেমন ভাস্কর্য্য-চিত্রগুলি জীবন্ত ভাবে ফুটে আছে, এ-গুলিতেও ঠিক সেইভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে যবদ্বীপের ভাস্কর্য্য-চিত্রগুলি বেশ উঁচুকরে গড়া (High relief) এবং শ্যামের-গুলি একেবারে নীচু করে (low relief) তৈরী। এ-গুলি গড়াতে ভিত্তি-চিত্রের চেয়ে অনেক সময় লাগলেও তা আরো বেশীদিন টিকে থাকবে।

যবদ্বীপের (জাভার) প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ থেকে জানা যায় যে বঙ্গোপসাগর পার হয়ে যবদ্বীপে ৭৫ বা ৭৮ খৃষ্টাব্দে বণিক অজিসক সদলবলে বাণিজ্য করবার জন্যে প্রথমে ভারতবর্ষ থেকে আসেন। তা'ছাড়া চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান—৪১৪ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবের বিষয় উল্লেখ করে গেছেন। চীন দেশের পুঁথিতে পাওয়া যায় যে 'হান' সম্রাটের রাজত্বকালে (২৫—৫৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি যবদ্বীপে প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এইরূপ চীন দেশের সাঙ রাজত্বের ইতিহাসে জানা গেছে যে কাশ্মীররাজ গুণবর্ম্মা রাজ্য ছেড়ে ভিক্ষু হয়ে চীনদেশে গিয়ে সেখানে একটি বৌদ্ধ-সঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন। তিনি ৪৩১ খৃষ্টাব্দে নান্‌কিঙে (Nanking) মারা যান। গুজরাটেও একটি প্রবাদ আছে, রাজ্যে নানা প্রকার অশান্তি বোধ করায় শান্তিপ্রিয় একদল ভারতীয় বৌদ্ধ ৬০৩ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ভারত থেকে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও কাম্বোজে উপনিবেশ স্থাপনা করেছিলেন। ভারতের শিল্পকলার এই ভাবেই নানা দেশে প্রচার সম্ভব হয়েছিল

বাষ্পীয় এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রচলনের বহুকাল পূর্ব্বে।

বৃহত্তর ভারতের সকল কথা বলতে গেলে একটি মহা-ভারতের সৃষ্টি হবে। আমরা এখন কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ভাস্কর্য্যের কথাই এবার বলব। যবদ্বীপের বরবুদরের বজ্রস্তম্ভ (বজ্রস্তব্ধ)? ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তিটি ও চিণ্ডিমেণ্ডাতের (Chandi mendut) বুদ্ধ-মূর্ত্তিটির ভাব দেখলে অজন্তাগুহার গর্ভগৃহ মধ্যস্থিত বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তিগুলির কথা মনে হয়। এই মূর্ত্তি-গুলিতে বুদ্ধের আকৃতিতে ভারতীয় ভাবই বেশী আছে। সুদূর চীনের শানসি (Shansi) প্রদেশের গুহা-মন্দিরের গায়ে খোদিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি এবং সুদূর কোরিয়ার কায়োঙ্-য়ুর (Kyóng-yu) বিরাট বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ প্রতিমূর্ত্তি দেখলেই ভারতের প্রভাব এমন কি—ভারতবর্ষীয় কারিগরদের হাতের তৈরী বলেই ভ্রম হয়। চীনদেশের হোনান (Honan) প্রদেশের বিরাট বুদ্ধের আভামণ্ডলের ভিতর যে আলঙ্কারিক রীতিতে গড়া অগ্নিশিখা আছে, সেই ভাবের নক্সাকারী কাজ তিব্বত ও নেপালের চিত্রপটে দেখতে পাওয়া যায়। হোনানের এই বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি প্রায় ২৫ ফুট উঁচু। চীনদেশে ইয়েন-কাঙে (Yuen-kang) সব প্রথমে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধেরা একটি পাহাড়ের নীচে গিয়ে বাস করেছিলেন। ইয়েন-কাঙের পাহাড়ের গায়ে প্রায় ৪৪ ফুট একটি বিরাট ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে। আস্ত একটি পাহাড়ের গা কেটে সেটিকে বার করা হয়েছে। তার পাশেই দাঁড়ানো বরাভয় মুদ্রাযুক্ত বুদ্ধ-মূর্ত্তি তার চেয়ে কিছু ছোট। এই বুদ্ধ-মূর্ত্তির পাদদেশেই প্রাচীন ভক্ত

বৌদ্ধের বসতিটি ছিল। তার পরিত্যক্ত বাড়ীর দেয়াল প্রভৃতির চিহ্ন এখনো দেখতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়টিতেই আবার একটি ত্রিমূর্ত্তি নন্দীবাহন ষড়ভুজ শিবের মূর্ত্তি আছে এবং তারই ঠিক নীচে জটাজূটধারী ভৈরব ত্রিশূল-হস্তে বিরাজ করচেন। এরই নিকটে পরবর্ত্তী যুগের সহস্র বুদ্ধ-মূর্ত্তি খুব ছোট ছোট আকারের এক যায়গায় আছে। এ-গুলিতে বেশ একটু চীন প্রভাব রয়েচে। কিয়াটাঙে চীনদেশে যে একটি বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে, সেটি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় ভাস্কর্য্য বলে জানা যায়।

চীনদেশে প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম কি ভাবে প্রবেশলাভ করেছিল, তার ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। প্রবাদ আছে যে খৃঃ পূঃ ২২০ অব্দে চি'ইনের (Ch' in) রাজত্বকালে সি-লি-ফ্যাঙ (She-Le-Fang) নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনদেশে উপস্থিত হন। সম্রাট তাঁকে বন্দী করার পর একটি সোনার মানুষ এসে দ্বার ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। তাছাড়া আর একটি প্রবাদ আছে যে ৬৮ খৃষ্টাব্দে মিঙ (Ming) সম্রাট স্বপ্ন দেখেন যে একটি বিরাট আকারের সোনার মানুষ তাঁর নিকট আকাশপথ দিয়ে উড়ে এসেচেন। তাঁর মন্ত্রীরা সেই কথা শুনে তাঁকে ভারতবর্ষেব বুদ্ধদেবের কথা জানালেন। সম্রাট ভারতবর্ষে দূত পাঠিয়ে প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম, বুদ্ধ-মূর্ত্তি এবং নানাবিধ শিল্পকলা চীনদেশে আনিয়েছিলেন।

জাপানের ৭ম খৃষ্টাব্দীর তৈরী প্রাচীন হরিওজির (Horioji), কঙ্‌গোবুজির (Kongobuji) ও সোরিঞ্জি (Sorinji) মন্দিরগুলিতে যেসব দেবতাদের প্রতিমূর্ত্তি

আছে, সে-গুলি যে হিন্দুদেবতাদেরই রূপান্তর মাত্র তা' বেশ বোঝা যায়। ওসাকার (Osaka) কওয়ান-সিনজির (Kwanshinji) মন্দিরের ষড়ভুজ চক্র-পদ্মধারী মূর্ত্তিটিও হিন্দু প্রতিমারই রূপান্তর মাত্র। উত্তর চীনদেশে হাজার বুদ্ধের গুহা-মন্দিরে (Thousand Buddha cave-temples) হিন্দু-ঘেঁষা-ভাস্কর্য্যের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। তা'ছাড়া মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারাই হিন্দু দেবতারা চীন ও জাপানে সহজে প্রবেশলাভ করতে পেরেছিলেন। যবদ্বীপের যেমন প্রজ্ঞাপারমিতা একটি মহাযানীয় বৌদ্ধ সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি তেমনি চীন ও জাপানেও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর প্রচলন মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা হয়েছিল। যবদ্বীপের ন্যায় বোরনিও দ্বীপেও একটি প্রাচীন ব্রঞ্জের দাঁড়ানো বুদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। সেটি বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-প্রচারের মূর্ত্তি। দাঁড়াবার বিশেষ ভঙ্গীটি এবং শান্ত ভাবটি দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। তা'ছাড়া শ্যাম, কোরিয়া ও জাপানের অতিকায় বুদ্ধ-মূর্ত্তিগুলিও ভারতশিল্পেরই গৌরব ঘোষণা করে।

আমরা এতক্ষণ ভারতের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণনা লাভ করে যে সকল দেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-শিল্পকলা গড়ে উঠেছিল সেই সব সুদূর দেশের কথাই বলেছি।

জৈন ভাস্কর্য্য

এখন আমরা জৈন ধর্ম্মের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে যে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের উদ্ভব হয়েছিল, তার কথাই বলব। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব ভারতশিল্পের ইতিহাসে (A History of Fine Arts in India and Ceylon) লিখেছেন যে হিন্দু ও বৌদ্ধশিল্পের মধ্যে যেরূপ

রকমারী ভাব ও রীতি দেখতে পাওয়া যায়, জৈন-ভাস্কর্য্য-কলায় সেরূপ বৈচিত্র্য কিছুই নেই। তার প্রধান কারণ জৈনদের ধর্ম্মের মধ্যে এত বেশী নিয়মকানুন ও রূপক-চিহ্নের বাড়াবাড়ি আছে যে সে-গুলির বাঁধা-ধরা বেড়ার ভিতরে শিল্পকলা অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে যেতে পারে নি। তাই শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী এই দুই জৈন শাখার ভাস্কর্য্যকলা দেখলেই বোঝা যায় যে সে-গুলির মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নেই। বেশীর ভাগ জৈনী ভাস্কর্য্য দেখতে পাওয়া যায় রাজপুতানায় এবং সুদূর মান্দ্রাজে। আজকাল জৈনরা বেশী বাস করেন রাজপুতানায় মাড়ওয়াড়ে। মান্দ্রাজে যে তিনটি বিপুল আকারের জৈন-মূর্ত্তি আছে, সে তিনটি মূর্ত্তি এসিয়া খণ্ডের মধ্যে (কিয়াটাঙের বিশাল বুদ্ধ মূর্ত্তি ছাড়া) দাঁড়ানো যত মূর্ত্তি আছে তার চেয়ে অনেক বড়। একটি মূর্ত্তি আছে মহীশূরে শ্রবণ বেলগোলায় (Sravana Belgola) এবং একটি ভেনুরে (Venur) দক্ষিণ কানাড়ায়। এ-গুলি সবই দিগম্বরী শাখার তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি। এ-গুলি বেশ উঁচু যায়গায় তৈরী হওয়ায় অনেক মাইল দূর থেকে দেখা যায়। তিনটির মধ্যে শ্রবণবেলগোলার সব চেয়ে বড় মূর্ত্তিটি উঁচুতে ৫৬½ ফুট এবং কোমরের দিকে চওড়ায় ১৩ ফুট। তাপস তীর্থঙ্করের গায়ে লতা বেষ্টন করে উঠেছে দেখানো আছে। এই বিরাট জৈন-মূর্ত্তিগুলি ১৪৪০-১৪৭৩ খৃষ্টাব্দের তৈরী বলে জানা যায়। জৈন-ভাস্কর্য্যের মধ্যে একমাত্র আবু পর্ব্বতের দিলওয়ারার বিমলা মন্দিরের কথা বল্লেই যথেষ্ট হবে। এটি আগাগোড়া শ্বেত পাথরের তৈরী এবং ১০৩২ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সাহেব বলেন আবু পর্ব্বতের

জৈন-মন্দিরের স্তম্ভ ও ছাদের উপরের কাজের ঐশ্বর্য্য ও কমনীয়তাকে পেরিয়ে যেতে পারে এমন পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। দিলওয়ারার মত বিরাট ব্যাপার না হলেও জয়পুরে সাঙ্গেনীয়ায়ের মন্দিরটির ভাস্কর্য্যকলাও খুবই সূক্ষ্মভাবে তৈরী। মধ্যপ্রদেশে ছত্রপুর রাজ্যে খজরাহোর হিন্দু-মন্দিরের সুচারু ভাস্কর্য্যকলার পাশে জৈন-মন্দিরটির কাজ একেবারেই মলিন বলে বোধ হয়। মহীশূরে সম্প্রতি চন্দ্রভেল্লি (Chandravalli) পাহাড়ের নিকটে প্রাচীন শহরের ভিটা খোঁড়া হয়েছে এবং তারই মধ্যে জৈন মানস্তম্ভ পাওয়া গেছে। এইরূপ মানস্তম্ভ প্রায় সকল জৈন-মন্দিরের সামনেই দেখা যায়। বিষ্ণুব মন্দিরের সামনে যেমন গরুড় স্তম্ভ, শিবের মন্দিরের সামনে ধ্বজস্তম্ভ থাকে, এ-গুলিও ঠিক সেইরূপ। জৈন-স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য খুবই সূক্ষ্ম ও মনোরম। শত্রুঞ্জয়ের চৌমুখ জৈনী মন্দিরের মধ্যেও কিছু কিছু ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে। এ-গুলি ভাস্কর্য্য-হিসাবে খুব ভাল নিদর্শন না হলেও এ-গুলির উপর এক প্রকার সুন্দর পালিস করা আছে। ইলোরায় ইন্দ্রসভা গুহাটি একটি জৈন-মন্দির। ইলোরায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির একই স্থানে পাশাপাশি তৈরী হয়েছিল। তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে কোনো এক সময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব ছিল না এবং সেই কারণেই এরূপ ঘটতে পেরেছিল। গোয়ালিয়ার দুর্গের নীচে পাহাড়ের গায়ে খোদিত প্রায় ২৫ ফুট উঁচু দিগম্বর তীর্থঙ্করের মূর্ত্তিটি জৈন-ভাস্কর্য্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ সরকারী মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষ হামিরপুর জেলায় মহোবা পরগণায়

একটি গণ্ডগ্রামের নিকট মাটি খুঁড়ে অনেকগুলি কালো কষ্টিপাথরের উচ্চ পালিস করা এবং শ্বেত পাথরের জৈন মূর্ত্তি আবিষ্কার করেচেন। সপ্তমুখী সাপের ফণার নীচে পরেশনাথের মূর্ত্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জৈন-ভাস্কর্য্যকলাকে জানতে গেলে তাঁদের ধর্ম্মের বিষয়ও—বিশেষ করে তীর্থঙ্করদের কথা জানা দরকার। ২২ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে প্রধান তীর্থঙ্করদ্বয় পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের কথাই জানা যায়। পার্শ্বনাথ খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে, এবং মহাবীর খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব যেমন তাঁর বাণী-প্রচার করে গিয়েছিলেন কিন্তু বিশেষ ভাবে কোনো একটি শিষ্যকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে রেখে যাননি, মহাবীর কিন্তু তা' করেন নি; তিনি ইন্দ্র-ভূতিকে নেতা করে রেখে গেলেন। এঁর পরবর্ত্তী অষ্টম নেতা ছিলেন ভদ্রবাহু। এঁর সময় (অর্থাৎ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সময়) উত্তর-ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় জৈন ভিক্ষু সম্প্রদায়ের কতক অংশ দক্ষিণ-ভারতে প্রস্থান করেছিলেন, এবং বারোহাজার জৈনের নেতাস্বরূপ ভদ্রবাহু দক্ষিণে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। উত্তর-ভারতে স্থুলভদ্র রইলেন বাকি জৈনদের নেতা হয়ে। মহাবীর নিজে নগ্ন থাকতেন এবং সংসারের সকল সংশ্রব ত্যাগ করতে সকলকে উপদেশ দিতেন। ভদ্রবাহু সেই নিয়মই মেনে চলায় তিনি এবং তাঁর দলের জৈনেরা দিগম্বর শাখায় পরিণত হলেন এবং এদিকে আবার উত্তর ভারতের স্থুলভদ্র কাপড় পরার পক্ষপাতী হওয়ায় শ্বেতাম্বর শাখার সৃষ্টি করলেন। এই কারণেই দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন জৈন মন্দির এবং বিরাট

জৈন-মূর্ত্তিগুলি পাওয়া যায়। ৭ম খৃষ্টাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের দ্বারাও জৈন-ধর্ম্মের খুব উন্নতি হয়েছিল এবং তারই ফলে দক্ষিণ-ভারতের জৈনদের কেন্দ্রটি বেশ স্থায়ী হয়েছিল সে সময়। কিন্তু ক্রমশঃ শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী শাখার মধ্যে বিরোধের সূচনা হওয়ায় জৈন-ধর্ম্মের প্রভাব ভারতবর্ষে একেবারে কমে গিয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জৈন-ভাস্কর্য্যের ইতিহাসও এই সকল ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায়। জৈন ভাস্কর্য্যকলাকে জানতে হলে তার নানাপ্রকার প্রতীক্-চিহ্ন প্রভৃতির বিষয়ও জানতে হয়। তার মধ্যে প্রধান অষ্টমাঙ্গলিক চিহ্নের কথা বলব :—(১) তীর্থঙ্কর (২) বোধিবৃক্ষ (৩) স্তূপ (৪) ধর্ম্মচক্র (৫) মৎসমিথুন (৬) শ্রীবৎস (৭) স্বস্তিক (৮) কৌস্তুভ। জৈনদের পূজার জন্যে যে 'আয়াগপট্ট' তৈরী হতো তাতে এই সকল চিহ্ন অঙ্কিত থাকত।

অনেক প্রকারের অশান্তি ও অনেক শক হুন প্রভৃতি জাতির অভিযানের ফলে গুপ্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই হিন্দুরাজ্য পাটলিপুত্র থেকে মগধ, বিহার ও বঙ্গদেশ একদিকে, অপরদিকে মধ্যভারতের সমস্তটি মালব, (মালওয়া) গুজরাট (সৌরাষ্ট্র) নিয়ে বিরাট রাজ্যটি স্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই এই রাজ্যটি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁকে বিক্রমাদিত্য বলা হতো। তাঁরই নবরত্ন সভায় অমর কবি কালিদাস স্থান পেয়েছিলেন। মধ্য এসিয়ার হুনদের দ্বারা পুনরায় এই রাজ্য ধ্বংশ হয়েছিল কিন্তু পরে আবার হুনদের হিন্দুরাজারা হটিয়ে রাজ্যের পুনঃ-

হিন্দু ভাস্কর্য্য
গুপ্তযুগ। ৩২০
৬৫০ খৃষ্টাব্দ

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ভাবে সে সময় অশান্তির কাল চলেছিল ভারতবর্ষে। মাঝে মাঝে গুপ্তযুগে যেমন শিল্পের উন্নতি হয়েছিল আবার তেমনি তার ক্ষতিও হয়েছিল এই কারণেই। কনৌজের রাজা হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬—৬৪৭ খৃঃ) লুপ্তপ্রায় গুপ্তসাম্রাজ্য অনেকটা উদ্ধার করেছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সময় হিন্দু-ভাস্কর্য্য-কলার প্রভূত প্রচার হয়েছিল। এদিকে ঠিক গুপ্তরাজ্যের সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষের অন্যত্র অন্ধ্ররাজ পল্লবীর আমলে (৪র্থ থেকে ৯ম শতাব্দীতে) চালুক্য রাজাদের আমলে (৫৫০—৭৫৭ খৃঃ) এবং রাষ্ট্রকূটের আমলে (৭৫৭—৯৭৩ খৃঃ) হিন্দু যুগের ভাস্কর্য্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল বলে জানা যায়। ঠিক গুপ্তযুগের পূর্ব্বে ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধযুগে পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে হিন্দু-দেব-দেবীর মূর্ত্তি উপদেবতা-হিসাবে দেখানো হতো মাত্র। গুপ্তযুগে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে মন্দিরের জন্যে ভাস্কর্য্য ও প্রতিমা গড়া হতে লাগল।

গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্যের মধ্যে ৫ম শতাব্দীর তিগোয়ার মন্দিরটিতে মকরবাহিনী গঙ্গার মূর্ত্তিটি উদয়গিরির গঙ্গা-মূর্ত্তির চেয়ে অনেক সুন্দর। ঝাঁসি জেলায় ললিতপুরের নিকট দেওগড়ের মন্দিরে বিষ্ণুর অনন্তশয্যা, মহাযোগী শিব, ও যোগীর মূর্ত্তি আছে। শিবের ঠিক মাথার উপর স্বর্গের দেবতাদের উৎসবের চিত্র দেওয়া আছে। এখানেই রামায়ণের ভাস্কর্য্য-চিত্রগুলির মধ্যে শিশু রামের ধনুর্ভঙ্গের ছবিটিতে গুরুর পাশে দাঁড়িয়ে রাম ধনুকে জ্যা আরোপ করছেন, এইভাবে দেখানো হয়েছে। তা'ছাড়া কতকগুলি

নৃত্য-গীতের উৎসবের সুন্দর ভাস্কর্য্য-চিত্র এই মন্দিরটিতে আছে। এই ভাস্কর্য্য-চিত্রগুলি দেখলেই ইলোরা ও হস্তি-গুম্ফার (Elephanta) ভাস্কর্য্যের কারিগরির ও সুগঠনের কথা মনে আসে। ভারতবর্ষে নানাস্থানে এইরূপ গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্য মন্দিরগুলিতে ছড়ানো আছে। সে-গুলির বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব। অনাবিষ্কৃতভাবে আছে এরূপ ভাস্কর্য্যেরও অভাব নেই। হর্ষবর্দ্ধনের সময় গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্যের বিস্তার হয়েছিল তা' পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। ইনি নালন্দার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়টির পুনরুদ্ধার ও সংস্কার করিয়েছিলেন। এঁর রাজ্য গুজরাটের বহ্লবী রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ইনি কেবল একমাত্র দক্ষিণে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাস্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

দক্ষিণে পহ্লবীর পরে চোল রাজাদের আমোলেও হিন্দু ভাস্কর্য্যশিল্প দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অটুটভাবে চলেছিল। এই সময়ের মধ্যেই মধ্যভারতের শিল্পকলার প্রভাব সুদূর শ্যাম, কাম্বোজ, বালী, যবদ্বীপ, চম্পা প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল। মথুরা ভারতের ভাস্কর্য্যকলার একটি পীঠস্থান স্বরূপ ছিল বলে জানা যায়। মথুরা মৌর্য্য (৩২৫ খৃঃ পূঃ—১৮৫ খৃঃ পূঃ) এবং সঙ্ঘ বা সুঙ্গ (১৮৫ খৃঃ পূঃ—৭৩ খৃঃ পূঃ) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৌদ্ধযুগের বিশেষ নিদর্শন স্তূপ বা সঙ্ঘের (monastery) চিহ্ন এখন না পাওয়া গেলেও বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন অনেক কিছু সেখানে পাওয়া গেছে। বিশেষতঃ ভাস্কর্য্য খচিত বৌদ্ধ রেলিঙ ও তোরণের খণ্ডিত অংশ অনেক পাওয়া গেছে।

তাতে কোথাও চতুরঙ্গ-সেনা অর্থাৎ অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতিক নিয়ে রাজা চলেছেন বুদ্ধের পূজা কবতে দেখানো হয়েছে, কোথাও বা রেলিঙের থামের উপর পুষ্পভঞ্জিকা ক্রীড়ারতা নারীমূর্ত্তি, কোথাও বা জল প্রপাতের নীচে দাঁড়িয়ে নারীরা স্নান করছে।—হঠাৎ গায়ের উপর ঠাণ্ডা জল পড়ায় সঙ্কুচিত ভাবটি পাথরের চিত্রে চমৎকারভাবে ফুটে আছে। এইরূপ রেলিঙের ভাস্কর্য্য-চিত্রে ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যান-ভঙ্গের ছবি, বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী, যথা :—(১) বুদ্ধের তপস্যা, (২) বুদ্ধের ধ্যান-ভঙ্গ (৩) বুদ্ধেব রাজগৃহের গুহায় অবস্থান (৪) পঞ্চশিষ্যের নিকট সারনাথে ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি ভাস্কর্য্য-চিত্র অনেক দেখতে পাওয়া যায়। মথুরার ভাস্কর্য্য-কলার পরিচয় গান্ধারের আগেকারও কিছু কিছু এবং কণিষ্কের সময়কার পাওয়া গেছে। মথুরায় তার অনেক পরবর্ত্তী গুপ্তযুগেরও ভাস্কর্য্য দেখা যায়। মথুরার ভাস্কর্য্যের পরিচয়ও ভারতের নানাস্থানে আছে, কেননা মথুরার ভাস্কর্য্যের তখন একটি চাহিদা ছিল বলে জানা যায়। মথুরায় যমুনার তট ধৌত হয়ে বৎসরের পর বৎসর কিছু না কিছু ভাস্কর্য্য বের হয়। তাব মধ্যে পোড়া মাটির মূর্ত্তিগুলি তখন খেলনা-হিসাবে তৈরী হলেও তাতে বেশ কারিগরির পরিচয় আছে। ফরাসী ঐতিহাসিক রেনে গ্রুসে (Rene Grousset) অমরাবতী ও মহাবালীপুরমের মূর্ত্তি মধ্যেও মথুরার ভাস্কর্য্যকলার আভায পান। প্রথম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্থাৎ কদপিস্ত প্রথম ও দ্বিতীয়ের সময় মথুরার ভাস্কর্য্যকলার বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। আবার গুপ্তযুগেও ৩২০ খৃঃ থেকে

৫০০ খৃঃ পর্য্যন্ত তার বিশেষ পরিণতি হতে দেখা গেছে। তখনকার বিরাট দাঁড়ানো বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বুদ্ধের জন্মের পর থেকে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম একেবারে লোপ না পেলেও বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে কুষাণ মৌর্য্য, ও সঙ্ঘরাজাদের আমলে ফল্গু নদীর মত অন্তঃ-সলিলা ভাবে চলেছিল এবং পরে ৮ম শতাব্দী থেকে তার ধারা পুনরায় পূর্ণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিল এবং তার জের আজও ভারতে থেকে গেছে। বাণের হর্ষচরিতে আছে মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথ সেনা পরিদর্শনকালে সেনাপতি পোয্য-মিত্রেব দ্বারা নিহত হন এবং তারপর থেকেই সঙ্ঘযুগেব আরম্ভ হয়েছিল। সঙ্ঘযুগেও ভাস্কর্য্যকলার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল কিন্তু পরবর্ত্তী গুপ্তযুগই ভাস্কর্য্যকলার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। গুপ্তযুগেই গান্ধার তীরবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে ভাস্কর্য্যের একটি বিশেষ রূপ দেখা দিয়েছিল। এ-গুলির ভিতর প্রাচীন কালেব ভাস্কর্য্য সাঁচী, ভরহুত, অমরাবতী এবং বিশেষ ভাবে মথুরার প্রভাব দেখা যায়। উল্লিখিত প্রাচীন সকল ভাস্কর্য্যের দোষ গুণ মিলিয়ে গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্যকলার একটি বিশেষ সংস্করণ হয়েছিল। সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতি ভাস্কর্য্য-কলায় যেমন রেখা বাহুল্যে ও ভাব প্রাচুর্য্যে মণ্ডিত এবং মথুরার ভাস্কর্য্যে যেমন একটি অতিরিক্ত স্নিগ্ধতার ভাব আছে, গুপ্তযুগের কাজের মধ্যে তার সুন্দর সমাবেশ পাওয়া যায়। তা'ছাড়া ভাস্কর্য্যকলায় তখন শাস্ত্রীয় রীতি প্রতিমামান-লক্ষণ প্রভৃতি এতদূর স্থির করা হয়েছিল যে তাব গণ্ডির বাইরে যাবার উপায় ছিল না গুপ্তযুগের শিল্পীদের।

শিল্প-শাস্ত্রের মান লক্ষণ প্রভৃতির বিষয় জানা না থাকলে গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্যের বিষয় বোঝা যায় না।

খুব প্রাচীন গুপ্তযুগের কাজ দেখতে পাওয়া যায় চন্দ্রগুপ্তের সময় ৪০১ খৃষ্টাব্দে উদয়গিরি গুহার ভাস্কর্য্যে। গুহাটির দ্বারের উপর সার সার কতগুলি ভাস্কার্য্য-চিত্র আছে। তা'ছাড়া সিংহ, মকরবাহিনী গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতির ভাস্কর্য্য-চিত্র আছে। নক্সাকারী কাজ গুলির মধ্যে অমরাবতী ও মথুরার ভাস্কর্য্যের আমেজ পাওয়া যায়। কুমার গুপ্তের সময়কার কাজের মধ্যে বেশ একটু বদল দেখা যায়। গুপ্তযুগের কাজের শেষ পরিণতি হয়েছিল ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে এবং তার পতন হয়েছিল ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতব্দীর শেষভাগে। এলাহাবাদে প্রাচীন ভট্টগ্রাম (গারওয়ায়) প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলি গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্যকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এইসকল ভাস্কর্য্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও প্রথম কুমারগুপ্তের শিলালিপি পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক কড্রিংটন (Codrington) সাহেব এ-গুলিকে ভারতবর্ষের ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে উল্লেখ করেছেন। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে সূর্য্য, ঊষা, এবং বিষ্ণুর মূর্ত্তিই বেশী দেখা যায়। তাছাড়া কৃত্তিমুখ দেওয়া নক্সাকারী কাজ অনেক আছে।

এখানে কৃত্তিমুখের বিষয় কিছু বলা ভাল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা—এগুলিকে সাধারণত 'কীর্ত্তিমুখ' বলে উল্লেখ করেন। কৃত্তিবাস মহাদেবেরই রুদ্রমুখাকৃতি কল্পনা করেই এই কৃত্তি মুখের পরিকল্পনাটি শিল্পীরা করতেন। উরোপে ঠিক এইরূপ অর্থহীন বিকটরূপ (grotesque) আলঙ্কারিক শোভা হিসাবে গির্জ্জা প্রভৃতিতে গড়তে দেখা যায়। এ-গুলি হ'ল

আলঙ্কারিক শিল্পের অদ্ভুত রসাত্মক নক্সা ছাড়া আর কিছুই নয়। গারওয়ায় প্রাপ্ত থামের গায়ে মানুষের প্রতিকৃতির সঙ্গে লতা পাতা জড়ানো আলঙ্কারিক ভাস্কর্য্য-চিত্রগুলি খুবই নয়নাভিরাম। স্মিথ সাহেব তার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় স্বচ্ছন্দ-সমাবেশ ভাবের (composition) বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। তা'ছাড়া ঐতিহাসিক কানিঙহাম সাহেব এখানকার আলঙ্কারিক ভাস্কর্য্য-চিত্রটিকে একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প সম্পদ বলে গণ্য করেছেন। ভারতের সকল নক্সাকারী কাজের মধ্যে একটা-না-একটা কিছু অর্থ ও ভাবসম্পদ থাকত। এইরূপ লতাপাতার আবর্ত্তের সঙ্গে মানুষের আকৃতি দেখিয়ে স্বচ্ছন্দ সমাবেশে 'জীবন-লতা' রচনা করা হতো। গারওয়ার ভাস্কর্য্যের মধ্যে কূর্ম্ম-অবতার ও মৎস্য-অবতারের ছবিতে মাছ ও কূর্ম্মের একটা সনাতনী কাল্পনিক (conventional) আকার দিলেও বেশ ভালই দেখায়। তা'ছাড়া এই মূর্ত্তির চেহারাগুলির মধ্যে বিশেষ একটি ধারা (type) আছে। দাড়ির দিকটা ছোট এবং ঠোঁট ওল্টানো হলেও খারাপ লাগে না।

কেননা তাতে অমানুষিক না হলেও অতিমানুষিক দেব-ভাবই এনে দিয়েছে। গারওয়ার এই সকল ভাস্কর্য্য মন্দিরের সঙ্গে ৫ম শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল বলে জানা যায়। গুপ্ত-যুগের কীর্ত্তি নাচনা, কাটরা অজয়গড়, বুন্দেলখণ্ড, দেওগড়, ললিতপুর প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে আছে। নাচনা ও অজয়গড়ের পার্ব্বতীর মন্দির দুটির বর্ণনা কানিঙহাম (Cunningham) সাহেব বিশেষভাবে করেছেন তার মধ্যে একটি দোতালা মন্দির আছে এবং তার দেয়ালে গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্য শোভিত

হয়ে আছে। এরই কাছাকাছি ভিতরগাঁওয়ের ইটের তৈরী মন্দিরটিতে পোড়ামাটির মূর্ত্তিগুলি ৫ম শতাব্দীর গুপ্তযুগের কাজ। এটিতে পোড়ামাটির তৈরী গণেশের মূর্ত্তিটি বেশ হাস্য-রসোদ্দীপক। একরাশ সন্দেশ থালায় নিয়ে গণেশ শুঁড় দিয়ে উদরে ভরচেন এবং কার্ত্তিক তাড়া করায় তিনি পালাচ্চেন দেখানো হয়েছে। গুপ্তযুগের মধ্যে উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যের একটি বিশেষ ধরণ আছে। তা'ছাড়া আবার মধ্যভারতের ভাস্কর্য্য খাজুরাহোর আশ্চর্য্য একটি মিল দেখতে পাই। মহীশূরে নবাবিষ্কৃত চন্দ্রভেল্লির জৈন-মন্দিরের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে আবার খাজুরাহোর ভাস্কর্য্যের সাদৃশ্য আছে। কোনার্কের, ভুবনেশ্বরের এবং খাজুরাহোর ভাস্কর্য্যের মধ্যে বেশ একটি ছন্দগত ঐক্য আছে। কোনার্কের ভাস্কর্য্যের কথা পরবর্ত্তী গৌড়ীয় ও উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যকলা প্রসঙ্গ আলোচিত হবে। খাজুরাহোর (বুন্দেলখণ্ডের) ভাস্কর্য্যকলা দেখলে মনে হয় যেন কোনার্কের মতই ভাস্কর্য্য-অলঙ্কারে জীবন্ত হয়ে আছে। সমস্ত মন্দিরগুলির গায়ে ছোট বড় ভাস্কর্য্যে ভরা। কোথাও গীতবাদ্য চলচে, কোথাও সংকীর্ত্তন হচ্চে, কোথাও বিষ্ণু, নারদ গণেশ প্রভৃতি উৎকীর্ণ আছে। যেন একটা জীবন্ত গতিবেগ সচল হয়ে মন্দিরগুলির গায়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কোনার্কের মতই খাজুরাহোর ভাস্কর্য্য চিত্রগুলির বিষয় বর্ণনাযোগ্য নয়।

গুপ্তযুগের আগে কোনো ভাস্কর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র বড় একটা দেখা যায় না। ভূপালরাজ্যে প্রাপ্ত যশোদা কৃষ্ণের মূর্ত্তিটিকে বেগলার (Beglar) সাহেব ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। উরোপীয়

পণ্ডিতেরা ভারতীয় শিল্পকলার যখন বিচার করেন, তখন তাঁদের মনে নিজেদের দেশের মাইকেল আঞ্জিলো, র‍্যাফেল প্রভৃতির আদর্শ থাকায় ভারতের শিল্পকলাকে তাঁদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে রস পান না। ভারতের কৃষ্টির সঙ্গে যোগযুক্ত না হয়ে যদি তার কেউ বিচার করেন ত এইরূপ বিপদ হবারই সম্ভাবনা। তাঁরা তাই যেখানে যতটুকু তাঁদের নিজেদের রুচির সঙ্গে মেলে সেখানে ততটুকুরই সুখ্যাতি করে থাকেন। তবে উল্লিখিত যশোদা কৃষ্ণের ভাস্কর্য্য মূর্ত্তিতে র‍্যাফেলের ম্যাডোনার আকারগত মিল না থাকলেও রসগত একটা ঐক্য আছে মাতৃত্বের ভাবটি ফোটানের মধ্যে।

গুপ্তযুগের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য্য আমরা পাই ৫ম শতাব্দী থেকে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে কোনো সময়ের তৈরী সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তিটি; এটির বিষয় হ্যাভেল ও কুমারস্বামী তাঁদের অনেকগুলি পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেচেন। তা'ছাড়া জামালপুরের প্রাপ্ত ৭ ফুট উঁচু একটি বুদ্ধমূর্ত্তি মথুরার যাত্নঘরে আছে। এলাহাবাদ জেলায় মানকুমারের প্রাপ্ত বালি পাথরের বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি এবং সুলতান-গঞ্জে প্রাপ্ত তাঁবার বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তি যেটি বারমিংহামের মিউজিয়ামে রাখা আছে; গুপ্তযুগের বৌদ্ধভাস্কর্য্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এই মূর্ত্তিগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে সে-গুলির দেহের পরিমাণের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েচে অথচ তার মধ্যে শারীরতত্ত্ব দেখাবার চেষ্টা করা হয়নি। তাই সে-গুলির সুন্দর সুডৌল ভাব বিশেষ উপভোগ্য। সারনাথের হরিণ-আরাম বিহারের নিকট প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রী,

গুপ্ত যুগের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য

অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্যের সুন্দর নিদর্শন। তার মধ্যে বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন-মুদ্রার প্রতিমূর্ত্তিটি খুবই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এটির প্রশংসা দেশ-বিদেশের শিল্পীরা এবং প্রত্নতত্ত্ববিদেরা করে থাকেন। মূর্ত্তিটি অটুট অবস্থায় পাওয়া গেছে—কেবল নাক ও আঙ্গুলের অংশ মাত্র ভাঙা। এটি ছাড়া এলাহাবাদ জেলায় ভিটা ও দেওরিয়ায় প্রাপ্ত বুদ্ধ-মূর্ত্তিগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানকুমারের ধ্যানী বসা বুদ্ধের মূর্ত্তিটির শিরস্ত্রাণ অনেকটা তিব্বতী লামাদের অনুরূপ বলে কানিংহাম সাহেব উল্লেখ করেছেন।

বুদ্ধ-মূর্ত্তিগুলির মধ্যে গৌতম বুদ্ধের মূর্ত্তি-লক্ষণ হ'ল তার কপালের মাঝখানে 'উর্ণরোম' টিপের মত থাকবে। অজন্তার ২৬ নং গুহার মত বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের শায়িত বিরাট একটি মূর্ত্তি গোরখপুর জেলায় কাসিয়ায় (কুসীনগরে) আছে। বিরাট বুদ্ধ এক হাতে মাথা রেখে শুয়ে আছেন অনন্ত শয্যায়, মুখে শান্তি-মাখানো ভাব। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৬½ ফুট। অজন্তায় গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্যের মধ্যে ১৬নং গুহার গর্ভগৃহের বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে হয়। ২৬নং অজন্তা গুহায় মারের দ্বারা বুদ্ধের ধ্যান-ভঙ্গের চেষ্টার ভাস্কর্য্য-চিত্র আছে। অজন্তায় ১নং গুহার ভিত্তি-চিত্রেও ঠিক এই বিষয়ের চিত্রটি থাকলেও এটি সে চিত্রটির নকলে তৈরী হয়নি। এ দুটির মধ্যে সুছন্দ সমাবেশের এবং রসগত সৌন্দর্য্যের বেশ মিল দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমশ মধ্যযুগে বুদ্ধদেবকেও দশ অবতারের এক অবতার-রূপে পূজা না করলেও হিন্দুরা তাঁকে মেনে নিয়েছিলেন। তাই দেখা যায় বাঙলাদেশে চট্টগ্রামে এখনো বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুরা মানেন। বাঙলাদেশের মনসা-

পূজার ভিতর বৌদ্ধ পুরাণের নাগরাজ মুচলিন্দেরই কথা মনে আসে। নাগরাজই বুদ্ধদেবকে বুদ্ধগয়ায় তপস্যাকালে তাঁর ফণা দিয়ে ৪০ দিন জল-ঝড় থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

ইলোরায় বিশ্বকর্ম্মা-চৈত্য স্তূপের গায়ে যে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তিটি আছে, সেটির বসার ধরণের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের একটি বিরাট বুদ্ধের বসার খুব মিল আছে। কেবল হাতের মুদ্রার মধ্যে কিছু তফাৎ দেখা যায়। ব্রহ্মদেশের চেয়ারে বসার মত ভাবে বসা মূর্ত্তিটিকে উবোপীয়-ধরণের-বসা-বুদ্ধ বলে প্রত্নতত্ত্ব-বিদেরা উল্লেখ করেন। অথচ এরূপভাবে বসা বুদ্ধের দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে যথেষ্ট আছে। বুদ্ধ মূর্ত্তি গুলি গড়ার মধ্যে একটি বিশেষত্ব এই আছে যে বুদ্ধের মূর্ত্তির আশেপাশে অন্যান্য মূর্ত্তিগুলি তুলনায় সর্ব্বদা ছোট করে গড়া হতো। জৈন তীর্থঙ্করদের বেলায়ও ঠিক তাই। বুদ্ধদেবকে মানুষের উপর এক ছত্রের অধিপ-স্বরূপ অসাধারণত্ব দেখাবার জন্য তাঁর মাথার উপর ছত্রদণ্ড দেবারও প্রথা দেখা যায়। এইরূপ বিরাট পাথরের ছাতার নমুনা সারনাথ ও লক্ষ্ণৌর যাদুঘরে আছে। বুদ্ধের শরীরকে বিশাল ও বিরাট দেখাবার জন্যে কোমরের দিকটা সরু এবং কাঁধের দিকটা বিশাল করা হতো। তা'ছাড়া বুদ্ধ ও তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তিকে কখনো হেলানো ভাবে গড়া হতো না। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত ধ্যান-স্তব্ধ ভাবই বুদ্ধের ভাব ছিল।

দক্ষিণে মধ্যযুগের চোল, পহ্লবী, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজাদের আমলের ভাস্কর্য্যকলা যা রামেশ্বর, তাঞ্জোর, মাদুরা প্রভৃতি

মন্দির ও গোপুরমগুলিতে আছে, তার কথা বলার আগে চালুক্যরাজদের আমলে তৈরী মন্দিরগুলির ভাস্কর্য্য ও কাঞ্জিভারামের (কাঞ্চির) ভাস্কর্য্য-কলার কথা বলতে হয়। এ-গুলি চালুক্য ও হয়সালার রাজাদের দ্বারা দক্ষিণে দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল। অহিঙল ও বিজাপুরের বাদামীগুহায় প্রথম পুলকেশীর রাজত্বকালের (৫৫০-৫৬৬ খৃঃ) ভাস্কর্য্য পাওয়া গেছে। এ-গুলির মধ্যে পৌরাণিক গল্প অবলম্বন ক'রে তৈরী অনেক ভাস্কর্য্য-চিত্র আছে। সে-গুলি দেখে স্মিথ সাহেবের যদিও পছন্দ হয়নি,* কিন্তু যাঁরা হিন্দু ধর্ম্ম ও পুরাণের বিষয় কিছু অবগত আছেন তাঁদের পক্ষে এই সব শৈল-চিত্রাবলী—একেবারে জীবন্ত জিনিষ। প্রত্যেক থামের ব্রাকেটের উপর সুন্দর রাধাকৃষ্ণের ও অন্যান্য পৌরাণিক ভাস্কর্য্য-চিত্র আছে।

মধ্য যুগের ভাস্কর্য্য (চালুক্য)

মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরটিতে মীনাক্ষীর বিবাহের ভাস্কর্য্য-চিত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি চোল-রাজদের তৈরী। প্রবাদ আছে, চোল রাজকন্যা কুমারী বিদ্যাবতী মীনাক্ষীদেবীর পূজা করতেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে একটি বালিকা-রূপে দেখা দেন এবং বিদ্যাবতীর সঙ্গে বীণা বাজান। বিদ্যাবতী এতদূর আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মীনাক্ষী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর একদিন পুনরায় দেখা দিয়ে বল্লেন যে রাজকন্যা যখন মাদুরার রাণী হবেন, তখন তাঁর কন্যা-রূপে পুনরায় তিনি আবির্ভূতা হবেন।

*History of Fine Arts in India and Ceylon পৃঃ ২১০

এর ঠিক পরেই দক্ষিণ-ভারতে পহ্লবীরাজ প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ (৬০০-৬২৫ খৃঃ) অর্কট, দক্ষিণ অর্কট, চিঙ্গেলপেট এবং ত্রিচিনাপল্লীতে অনেক পাথরের মন্দির ও তারই সঙ্গে ভাস্কর্য্যকলার নিদর্শন রেখে গেছেন। মহেন্দ্র বর্মণের পুত্র প্রথম নরসিংহ বর্মণকে 'মহামল্ল' বলা হতো এবং তারই নামে মহামল্লপুরম্ বা মহাবালীপুরম্ নামটি উদ্ভুত হয়। এই মন্দিরগুলি আস্ত পাহাড়ের পাথর কেটে রথের মত তৈরী হয়েছিল। মহামল্লপুরমে এই সব রথের গায়ে, মন্দিরের গায়ে এবং পাহাড়ের বিরাট দেয়ালের গায়ে ভাস্কর্য্য-চিত্র তৈরী করা হয়েছিল। এই ভাস্কর্য্যের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে গড়া বাঁদরের, সিংহের, হরিণ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি আছে। এ-গুলি দেখলেই সারনাথে অশোকের আমলের কীর্ত্তিস্তম্ভের কলসের গায়ে খোদিত জন্তু-জানোয়ারের কথা মনে আসে। তা'ছাড়া অশোকের আমলের বরাবর গুহায় অজীবক সাধুদের গুহা-মন্দিরের প্রবেশ-পথের উপরে হাতীর সারের ছবির বিষয়ও স্মরণ হয়। মহামল্লপুরমের সিংহের প্রতিমূর্ত্তিটীর প্রশংসা ঐতিহাসিকেরা করে থাকেন। এটি ৭ ফুট লম্বা এবং গঠন ও আকার বেশ সুসামঞ্জস্য ভাবে গড়া। এখানে অর্জ্জুনের কঠোর তপশ্চর্য্যার চিত্রটি বিরাট পাথরের গায়ে খোদাই করা আছে। দেব-দানব প্রভৃতি নিয়ে অসংখ্য মূর্ত্তি তাতে রয়েছে। এ-গুলির প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে কত যত্ন করে সে-গুলিকে বাটালি দিয়ে শিল্পীরা খুদে বার করেছেন পাথরের গায়ে। এ-গুলিতে ইলোরার ভাস্কর্য্য-চিত্রগুলির মত ছন্দ-লালিত্য দেখানো

পহ্লবী

না হলেও কারিগরির ও রসগত ভাবের মোটেই অভাব নেই।

মধ্যযুগের ভাস্কর্য্যের মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীর অবলোকিতেশ্বর ৩½ ইঞ্চির ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি সারনাথ থেকে যা পাওয়া গেছে, মার্সেল সাহেব বলেন, একমাত্র চীনদেশের শিল্পীরাই সেরূপ ছোট ও সুন্দর মূর্ত্তি তখনকার কালে গড়তে পারত। মধ্য যুগের হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের ভাল নিদর্শন পাওয়া যায় গুহামন্দিরের ভাস্কর্য্য-চিত্রগুলি থেকে। ভাস্কর্য্য-চিত্র দু'রকমের হয়, (১) খুব নীচু করে গড়া (২) এবং অপরটি বেশ উঁচু করে গড়া, যাতে আলোছায়া এমনভাবে পড়ে—যেন মনে হয় দেয়াল থেকে সে-গুলি স্বতন্ত্রভাবে তৈরী। ইংরাজীতে একটিকে low relief এবং অপরটিকে half round relief বলে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর বাদামী গুহা, ইলোরা ও এলিফেন্টায় (হস্তীগুম্ফা) বিশেষ করে হিন্দু ভাস্কর্য্য পাওয়া যায় এবং এ-গুলি সবই বেশ উঁচু করে গড়া। এই ভাস্কর্য্য-চিত্রগুলির সুচ্ছন্দ-সমাবেশ দেখলে এ-গুলিকে খুব উচ্চ স্তরের শিল্পকলা বলে মনে হয়। এ-বিষয় হ্যাভেল ও কুমারস্বামী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য-চিত্রের চেয়ে এ-গুলি অনেক উঁচুদরের শিল্পকলা। এই সব চিত্র-ভাস্কর্য্য এক একটি বড় চিত্রকলার মত রেখা ও ছন্দে এমন সজীব যে কারো সাধ্য নাই তার একটি অংশেরও বদল করে। বড় কবির কবিতার যেমন একটি কথাও কেহই বদল করতে পারে না, যেমন বিধাতার সৃষ্ট একটি ফুলের পাপড়ির উপর আরো পাপড়ি তৈরী করে তার সৌন্দর্য্য বাড়াতে পারা যায় না, এই ভাস্কর্য্যকলা ঠিক সেই ভাবেই নিখুঁত ও স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যে

পরিপূর্ণ। এ-গুলির ভিতর ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব ও চিত্রের মাধুর্য্য দুই এক সঙ্গে বর্ত্তমান।

পহ্লবীর পরেই রাষ্ট্রকূটের (৭৫৩ খৃঃ) আমলের ইলোরা ও (হস্তীগুম্ফায়) এলিফাণ্টায় ভাস্কর্য্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়। ইলোরায় দশ-অবতার-গুহায় ভৈরব ও কালীর

রাষ্ট্রকূট

চিত্রাবলী—৭০০ খৃষ্টাব্দের তৈরী। ছবি-গুলিতে ভৈরব ও রুদ্রকালীর রুদ্রভাব তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। এ-গুলি সব তান্ত্রিক ভাবাপন্ন ভাস্কর্য্য-চিত্র। তন্ত্রশাস্ত্রের গুহ্য বিষয়গুলি না জানা থাকলে এ-গুলির সম্যক পরিচয়-লাভ করা শক্ত। তবে এ-গুলিতে শিল্পীরা রেখাচ্ছন্দে একটি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য যা এনেছেন, তা দেখলে সকলেরই ভাল লাগে। একটি চিত্রে আছে, যমের হাত থেকে মার্কণ্ডেয়কে শিব বাঁচাচ্ছেন। এটির মধ্যে কোনো উদ্দাম ভাব নেই। কৈলাস-গুহায় লঙ্কেশ্বর-বিভাগের শিবের তাণ্ডব নৃত্যটি একটি ভারত-শিল্পের গৌরবস্বরূপ। এই গুহাতেই রাবণ কর্ত্তৃক কৈলাসপতির আরাধনার ছবিটিতে শিব ও পার্ব্বতী একটি উচ্চ শিখরে প্রশান্তভাবে বিরাজ করছেন, আর নন্দী এবং দেবতারা সেখানে আছেন। তারই ঠিক নীচে একটি গুহার মধ্যে দশানন-রাবণ নতজানু হয়ে শিবের তপস্যা করছেন দেখানো হয়েছে। এই ছবিটির সঙ্গে শ্যামদেশের পারাম্বানামের প্রাচীন মন্দিরের গায়ে দশাননের কৈলাস পর্ব্বত টলানোর ছবিটির বেশ মিল আছে। ছবির ছন্দ-সমাবেশ (Composition) প্রায় একই ধরণের। ইলোরার কৈলাস-গুহার শিব ও পার্ব্বতীর গঠনের মধ্যে শিবের চিরতারুণ্যের কমনীয়তা ও পার্ব্বতীর দেহলতার

লাবণ্য-সৌন্দর্য্য খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। নন্দীকে দ্বারে প্রহরীর মত ভাবে দেখানো হয়েছে। আর একটি ভাস্কর্য্য-চিত্রে ভৈরব শান্তমূর্ত্তিতে রাবণের সামনে প্রকাশমান, কিন্তু তাঁর সঙ্গী ভূতপ্রেতের দল রাবণকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। কতকটা বুদ্ধ ও মারের ছবির মত। এই গুহাটিতে একটি নরসিংহ-অবতারের ভাস্কর্য্য-চিত্র আছে — সেটিও একটি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য। এ-গুলির বিষয় হ্যাভেল সাহেব তাঁর পুস্তকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ইলোরার এই কৈলাস-গুহা-মন্দিরের দু-পাশের গঙ্গা ও যমুনার প্রতিমূর্ত্তি দুটি 'ভারত-শিল্পের ভিনাস' বলা যেতে পারে। অবশ্য এ দুটি দেহলতার সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তার কথা ভাল করে বুঝতে গেলে ভারতের প্রাচীন কাব্যকলা ও কৃষ্টির পরিচয় নিতে হয় আগে। কেবল বিলাতি ভিনাসকে মনে রেখে এ দুটিকে দেখলে কোনোই রস হয়ত পাওয়া যাবে না।

ইলোরায় রামেশ্বর গুহায় থামের পাশে যক্ষিণী-মূর্ত্তিটির সঙ্গে সাঁচীর তোরণের দু-পাশের যক্ষিণীদ্বয়ের বেশ একটু সাদৃশ্য আছে। কেবল ভঙ্গীর দিক থেকে দেখলে সাঁচীর মত এটি ত্রিভঙ্গ নয়, দ্বিভঙ্গ মাত্র এবং দু-পাশে দুটি শিশুমূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। দশ-অবতার-গুহায় ইলোরার কল্যাণ-সুন্দর শিবের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহের ছবিটির কথা বলা দরকার। ব্রহ্মা শিবের নিকট হাঁটুগেড়ে যৌতুক দিচ্চেন (কতকটা নবাবী আমোলে রাজাদের নিকট 'নজর' দেবার মত কায়দায়) আর চার পাশে উৎসব লেগে গেছে। শিবের চার হাত, ডান হাতে পার্ব্বতীর ডান হাতটি ধরে আছেন

(কতকটা 'শেকহ্যাণ্ড' কায়দায়)। জটামুকুটধারী শিবের মুখে অনির্ব্বচনীয় শান্ত একটি ভাব ফুটে আছে। এখানে কিন্তু পার্ব্বতীকে শিবের বামপার্শ্বে দেখানো হয়নি, ডান দিকে তিনি আছেন। রামেশ্বর-গুহায় বিরাট লম্বোদর-গণেশ শুঁড় তুলে নাড়ু খাচ্চেন। এটিতে গাম্ভীর্য্যের মধ্যে ঈষৎ কৌতুকের ভাব যেন জড়িয়ে আছে।

বম্বের ৮ম শতাব্দীর তৈরী এলিফান্টা বা হস্তীগুম্ফার ভাস্কর্য্যের মধ্যে ত্রিমূর্ত্তির কথা গোড়াতেই বলা দরকার। কেননা ভারত-শিল্প-ইতিহাসে তার স্থান খুবই উঁচুতে। এই ত্রিমূর্ত্তিটির মধ্যে ভারতের ভাস্কর্য্যের বিশেষত্বটি ফুটে আছে। ভাস্কর্য্যের মধ্যে যে একটি আত্মস্থ ভাব থাকার প্রয়োজন, সেটি এই মূর্ত্তিতে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। মনে হয় যেন সমগ্র জগৎটা তার মধ্যে মগ্ন। তাই সেই ত্রিমূর্ত্তিটির কেবল তিনটি বিরাট মাথার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তার কোথায় যে অসম্পূর্ণতা আছে, তার কথা মনেই আসে না। ভাল করে দেখলে মূর্ত্তির পুরু এবং ঘোরানো ঠোঁট হয়ত আধুনিক লোকের মনে বিরাগেরই উদয় হবে। এই গুহাটিতেই শিবের বিবাহের চিত্র, বুদ্ধের মহাধ্যানী-মূর্ত্তি প্রভৃতি অমূল্য ভাস্কর্য্য-সম্পদ পূর্ণ। এই গুহার প্রবেশ-পথের দুটি দেবদ্বারীর শান্ত মূর্ত্তি দেখলেও পুলকিত হতে হয়।

বম্বে অঞ্চলে কাঠিওয়াড়ে সেজাকপুরে ৭ম শতাব্দীতে বালিপাথরে তৈরী নবলক্ষ্মীর মন্দিরের ভাস্কর্য্য, ও পুরন্দর পর্ব্বতে পুণা জেলায় হরিহর মূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক হিন্দু ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে। ধারওয়ার জেলায় দ্বাদশ শতাব্দীর

কিরুবতীর মন্দিরের অসংখ্য ভাস্কর্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোয়ালিয়ারের 'সাসবহু' (শাশুড়ী ও বধূ) মন্দির দুটিতে এবং তেলিকা মন্দিরে বহু ভাস্কর্য্য আছে। এই সব মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্য্য মূর্ত্তিগুলি মন্দিরের অলঙ্কারস্বরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-গুলিকে স্বতন্ত্রভাবে যদি দেখা যায়, তবে কতকটা তার শ্রীও হ্রাস হয়ে পড়ে। উরোপের প্রাচীন গির্জ্জাগুলিতে এইরূপ যে সকল ভাস্কর্য্য অলঙ্কারস্বরূপ আছে, সে-গুলির সঙ্গে গির্জ্জার স্থাপত্যের কোনোই যোগ নেই; অর্থাৎ সে-গুলিকে স্থাপত্য থেকে স্বতন্ত্র করে দেখলে বরং ভালই দেখায়। ভারতের ভাস্কর্য্য-স্থাপত্যের একটি অঙ্গ এবং এইটি তার একটি বিশেষত্ব। যেখানে সেটি স্থাপত্যের অলঙ্কারস্বরূপ তৈরী করা হয়েছে, সেখানে স্থাপত্যটিকে একটি সম্পূর্ণতা দিয়েছে ভাস্কর্য্য; আর তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

মধ্যপ্রদেশে খারোদের বিষ্ণু-মন্দিরটি ৮০০ খৃষ্টাব্দে তৈরী; এটিতে বরাহ-অবতার, গঙ্গা, যমুনা, প্রভৃতি ভাস্কর্য্যকলার সকলেই সুখ্যাতি করেন। সিরপুরে লক্ষ্মণ-মন্দিরের ভাস্কর্য্য ও রাজীমের রামচন্দ্র-মন্দিরে ৮ম শতাব্দীর বিরাট ত্রিবিক্রম বিষ্ণু-মূর্ত্তিটি দেখলে মনে বিস্ময় জাগে! ভয়ে পাশে বাসুকি তটস্থ—পাতালে বামনের তৃতীয় পদের ভর তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না! এটি ছাড়াও বিস্তর ভাস্কর্য্যকলার নিদর্শন আছে। রাজীমের কালেশ্বর-মন্দিরটিতে বিরাট একটি গহনা-পরা নারী-মূর্ত্তি আছে। কড্রিঙটন (Codrington) সাহেব এটির বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। গোয়ালিয়ারের সুরওয়ার মন্দিরে ছাদের নীচের কারুকার্য্য অনেকটা আবু-পর্ব্বতের দিলওয়ারা জৈন মন্দিরের ছাদের কাজের মত

সুন্দর। তা'ছাড়া মন্দিরটির মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে ভাস্কর্য্য-চিত্র খচিত আছে। সেখানকার নৃত্য-গীতোৎসবের ভাস্কর্য্য-চিত্রটি দেখলেই বাঙলার প্রাচীন পাটার উপর আঁকা সংকীর্ত্তনের ছবি কিম্বা খাজুরাহোর নৃত্যোৎসবের ভাস্কর্য্য-চিত্রের কথা মনে আসে। প্রবেশ-দ্বারের মাঝখানে গরুড়-বাহন চতুর্ভুজ বিষ্ণু শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে বসে আছেন এবং তার ঠিক পিছনে তুই সার খুব সূক্ষ্ম ক'রে দেবতাদের ছবি দেখানো হয়েছে। তারই ঠিক উপরে কিন্নর ও অপ্সরাদের নৃত্য চলছে। হিমালয়ে কুলু উপত্যকার বাজোরার মহাদেবের মন্দিরটিতে বিষ্ণু-মূর্ত্তি আছে; এটি ১০ম শতাব্দীর তৈরী একটি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য।

মধ্যযুগের ভাস্কর্য্যের মধ্যে কাঠিওয়াড়ের ঘুম্‌লীর নব-লক্ষ্মীর মন্দিরে যে সব ভাস্কর্য্যকলা আছে, সে-গুলির নক্সা-কারীর সঙ্গে খাজুরাহোর বেশ মিল আছে, কিন্তু এ-গুলিতে সেরূপ প্রাণ নেই। পালিতানায় (কাঠিওয়াড়ে) শত্রুঞ্জয় মন্দিরে ১০ম শতাব্দীর ভাস্কর্য্য আছে। বংশীবাদক, অশ্বারোহী প্রভৃতির ভাস্কর্য্য-চিত্র অনেক আছে। অশ্বারোহীর মাথায় মেয়েদের মত ঝুঁটি-বাঁধা, পরণে জাঙ্গিয়া —অনেকটা বাগগুহার ভিত্তি-চিত্রের মিছিলের ছবির মত। আমাদের দেশে একমাত্র উড়িষ্যায় এইরূপ ঝুঁটির রেওয়াজ আছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ কল্পনা করেছিলেন পদ্মাকার। তাই দেবতাদের আসনেও পদ্ম থাকত এবং ভাস্কর্য্যের মধ্যে নক্সাকারী কাজেও এত পদ্মের ছড়াছড়ি ছিল। উরোপে যেমন 'হনিসাকল' (Hony suckle) ফুল, ইজিপ্তে কুমুদফুল, তেমনি ভারতের

পদ্মফুলই আলঙ্কারিক শিল্পের বিশেষ বাহনস্বরূপ। মধ্য-যুগের ভাস্কর্য্যের মধ্যে ছত্রপুর রাজ্যে (বুন্দেলখণ্ডে) খাজুরাহোর মন্দিরাবলীর ভাস্কর্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এ-গুলি ৯ম থেকে ১১ দশ শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল। বিশ্বনাথের মন্দির, সূর্য্যমন্দির, ব্রহ্মা, বরাহ, মহাদেব প্রভৃতির মন্দিরগুলি ভাস্কর্য্যে খচিত আছে। কেবল নেমিনাথ তীর্থঙ্করের জৈন-মন্দিরেই ভাস্কর্য্য নেই বল্লেই হয়। বিহার-অঞ্চলে বিক্রম-শিলায় পাহাড়ের গায়ে অনেক ভাস্কর্য্যকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। একেবারে খোলা যায়গায় থাকার দরুণ মূর্ত্তিগুলি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকগুলি মুখবিশিষ্ট গরুড়বাহন বিষ্ণু-মূর্ত্তিটি এবং দধিমন্থনের ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গৌড়ীয় ও উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য

ব্রহ্মদেশের ভাস্কর্য্যকলার বর্ণনা-প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই রাজসাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত চৈত্য-মন্দিরের কথা বলেছি। সেইটিকেই বাঙলাদেশের সব চেয়ে পুরাতন বৌদ্ধমন্দির বলা যায় এবং তার পাশে যে সব ভাস্কর্য্য পাওয়া গেছে, সে-গুলিতে আদিম বৈষ্ণবহিন্দু-ভাস্কর্য্যের পরিচয় আছে। মন্দিরের বৌদ্ধ-মূর্ত্তিগুলি ছাড়া ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কৃষ্ণরাধার প্রতিমূর্ত্তি যা' সেখানে পাওয়া গেছে, তা' থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব উভয় ধর্ম্মেরই এটি একটি কেন্দ্র ছিল। যেমন কুষাণরাজাদের আমলে বিশেষ এক ধরণের শিল্পকলা মথুরা থেকে নিয়ে উত্তর ভারতে নানাস্থানে প্রাণ পেয়েছিল, তেমনি বাঙলাদেশে পাল রাজাদের সময় একটি বিশেষ ভাস্কর্য্যকলা সমগ্র বাঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাম্রশাসন, শিলালেখন এবং মূর্ত্তির গায়ের

লিপিগুলি থেকে জানা যায়, ধর্ম্মপাল, দেবপাল, নারায়ণ পাল, মদন পাল প্রভৃতি রাজাদের আমলে ভাস্কর্য্যকলার সবিশেষ প্রচার হয়েছিল। আজ পর্য্যন্ত বিস্তারিতরূপে বাঙলার গৌড়ীয় ইতিহাস রচিত না হওয়ায় অনেক বিষয় আমরা এখনো অবগত নই। তবে ভাস্কর্য্যকলা যা' বিক্ষিপ্ত-ভাবে বাঙলাদেশে পাওয়া গেছে, তা' থেকে গৌড়ীয় শিল্পের প্রভাব বেশ বোঝা যায়। গৌড়ীয় শিল্পকলা এতদূর সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল যে গৌড়ীয় রীতি ৯ম থেকে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রাবস্তী থেকে নিয়ে আসাম, ব্রহ্ম, শ্যাম, মলয়, যবদ্বীপ এবং উত্তর তিব্বত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

ধর্ম্মপালের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে এবং তাঁর পুত্র দেবপালের প্রায় ৪০ বৎসরব্যাপী রাজত্বের সময় গৌড়ীয় শিল্পের খুব উন্নতি ও প্রচার হয়েছিল। এই পাল রাজাদের সময় থেকেই বাঙ্গলা-লিপির যা' একটি বিশেষ রূপ ও ক্রমবিকাশ হয়েছিল, তাই আজও চলে আসছে। দিনাজপুরের বিষ্ণু-মূর্ত্তি, বিক্রমপুরের ও রাজসাহীর গঙ্গা-মূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গৌড়ীয় শিল্পকলা আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজসাহীর প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে এবং কলিকাতার মিউজিয়ামে তার অনেক নিদর্শন রাখা আছে। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সম্প্রতি একখানি পুস্তকে এইগুলির বিষয় বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার ইতিহাস পুস্তকেও কিছু কিছু লিখেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিহাসখানি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে বাঙ্গলার ভাস্কর্য্যকলা পাথরের চেয়ে বেশী পোড়ামাটিরই (Terra-cotta) পাওয়া যায়।

কেননা, মন্দিরগুলিও বেশীর ভাগ ইটের রচিত হতো। তাই বড়নগরের রাণী ভবানীর মন্দিরে, ত্রিবেণীর নিকট বাঁশবেড়ের মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির ছবিই আমরা দেখতে পাই। এইরূপ পোড়ামাটির বাঙলাদেশে পাণ্ডুয়ায়, গৌড়, মালদহ, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি নানা স্থানের প্রাচীন মন্দিরের গায়ে দেখতে পাওয়া যায়। এই সব চিত্রে বেশীর ভাগ রামায়ণের ও মহাভারত-বর্ণিত বিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং রাজাদের মৃগয়া, উৎসব, নৃত্যগীত প্রভৃতিই দেখা যায়। প্রাচীনকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বিহারে) একটি বৌদ্ধ-পীঠস্থান ছিল। এখানে অশোক একটি স্তূপ স্থাপনা করেছিলেন বলে জানা যায়। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পরেই বিক্রমপুর যেখানে দীপঙ্কর ও শীলভদ্র জন্মেছিলেন। এই বিক্রমপুর সেন-রাজাদের রাজধানী ছিল। সোনারঙ, দেউল বাড়ী প্রভৃতি নানাস্থানে ভাস্কর্য্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সোনারঙে বারোটি হাতযুক্ত বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েচে। তার মাথায় বাসুকীর ফণার ছাতা। এটির সঙ্গে নেপালের প্রচলিত বোধিসত্ত্বের বেশ মিল আছে। তা'ছাড়া এখানকার আবিষ্কৃত একটি মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে আছে; সেটি মালদহ থেকে পাওয়া গেছে। দিনাজপুরের ব্রহ্মার মূর্ত্তিটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাঙলার সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যার (অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ) কৃষ্টিগতযোগ বহু যুগ থেকে চলে আসছে। তাই এখন আমরা উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যকলার কথা বলব। উড়িষ্যায় পুরী, কোনার্ক ও ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্যকলার একটি বিশেষত্ব আছে। পুরীর একটি মাতৃমূর্ত্তির বিষয় ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব বিশেষ

করে উল্লেখ করেছেন। সস্নেহভাবে মা সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, সন্তানও নির্ণিমেষনেত্রে মাকে দেখছে। ভুবনেশ্বর ও কোনার্কে মূর্ত্তিগুলির গঠন খুবই সুন্দর, কিন্তু ছবির বর্ণিত বিষয় অধিকাংশই অসামাজিক ধরণের। কোনার্কের সূর্য্যমন্দিরের মূর্ত্তিগুলিতে চিত্রের বর্ণিত বিষয় ভাল না হলেও তার গঠন সৌকুমার্য্য ও পরিকল্পনা খুবই উঁচু ধরণের। রথের আকারে মন্দিরটির তলায় যে চাকা পাথরে খোদাই করা আছে, তার ভিতরে অসংখ্য ভাস্কর্য্য-চিত্র খচিত। মোটামুটি মন্দিরটিতে যেন কী এক ঐশীশক্তিরই তেজ ফোটাবার জন্যে কত সব অদ্ভুত বিষয় অবলম্বন করে শিল্পীরা মন্দিরটিকে ভাস্কর্য্য-সম্পদে অলঙ্কৃত করে রেখে গেছেন! কোনার্কের মন্দিরের ছাদের কার্ণিসের উপর বাঁশী, খোল, করতালবাদক বিরাট নারী-মূর্ত্তিগুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এ-গুলিকে এমন ভাবে গড়া হয়েছে যে কাছে গিয়ে কার্ণিসের উপর থেকে দেখলে সে-গুলি স্থূল ও অসম্ভব বলে মনে হয়; কিন্তু দূরে যথাস্থান থেকে দেখলে তার গঠন-সৌকুমার্য্য বেশ স্পষ্ট ধরা পড়ে। এইরূপ হিসাব করে মূর্ত্তি-গড়ার ভিতর যে কতটা অভিজ্ঞতা নিহিত আছে, তা' বেশ বোঝা যায়। এক দিনে বা এক যুগে শিল্পীরা কখনো এতটা পারদর্শী হতে পারেন নি— যুগে যুগে বংশানুক্রমে শিক্ষালাভ করার ফলেই এরূপ সম্ভব হয়েছিল।

ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্যে যে সব হরিণ প্রভৃতি জন্তুর ছবি আছে, তা' দেখে মনে হয় মানুষ কেবল নিজেদের কথাই ভাবেন নি, তারা জন্তুরও দিকে চেয়ে দেখতেন। কোনার্কের বিরাট আকারের হাতী ও ঘোড়ার মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই

বলেছি। পুরীর মন্দির ১১শ শতাব্দীতে এবং কোনার্কের মন্দির দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গঠিত হয়েছিল। যদিও কোনার্কের মন্দিরটি প্রধানতঃ সূর্য্যমন্দির, কিন্তু এর মধ্যে বিষ্ণু ও বালকৃষ্ণেরও মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। ভুবনেশ্বরের কপিলাদেবীর মন্দির, অনন্তবিষ্ণুর মন্দির, রাজারাণীর মন্দির, মুকুটেশ্বরের মন্দির, পরশুরামেশ্বরের মন্দির, প্রভৃতি মন্দির-ছত্রের মধ্যে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর বর্ণনাযোগ্য ভাস্কর্য্যকলা আছে। কপিলাদেবীর মন্দিরটিতে ভাস্কর্য্যগুলি বেশ ঝরঝরে তকতকে ভাবে সাজানো আছে, বাহুল্য মোটেই নেই তা'তে। বাঙলাদেশ ও উড়িষ্যায় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অগোচরে এখনো কিছু কিছু মন্দির থাকতে পারে। সম্প্রতি পাহাড়পুরের বৌদ্ধমন্দিরের আবিষ্কার স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যা করে গেছেন তা'র মধ্যে বাঙলার ভাস্কর্য্য-কলার অনেক নূতন তথ্য পাওয়া গেছে। এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি।

ভারতের বৈদিকযুগের বিশেষ কিছু নিদর্শন পাওয়া না গেলেও বিহারের প্রাচীন ভিটাতে প্রাপ্ত লৌরিয়ানন্দনগড়ের সোনার লক্ষ্মী-মূর্ত্তিটির কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এটি একটি ধাতুমূর্ত্তির আদিম নিদর্শন বলে ধরা যেতে পারে। এটি মোহেন-জো-দড়ো ও হারাপ্পার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করে। সোনার মূর্ত্তিটি দেখলে মনে হয় যেন তারই জের ভরহুৎ, মথুরা প্রভৃতি ভাস্কর্য্যে চলেছিল। সার সার এ-গুলিকে সাজিয়ে রাখলে একই কৃষ্টির ও সাধনা-প্রসূত বলে সহজেই ধরা যায়। সোনার মূর্ত্তিটিকে মৌর্য্য ও কুষাণের অনেক আগে খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দের বলে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা

ধাতুমূর্ত্তি

অনুমান করেন। মহিলা-মূর্ত্তিটির মাথায় ঝুটিবাঁধা, কানে কুণ্ডল ও কোমরে মেখলা আছে। হারাপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে এটির কিছু কিছু মিল আছে। বৈদিক যুগের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আমরা আর এখন খুঁজে না পেলেও রামায়ণে (সীতার বনবাসে) আছে যে রাম স্বর্ণ সীতা গড়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। পাটলিপুত্রে (পাটনায়) প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ থেকে যে একটি খাঁটি সোনার শিব-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটিকে প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত জয়সওয়াল মৌর্য্যযুগেরও পূর্ব্বেকার কোনো সময়ের বলে অনুমান করেন। যদি মূর্ত্তিটি হরগৌরীর সত্যই প্রতিমূর্ত্তি হয়, তা'হলে তিনি বলেন, এরূপ মূর্ত্তি যুদ্ধের সময় পুরুরাজার সঙ্গে ছিল যখন তিনি এ্যালেকজাণ্ডারকে হটাবার জন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু মূর্ত্তিটি কোনো রাজারাণীর প্রতিকৃতি বলেই আমাদের মনে হয়। নালন্দায় ধাতুনির্ম্মিত বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী, বজ্রস্তম্ভ ধ্যানীবুদ্ধ, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি পাওয়া গেছে।

ধাতুশিল্পের কথা বলতে হলেই প্রথমেই দক্ষিণের সুবিখ্যাত ধাতুমূর্ত্তির কথাই বলতে হয়। তা'র মধ্যে তাণ্ডবের মূর্ত্তিটি জগৎ-বিখ্যাত। এটি যে কেবলমাত্র আমাদের দেশের লোকের কাছেই আদৃত হয়েছে, তা নয়; দেশ-বিদেশের শিল্পী ও রসিকেরা এটির সবিশেষ প্রশংসা করেছেন। ভারতের স্থাপত্যে যেমন তাজমহল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে, তেমনি ভাস্কর্য্যকলার এই শিবের তাণ্ডবনৃত্যের ধাতুমূর্ত্তিটি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। এতদিন দেশের লোকের ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি ঔদাসীন্যের জন্যেই এই মূর্ত্তিটি সকলের অজ্ঞাত ছিল এবং হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথের

ভারত-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজনের ফলে আজ সকলেই উহার বিষয় জ্ঞাত হয়েছেন। উরোপের আধুনিক ভাস্করদের গুরু রেঁাদা (Rodin) এই শিবের তাণ্ডব নৃত্যের ধাতুমূর্ত্তিটির বিষয় যা ফরাসিভাষায় লিখে রেখে গেছেন, তার কয়েকটি ছত্র তর্জ্জমা করে দেওয়া গেল। এই ভারতীয় শিল্প-কলায় যে এক বিশ্বজনীনতার ভাব লুকানো আছে, তা' আজ সুদূর পাশ্চাত্যের গুণীর কাছে হঠাৎ প্রকাশ পেয়েছে।

বোদাঁ বলেছেন—একদিকের এক-পেশে ভাব দেখলে শিবের মূর্ত্তিটি মনে হয় যেন একটি অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজ করছে। (শিব যে 'চন্দ্রভাল' তা যদিও রোদা জানতেন না—লেখক) দেহের আকার সম্বন্ধে কতদূর জ্ঞানের গর্ব্ব এতে নিহিত আছে ··

·· ছায়া নড়ে ঠাঁই ঠাঁই এই শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যটির উপর তার কাজ চলে, তাতে দেয় মুগ্ধ করবার মোহন শক্তি ; গভীর সূক্ষ্ম-ভাব আনে—অজানার মধ্যে যেখানে সে এতদিন অজ্ঞাত ছিল···

···ওষ্ঠে আনন্দের সরসী বিরাজ করচে, যার তীরে সুঢৌল নাসিকাটি আছে খুবই মহৎ···

···চক্ষুটি, যার একটি কোণে লুকিয়ে আছে, তার রেখা একেবারে অনাবিল ও স্থির—ঠিক যেন হামাগুড়ি দেওয়া আকাশের তারার মত···

···আজ এই তাঁরার মূর্ত্তিটির সৌন্দর্য্যের আর বদল নেই। আলোর নড়াচড়াও বোঝবার যো নেই। দেখলেই মনেহয় দেহপেশী নড়ে না, সবই ঘূর্ণিচাকার উপরে লাফিয়ে উঠতে প্রস্তুত যদি আলোটিকে সরিয়ে নেওয়া যায়।···

রেঁাদার মত একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী কতদূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা' এইগুলি পড়লেই বোঝা যাবে। কৃষ্ণা

জিলায় মান্দ্রাজে খাল কাটবার সময় কতকগুলি ব্রঞ্জের (মিশ্রধাতুর) বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গেছে। সেগুলি ১ ফুট বা ২ ফুট মাত্র উঁচু, এখন বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। যদিও শরীরের চেয়ে মাথার দিকটা বড় কিন্তু বরাভয় হাতের ভঙ্গীটি খুবই সুন্দর মনে হয়। অজন্তার চিত্রে যেরূপ হাতের আঙ্গুলের লীলায়িত ভঙ্গী আছে এ-গুলিতেও সেইরূপ দেখা যায়। দক্ষিণের ধাতুমূর্ত্তির মধ্যে সেসেনিয়ার রাণাকুম্ভের আনীত কোদণ্ড-রামের মিশ্রধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।* এটি একটি ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি। যদিও হাতের ধনুকটি নেই, তথাপি তার হাতের ভঙ্গীটিতে তা' বোঝা যায়। গোপীনাথ রাও তাঁর পুস্তকে যে তিনেভেল্লির রামের মূর্ত্তিগুলির উল্লেখ করেছেন, এই কোদণ্ডরামটি সে-গুলির চেয়ে অনেক ভাল। তা'ছাড়া রামেশ্বরেও রামের একটি মূর্ত্তি আছে। সোসাদিয়ায় ও একটি ভাল রামের মূর্ত্তি আছে বলে জানা গেছে। এ-গুলি ছাড়া দক্ষিণের ধাতুমূর্ত্তিগুলির মধ্যে সিংহলের প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিটি, আনন্দের ধাতুমূর্ত্তি এবং মান্দ্রাজের গঙ্গাধর শিবের মূর্ত্তিগুলি ধাতুমূর্ত্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দক্ষিণের তাম্রোৎকীর্ণ বটপত্রশায়ী বালকৃষ্ণ, কৃষ্ণের নৃত্য, লক্ষ্মীমূর্ত্তি প্রভৃতি দক্ষিণের একটি বিশেষভাবে গড়া ভাস্কর্য্য-শিল্প। ভারতীয় ধরণের ধাতুমূর্ত্তি গড়ার প্রথা ব্রহ্মদেশের উপকণ্ঠে কাম্বোজে, শ্যাম ও বোর্ণিও দ্বীপে যে কি ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা' গবেষণা করবার বিষয়।

---

*Rupam No 8. Oct 1921 দ্রষ্টব্য।

নেপালের ধাতুমূর্ত্তিগুলির সঙ্গে এ-গুলির তফাৎ এই যে নেপালের মত হাল্কা করে ঢালাই করা এ-গুলি নয়, ঠাস-ঢালাই। তা'ছাড়া নানা প্রকারের ধাতু মেশানোর জন্যে একটি বিশেষ রঙ দেখা দেয়—পুরোনো হওয়ায়। নালন্দায় বালাদিত্যের তৈরী বিখ্যাত বিহার মন্দিরের উত্তর দিকে ৮০ ফুট উঁচু বিরাট তাঁবার বুদ্ধ-মূর্ত্তি ছিল বলে জানা যায়। বাঙলাদেশে বিষ্ণু-মূর্ত্তি, হর-পার্ব্বতী, সপ্তমাতৃকা, দুর্গা প্রভৃতির তাঁবার মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। এখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের যাদুঘরে রাখা আছে।

ধাতু-শিল্পের কথা বলতে গেলে প্রাচীনকালের মুদ্রার বিষয়ও বলতে হয়। কেননা, এই সকল মুদ্রাব মধ্যে রাজাদের মূর্ত্তি, রূপক-চিহ্ন প্রভৃতি থাকত। আমরা ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন মুদ্রা যা' পাই, তাতে কেবল কতকগুলি ধনুক, ত্রিশূল, স্বস্তিক, ও সূর্য্য প্রভৃতির চিহ্ন দেওয়া থাকত (Punch marked)। তাতে কখন কখন বৃষও আঁকা থাকত। পরবর্ত্তী গ্রীক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে (খৃঃ পূঃ ২০০ বা ১০০ শতাব্দীর) গ্রীক রাজাদের এবং পরবর্ত্তী গ্রীক প্রভাবে অনুপ্রাণিত কুষাণ রাজাদের (১০০ খৃঃ) এবং তারও পরের গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায়, মূর্ত্তিচিত্র দেওয়ার রেওয়াজ দেখা যায়। কনিষ্করাজের মুদ্রার মূর্ত্তিগুলি বেশ সুস্পষ্ট। এই মুদ্রাগুলি ছাড়া লঙ্কাদ্বীপে ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে স্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত বুদ্ধের অস্থি-আধারগুলিতে সোনার বুদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। কনিষ্কের আমোলের পেশাওয়ারের নিকট প্রাপ্ত অস্থি-আধারটিতে গ্রীকভাবাপন্ন (গান্ধার) বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। এই সব দেখলে বেশ বোঝা

যায় যে ধাতুর মূর্ত্তি গড়া, ঢালাই প্রভৃতির কাজের চলন এদেশে বহু যুগ থেকেই উৎকর্ষলাভ করেছিল।

প্রায় ছয় শত বৎসর মোগল রাজত্বকালে মূর্ত্তি-গড়ার কাজ হিন্দুরা একেবারে বন্ধ না করলেও তার উৎকর্ষ হয়নি।

মোগলযুগের ভাস্কর্য্য

কেন না, মূর্ত্তি-গড়া মুসলিম ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। এই কারণে প্রাচীন ভাস্কর্য্যকলা ধ্বংস সে সময় হয়েছিল। আকবর শা আগ্রার দুর্গ-তোরণের দু-পাশে দুটি হাতীতে চড়া রাজপুত যোদ্ধার প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়েছিলেন বলে জানা যায়। ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্যে আওরাঙজীব সে-দুটিকে ভেঙে দিয়েছিলেন। এইভাবে মোগলযুগে ভাস্কর্য্যকলা ভাঙনের মুখেই তখন চলেছিল যদিও চিত্রকলার বিশেষ উন্নতি হয়েছিল সে সময়।

আধুনিক কালে ভাস্কর্য্যকলার ক্বচিৎ আদর দেখা যায়। যদিও এখনও মন্দির-প্রতিষ্ঠা পুণ্য কর্ম্ম বলে লোকে মেনে

আধুনিক ভাস্কর্য্য

থাকেন, তবুও ভাস্কর্য্যকলার দিকে লক্ষ্য বড় একটা কারু নেই। এখনো জয়পুর, আগ্রা, এবং কটকে ভাস্করের অভাব নেই, কিন্তু তাদের এখন চাহিদার অভাবে জাত ব্যবসা ছেড়ে লাঙল বা কলম ধরতে হয়েছে। আজকাল লোকে প্রতিকৃতি-ভাস্কর্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী এবং তা' বেশীর ভাগ বিলাত থেকে মার্ব্বেলে বা ব্রঞ্জে তৈরী হয়ে আসে সেখানকার শিল্পীদের দ্বারা। কৃষ্ণনগর ও লক্ষ্ণৌএ পোড়ামাটির মূর্ত্তি-গড়ার চলন বহুকাল থেকে আছে। এখন কেবল খানসামা, ভিস্তী, প্রভৃতির আকৃতি বিদেশী উরোপীয় পরিব্রাজকদের জন্যই তৈরী হয়, শিল্প-হিসাবে তার কোনোই মূল্য নেই।

চিত্রকলা

আদিম অবস্থায় মানুষ পশুর মত কেবল আহার্য্য অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকত। এখনো তার নমুনা পৃথিবী থেকে মুছে যায় নি। আফ্রিকা ছাড়াও ল্যাপ-ল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ডের শ্বেতকায় অসভ্য মানুষেরও অভাব নেই। পরে ক্রমশঃ যখন মানুষের মধ্যে সভ্যতার বিস্তার হ'ল, তখন তা'রি সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম রসানুভূতি জাগল যা' মানুষ দাম দিয়েও কিনতে পারে না, যা' একেবারে তাদের হৃদয়ের বস্তু। তারা তখন তাই কেবলমাত্র আহার্য্য-অন্বেষণকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির না ক'রে, তা'দের গৃহ-সামগ্রী, ঘর-বাড়ী প্রভৃতিকে সুন্দর ক'রে গড়তে ও সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন তা'দের কাছে রূপ-রস-গন্ধটি একটি প্রবৃত্তিমাত্র না হয়ে সত্য হয়ে উঠল। এখনো পর্য্যন্ত পৃথিবীর সেই আদিম অধিবাসীদের সর্ব্বপ্রথম শিল্প-চর্চ্চার নিদর্শন ভারতের গুহাগহ্বরে কয়েকস্থানে পাওয়া গেছে। (১) রায়গড় রাজ্যের মধ্যে সিঙ্গনপুরে, (২) বেলেরীর অন্তর্গত হোসেঙ্গাবাদে, (৩) চক্রধরপুরের সঞ্জয় নদী-বক্ষে পাথরের গায়ে, (৪) এবং মির্জ্জাপুর জেলায় লিখুনিয়া, কোহ্বর, ভালদরিয়া, মহাবারিয়া এবং বিজয়গড়ের গুহার গায়ে আঁকা চিত্র দেখা যায়। (৫) এ-গুলি ছাড়া ঘাটশিলায় ও (৬) বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীর আরো কোনো কোনো স্থানে প্রাগৈতিহাসিক আদিম চিত্রকলার নিদর্শন আছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ ৩০,০০০ বা ততোধিক বৎসরের গুহাবাসীর চিত্রকলা।

এই সব আদিম শিল্পীদের ছবিতে শিকারের বিবরণ, যুদ্ধ এবং যে সব জন্তুদের সঙ্গে তাদের দৈনিক পরিচয় ছিল, সে-গুলির প্রতিকৃতি এঁকে রেখে গেছেন চাব্বর সঙ্গে রঙ মিশিয়ে।

এই সব ছবিগুলি দেখলে মনে হয় যেন ছোট ছেলেরা নতুন ক'রে ছবি আঁকা শিখছে—একেবারে কাঁচা হাতের কাজ। ঘাটশিলার ছবিটিতে মানুষের আকৃতি পাথরের গায়ে খোদাই ক'রে আঁকা আছে। হঠাৎ দেখলে এই রেখাগুলির কোন্ দিকটা যে সোজা তা' নির্ণয় করা সহজ নয়। দেখলে মনে হয় তিনজন যোদ্ধা নিহত হয়ে মাটিতে শয্যা নিয়েছেন এবং আর তিন জন জয়ী বীর বাহু তুলে আনন্দ জ্ঞাপন করছেন। অক্ষরে লিখে ভাব-প্রকাশের আগে মানুষেরা এই ভাবে ছবিতে লেখার মত বক্তব্য প্রকাশ করত, তা' আমরা মিসর প্রভৃতি দেশের লিপিচিত্রে জানতে পারি। গুহা-চিত্রগুলি লিপিচিত্রের অনেক পূর্ব্বের নিদর্শন। সিন্ধুতটের সভ্যতায় মোহেন-জো-দড়োতে যে শিলমোহরের উপর হরফ পাওয়া গেছে সে-গুলি পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মী হরফেরই আদিম আকার বলে অনেক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। লিখুনিয়া পাহাড়ের ছবিগুলিতে হাতী, ঘোড়সওয়ার, হোসেঙ্গাবাদের ছবিতে তীরধনুকধারী যোদ্ধাদের দল বেঁধে যুদ্ধযাত্রার এবং সিঙ্গনপুরের ছবিতে বুনো মোষ শিকার করার দৃশ্য আঁকা আছে। জানা যায় যে নানা প্রকার তাক্তুক, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্যেও এই আদিম মানুষেরা এই সকল ছবি আঁকতেন। এই আদিম মানুষের জের যা' এখনকার নানাদেশের অসভ্য লোকদের দেখা যায়,

তারাও এই প্রকার চিত্র এখনো এঁকে থাকে পূজো-পার্ব্বণের সময়। বাঙলা দেশের আল্পনা আঁকার রীতিটি এই আদিম মানুষের অঙ্কন-রীতিরই একটা জের বলে অনেকে অনুমান করেন। উরোপেও স্পেন প্রভৃতি নানাস্থানে এই-রূপ আদিম চিত্রকলা পাওয়া গেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রকলার পরেই মোহেন জো-দড়োর কথাই বলা যায়। এ-সকল চিত্র বেশীর ভাগ মাটির বাসন প্রভৃতির গায়ে আঁকা আছে, চিত্রকলা বলতে যা' বোঝায়, তা' এ-গুলি ঠিক নয়। বাসনের উপর পাতা, ফুল, পাখী এবং হরিণ প্রভৃতির নক্সাই দেখতে পাওয়া যায়।

মোহন-জো-দড়ো
খৃঃ পূঃ ৩৩০০

উরোপেও অতিপ্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ এইরূপ বাসনের উপর আঁকা চিত্র অনেক পাওয়া গেছে। অবশ্য সে-গুলি মোহেন-জো-দড়োর মত অত পুরাতন নয়। মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতার সকল তথ্য এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। শিল্পকলার ইতিহাস একমাত্র ভাস্কর্য্যকলায় নিবদ্ধ আছে।

সমগ্র ভারতবর্ষে যদি আজ কোনো উপায়ে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তবুও ভারতবর্ষ সভ্য জগতের কাছে স্থান পাবে না যতক্ষণ না তার শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়; শিল্পকলাই মানুষকে অমর করে রাখে। বিজ্ঞান যেমন প্রত্যক্ষ-বোধকে জাগিয়ে তোলে, শিল্পকলাও তেমনি মনুষ্যজাতির সৌন্দর্য্য-বোধের এবং চিত্তের প্রসারের পরিচয় দেয়।

যোগীমারার
গুহা-চিত্র।
খৃঃ পূঃ ৩০০

ঠিক মোহেন-জো-দড়োর পরবর্ত্তী যুগের কোনো চিত্রকলার

ইতিহাস জানা না গেলেও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সিরগুজা রাজ্যে রামগড় পাহাড়ের মধ্যে নিভৃত গুহায় চিত্রকলার সামান্য চিহ্নমাত্র থেকে গেছে। কিন্তু সে সকল শিল্পীদের বিষয় আমরা কিছুই জানতে পারি না। এই কারণেই বোধ হয় আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পীদের কাজগুলিকে সাধারণ লোকেরা বিশ্বকর্ম্মার কাজ বলে ধরে নিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত থাকে। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার বিষয় উরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে চীন দেশে যে লেখ্য-শিল্প (calligraphy) খৃঃ পূঃ ২৭০০ অব্দে প্রথম প্রচলিত হয়েছিল, তা'রই উপর তা'র ভিত্তি। অবশ্য আলেখ্য ও লেখ্য-শিল্পের মধ্যে বেশ একটা ঐক্য আছে। প্রাচ্য শিল্পীরা প্রধানতঃ ধূপছায়া (Light and shade) না দিয়ে কেবল রেখার সাহায্যে ছবি আঁকেন এবং রেখাগুলি লেখার মতই সহজ গতিতে টানা। ধূপছায়া দিয়ে আতপ চিত্রের মত (photograph) ছবিকে ফুটিয়ে তোলার রীতি এদেশে ছিল না। তাই এই চিত্রকলার রেখার মধ্যে কলম এবং তরবারী চালানোর মত তুলি-চালানোর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তুলির সাহায্যে লেখার প্রথা চীন ও জাপানে এখনো আছে। উরোপীয় চিত্রকলা বেশীর ভাগ বাস্তবভাবের, সুতরাং তাতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা এই তিন দিকের আয়তনের বিষয় বোঝাতে হয়; তাকে ইংরাজীতে Three dimemsions বলে। রোমান যুগেই তার প্রচার আরম্ভ হয় এবং ক্রমশ পরবর্ত্তী যুগের শিল্পীরা সেই দিকেই অগ্রসর হন। প্রাচ্য চিত্রকলায় তার বিশেষ একটি ধারা চলে এসেছিল এবং সেই কারণেই আজ তার পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা হয়েছে। উরোপেও বাস্তবপন্থী

শিল্পে ভাঙন ধরেছিল। সেজাঁর (Cezanne) সময় থেকে ক্রমশ তাই নূতন নূতন পথে তার গতি-নির্দ্দেশ সুরু হয়েছিল উরোপে।

প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলার পরেই সুরগুজার গুহা-চিত্রগুলির কথাই বলতে হয়। এগুলি ভারতের প্রাচীন-চিত্রকলার প্রথম ও প্রধান পরিচয়। এই ছবিগুলির মধ্যে বেশ একটি সহজ ও সরল ভাব আছে; অর্থাৎ চিত্রগুলি এমন যায়গায় এমন ভাবে আঁকা যে দেখলেই মনে হয় যেন শিল্পীরা বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি আঁকেন নি, যা' কিছু করে গেছেন, তা' কেবলই তাঁ'দের নিজেদের চিত্ত-বিনোদনের জন্যই। পরবর্ত্তী যুগে অজন্তা, বাগগুহা প্রভৃতির চিত্রকলা যেমন বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রে বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল, এ ছবিগুলির মধ্যে তার কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া পরবর্ত্তীকালে চিত্রকলার মধ্যে যেমন একটা রেখা ও রঙের বিশেষ ক্ষমতা ও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়, এগুলিতে তার বিশেষ পরিচয় নেই। ছবিগুলিতে মোট রেখা ও রঙের সমষ্টি নিয়ে একটা বেশ আলঙ্কারিক সজ্জার ভাব (Decoration) দিয়েছে। যে গুহাতে ছবিগুলি আঁকা আছে, সেই যোগীমারা গুহাটি মাত্র ১০´ ফুট লম্বা এবং ৬´ ফুট চওড়া। গুহাটি একটি স্বাভাবিক গুহা এবং তারই ছাদটিতে সমান্তরাল লাল রঙের রেখা দিয়ে ভাগ করে ছবিগুলি আঁকা আছে। ছাদ এত নিচু যে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছোঁয়া যায়। আলো যথেষ্ট আছে, কেননা গুহার সামনেটা একেবারে খোলা; তা'ছাড়া গুহার ছাদের পাশে আলোক-প্রবেশের একটি পথও আছে। ছবিতে চুণের

বজ্রলেপ (mortar) দিয়ে জমি তৈরী হয়েছে—অজন্তার মত মাটি ও গোবর দিয়ে তৈরী হয়নি। তাই সেটি অপেক্ষাকৃত মজবুৎ। দেখা গেছে ঐ বজ্রলেপের কোন কোন অংশের নীচে ঢাকা পড়ে গেছে, এরূপ চিত্রও আছে। মনে হয় যে পরবর্ত্তী কালের কোনো শিল্পী ছবিগুলিকে বজ্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিয়ে তার উপর পুনরায় ছবি এঁকেছিলেন।

চিত্রের প্রথম ভাগে একটি মানুষের, মকরের, এবং হাতীর ছবি দেখা যায়। মকরটি যে জলের উপর আছে, তা' গোল গোল ঢেউয়ের মত নক্সায় দেখানো হয়েছে। ছবিগুলিতে রঙের বৈচিত্র্য নেই, কেবল সাদা, লাল, কালো এবং হলুদ রঙ দিয়েই সেগুলি আঁকা। দ্বিতীয় চিত্রে একটি গাছের নীচে অনেকগুলি মানুষ বসে আছে এই ভাবে আঁকা হয়েছে। ছবির বর্ণিত বিষয় যে কি, তা' এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। গাছ কেবল মোটা গুঁড়ি এবং সামান্য ডালপালা এঁকে বোঝানো হয়েছে আর পাতাগুলি লাল রঙেই আঁকা। চতুর্থ চিত্রে একটি উদ্যানের ছবি—তাতে পদ্ম ফুটে আছে। এগুলি কালো রেখা দিয়ে এঁকে দেখানো হয়েছে। দুটি নর্ত্তকী পদ্মফুলের মধ্যে দাঁড়িয়ে, তা'দের এখন চোখ নাক সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। চতুর্থ চিত্রের বিষয়টি খুবই অদ্ভুত ধরণের। ছবিটিতে কয়েকটি বামনের ছবি আছে, তার হাত পা'র গঠনের কোনই সামঞ্জস্য নেই। ছবিটি কালো রেখা দিয়ে আঁকা এবং ভঙ্গীটি বিশেষ কৌতুকোদ্দীপক। এক যায়গায় একটি পাখীর ঠোঁট একটি মূর্ত্তির মাথার উপর দেখতে পাওয়া যায়। সেটি যে কেন এবং পূর্ব্বে কি ভাবে আঁকা হয়েছিল, তা' বলা শক্ত। পঞ্চম

চিত্রটিতে একটি মেয়ে মাটির উপর বসে আছে আর তার সামনে নৃত্যগীত হচ্ছে। এই চিত্রগুলির মধ্যে অজন্তার মত রেখা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া না গেলেও তা'র মধ্যে তা'র সূচনার পরিচয় আছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম চিত্রগুলির অবস্থা এখন এত খারাপ যে তার বিবরণ লেখা শক্ত। এই ছবিগুলির মধ্যে চৈত্যগুহার মত বাড়ীর ছবি, প্রাচীন কালের রথের ছবি প্রভৃতি দেখা যায়। ছবিগুলিতে মাঝে মাঝে প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীদের আঁকা ছবির মত আদিম ভাবও আছে, আবার তা'রি সঙ্গে কতকগুলি ছবি (এখন ভাল অবস্থায় না থাকলেও) সেগুলির তুলনায় অনেক উঁচু ধরণের। *

প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্র

আমাদের দেশের চিত্রকলা বেশীর ভাগ তখন পটের উপর আঁকা থাকত, তাই তা'র চিহ্ন চিরস্থায়ী হয়নি। তা'ছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ভারতে নানা জাতি নানা দেশের রাজাদের অভিযানও তা'র আর এক কারণ হ'তে পারে। তাই চিত্রকলার চেয়ে প্রাচীন ভাস্কর্য্য-কলার নিদর্শন আজও মাটির তলা থেকে কখনও কখনও আবিষ্কৃত হচ্চে। আধুনিক যুগে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পকলা না বোঝবার প্রধান কারণ কি যদি ভেবে দেখি তো দেখবো যে এখনকার কালে সৌন্দর্য্য-রুচির অনেক বদল হয়েছে। আমরা এখন আর—নানা ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো রীতি, পদ্মপলাশলোচন, মরালগতির পক্ষপাতী নই। সেগুলি আমাদের প্রাচীন কাব্য ও কলায় চাপা পড়ে আছে। সেই

* বাগগুহা ও রামগড়—গ্রন্থকার

জন্যেই আমাদের প্রাচীন শিল্পের অনুশীলন করতে হ'লে শিল্প-শাস্ত্র প্রভৃতির বিষয় জানতে হয়। চিত্রকলার বিষয়ে শিল্প-শাস্ত্র না পাওয়া গেলেও তার ষড়ঙ্গের বিষয় আমরা স্বতন্ত্রভাবে জানতে পারি।* চীনদেশের শিল্প-শাস্ত্রেও ষড়ঙ্গের বিষয় আছে। ষড়ঙ্গে আছে :

রূপ-ভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গং ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোটামুটি এই ভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন :

(১) রূপভেদ = রূপের জ্ঞান। (২) প্রমাণম্ = সঠিক-মাপ পরিমাণ। (৩) ভাব = অন্তরের ভাব। (৪) লাবণ্য-যোজনা = রস যোজনা। (৫) সাদৃশ্যম্ = যে আকারের সঙ্গে যার রূপগত ও আকারগত মিল আছে। (৬) বর্ণিকা-ভেদ = শিল্পীর ব্যক্তিগত তুলি-চালানোর রীতি। এগুলি ছাড়া শিল্প-শাস্ত্রে রঙের বিষয়ও অনেক কথা আছে। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরম্ পুরাণে আছে, যে-ব্যক্তি চিত্রকলা না জানে, সে কখনও ভাস্কর্য্যকলার প্রতিমা-লক্ষণ জানতে পারে না, এবং যে নৃত্যকলা না জানে, সে চিত্রকলা বুঝতে পারে না ; আর যে সঙ্গীত না জানে, তার পক্ষে নৃত্য অসম্ভব। এ থেকে বোঝা যায় যে শিল্পী হ'তে হ'লে সকলপ্রকার বিদ্যাকে আয়ত্ত করতে হতো। শিল্প-শাস্ত্রের বেশীর ভাগ নিয়ম-কানুন তৈরী হয়েছিল ভাস্কর্য্যের প্রতিমা-লক্ষণের জন্যে। শিল্পকলা বাঁধা-বাঁধি নিয়ম মেনে কখনো গড়ে ওঠে না। তাই যখন থেকে

* ভারতীয় শিল্পের ষড়ঙ্গ—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পকলার জন্যে স্বতন্ত্র শিল্প-শাস্ত্র গড়ে উঠল, তখনই তা'র পায়ে বেড়ী পড়ে গেল। অবশ্য অনেক ক্ষমতাবান শিল্পী সে সময় তা'রই মধ্যে শিল্প-শাস্ত্রকে মেনে চলেও নূতন রস পরিবেষণ করে যেতে পেরেছেন, এরূপও দেখা গেছে। প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে (১) মনুষ্যালয় চন্দ্রিকা, (২) মায়ামত (৩) বাস্তুবিদ্যা (৪) শিল্পরত্নম্ (৫) যুক্তিকল্পতরু (৬) বৃহৎসংহিতা (৭) বিশ্বকর্ম্মাপ্রকাশম এবং কয়েকটি পুরাণে শিল্পকলার অনেক তথ্য নিহিত আছে। এগুলি ছাড়া প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকাবলীর মধ্যে উত্তরচরিতে এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্ গ্রন্থেও চিত্রকলার বিষয় জানা যায়।

প্রতিমা-লক্ষণগুলির মধ্যে আছে (১) বিচিত্র আসন (২) মুদ্রা (৩) ও ভঙ্গীর বিবরণ। ৮৪ হাজার আসনের মধ্যে ৩২টি মূল আসন আছে। তা'র মধ্যে পদ্মাসন, যোগাসন, বীরাসন, সুখাসন, স্বস্তিকাসন এবং বজ্রাসন এই ছয়টি প্রধানত চলিত ছিল মূর্ত্তি-গড়ায় এবং সেগুলি শিল্প-শাস্ত্রের ষড়ঙ্গের বিষয়ীভূত। ২৫ প্রকারের মুদ্রার মধ্যে কিন্তু কেবল বর ও অভয় এই দুই মুদ্রারই চলন হিন্দু মূর্ত্তি-গুলিতে দেখা যায়। বৌদ্ধ ও জৈনমূর্ত্তিতে ধর্ম্মচক্রমুদ্রা (জ্ঞান বা ধর্ম্মপ্রচারের চিহ্ন), ভূমিস্পর্শমুদ্রা (প্রতিজ্ঞা সূচক), দানমুদ্রা (অভয়দান সূচক) এবং ধ্যানমুদ্রা এই পাঁচটি মুদ্রারই সচরাচর প্রচলন দেখা যায়। শিল্প-শাস্ত্র-বর্ণিত নানান ভঙ্গীর মধ্যে ক্ষণভঙ্গ, অতিভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, এই চারটি ভঙ্গীর পরিচয় প্রাচীন মূর্ত্তিতে বেশী আছে। শিল্প-শাস্ত্রে অলঙ্কার ও আভরণের বিষয়ও উল্লেখ আছে। গহনার মধ্যে মকরকুণ্ডল, কেয়ূর, কটিবন্ধনী (মেখলা), বাহুবন্ধ (বাজুবন্ধ)

মণিবন্ধ, কঙ্কণ, কটিসূত্র (গোট), নূপুর, রত্নমালা (মেয়েদের গলার হার), বিজয়মালা (পুরুষদের গলার হার) প্রভৃতি গহনার উল্লেখ আছে। অবশ্য এগুলির বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন সংস্করণের মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। নাসিকার বেসর, নোলক, নাকছাবি প্রভৃতি গহনা মুসলিম সভ্যতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে এদেশে প্রচলিত হয়েছে। তাই দেখা যায় যে হিন্দুদের 'কর্ণবেদ' অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু নাসিকাবেদের ব্যবস্থা নাই। কাব্যের মতই চিত্রশিল্পেও নয়টি প্রধান রসের পরিবেষণের ব্যবস্থা আছে। যথা—বীররস, করুণরস, হাস্যরস, দাস্যরস, রুদ্ররস, শান্তরস, সখ্য, বাৎসল্য ও বীভৎসরস। এগুলি ছাড়াও অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর, শৃঙ্গার ও মাধুর্য্যরসেরও বিষয় জানা যায়।

শিল্প-শাস্ত্রগুলিতে চিত্রকলা প্রথমে কিরূপে উদ্ভাবিত হ'ল তা'র বিচিত্র কাহিনী আছে।* বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরমে আছে যে নর ও নারায়ণ নামক দু-জন ঋষি ছিলেন। তাদের মধ্যে নারায়ণই মানবজাতির কল্যাণের জন্যই চিত্রকলা আবিষ্কার করলেন। নর ও নারায়ণ একবার হিমালয়-শিখরে বদরী-তীর্থে (বদরীনাথে) তপস্যা করছিলেন, এমন সময় কয়েক-জন অপ্সরা স্বর্গ থেকে নেবে এসে তাঁ'দের দু-জনের ধ্যান ভঙ্গ করবার চেষ্টা করছিলেন। তাতে নারায়ণ বিরক্ত হয়ে একটি শুখনো আমপাতার উপর আমের আটা দিয়ে একটি অতি আশ্চর্য্য সুন্দরী মূর্ত্তি আঁকলেন ; ছবিটিতে উর্ব্বশী-মূর্ত্তির রূপ

* Principles of Indian Silpa Sastra by Phanindra Nath Bose, M. A.

এত বেশী সুন্দর ফুটে উঠল যে অপ্সরাদের রূপ-গর্ব্ব একেবারেই চূর্ণ হয়ে গেল এবং তা'রা লজ্জায় মাথা নত ক'রে যে যা'র স্বর্গপুরীতে ফিরে গেলেন। এই গল্পটি চিত্রকলার মোহিনী শক্তির একটা রূপক চিত্র দেয়।

শিল্প-শাস্ত্রগুলি ছাড়াও উত্তর চরিত, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্ প্রভৃতি গ্রন্থে "ভিত্তি-চিত্র" অর্থাৎ দেয়ালের গায়ে যে ছবি আঁকার প্রথা ছিল, সে সম্বন্ধেও জানা যায়। দেয়ালের গায়ে আঁকা প্রাচীন চিত্রাবলীর মধ্যে প্রথমেই যোগীমারার চিত্রের কথা বলা হয়েছে। এইরূপ চিত্র ভারতবর্ষে গুহা ও মন্দিরের গায়ে অনেক যায়গায় পাওয়া গেছে। সেগুলির বিষয় পরে আলোচিত হবে। এখন আমরা অজন্তা গুহার চিত্রকলার বিষয় কিছু বলব। সেগুলি ১ম বা ২য় শতাব্দী থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সময়ে রচিত হ'য়েছিল বলে জানা যায়। অবশ্য এত প্রাচীন চিত্রকলা কি ভাবে যে এখনো গুহা-প্রাসাদের মধ্যে লোকজনের অলক্ষ্যে এতকাল টি'কে গেছে, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অজন্তার চিত্রকলার সঙ্গে প্রাচীনতম উরোপীয় চিত্রকলার তুলনা করতে গেলে পম্পেয়ি নগরের রোমান চিত্রকলারই তুলনা করা চলে। দুটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের একই সময়কার চিত্রকলার পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে মানব-সভ্যতার একটি বড় ইতিহাসও নিহিত আছে। সে-সময়কার বড় বড় সাম্রাজ্যের খুদকুঁড়োও বাকি নেই বটে কিন্তু এই সকল চিত্রকলার নিদর্শন এখনো প্রচুর পাওয়া যায়।

অজন্তার ভিত্তি-চিত্র ১ম বা ২য় শতাব্দী থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত

অজন্তার গুহাগুলির নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই যে চিত্রকলা

সৃষ্টি হয়েছিল, তা' ধারণা করা যেতে পারে না। কেননা চিত্রকলায় যে ধরণের মানুষ আঁকা আছে এবং যে ধরণের মানুষের ছবি গুহার ভাস্কর্য্যে প্রকাশ পেয়েছে, তা'র মধ্যে অনেক তারতম্য অনেক যায়গায় দেখা গেছে। ২৯টি গুহার মধ্যে ৯ নম্বরের গুহায় যে কালো রঙের মানুষের ছবি আছে তা'দের মাথায় বাঁধা শিরস্ত্রাণ গহনা প্রভৃতি দেখলে সেগুলিকে সাঁচী বা অমরাবতীর সময়কার (খৃঃ পূঃ ২০০—১০০) বলে অনুমিত হয়। অবশ্য এগুলি যে ঠিক সেই সময়কার কোনো রাজার আদেশে আঁকা হয়েছিল বলে জানা যায় না। তবে গ্রিফিথ্স সাহেব এই চিত্রগুলি দাক্ষিণাত্যের কোনো বৌদ্ধ অন্ধ্রাজের সম-সাময়িক বলে অনুমান করেন। ৯ নম্বরের গুহাটিকেই সব চেয়ে পুরাতন গুহা বলে অভিহিত করা হয়। তার পরবর্ত্তী চিত্রকলা চালুক্য রাজের সময় (৫৫০—৬৪২ খৃঃ) গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। ১৬নং গুহায় আবার তখনকার বেবারের প্রচলিত লিপি পাওয়া গেছে। ঐতি-হাসিকেরা দক্ষিণ-ভারতের পহ্লবী রাজের দ্বারা দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর কোনো সময়ে তৈরী হয়েছিল বলে স্থির করেছেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজধানী ছিল নাসিকে। হিয়াঙসিয়াঙের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে তিনি বৌদ্ধ ও হিন্দুদের একই প্রকারের মর্য্যাদা দিতেন এবং দুই শত বৌদ্ধ-সঙ্ঘ এবং অসংখ্য হিন্দু-মন্দির তিনি স্থাপনা করেছিলেন। নিজে শৈব হলেও পহ্লবীরাজও এই সকল বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপনা করে নিজের উদারতারই পরিচয় দিয়ে গেছেন।

অজন্তার গুহাগুলি প্রাসাদের মত তৈরী হলেও

আলোক-প্রবেশের পথ কেবল সামনের দিকের দ্বার ও জানালায় থাকার সম্ভব হ'য়েছে কিন্তু অপর তিন দিকই একেবারে পর্ব্বত-কন্দর-গর্ভে বদ্ধ। চিত্রকরেরা অন্ধকারে বসে বসে ছবিগুলি যে কি ক'রে এঁকে গেছেন, তা' এখন গবেষণার বিষয়। অনেকে স্থির করেন যে কোনো প্রকারের উজ্জ্বল ধাতুর তৈরী দর্পণ গুহার বাইরে রেখে সূর্য্যরশ্মিকে গুহার মধ্যে প্রতিফলিত করেই তাঁরা ছবি আঁকতে পারতেন। ছবিগুলির মধ্যে কারিগরির বাহাদুরী ছাড়াও চিত্রাঙ্কনে অসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয়ও বৌদ্ধ শিল্পীরা রেখে গেছেন। বিশেষতঃ তাঁদের আঁকা গুহা-শীর্ষ-সজ্জা (ceiling decoration) দেখলে বোঝা যায় যে চিৎ হয়ে ভারার উপর শুয়ে শুয়ে এগুলি কত অসুবিধার মধ্যেও কি করে এঁকে গেছেন। ছাদের নীচের ছবিগুলি ঠিক একটি চাঁদোয়ার মত করে আঁকা। তার ঠিক মাঝখানে একটি নক্সাধরণের গোল বিরাট পদ্ম, আর তারই চার পাশে গোলভাবে সজ্জিত সার সার হাঁস, ময়ূর কিম্বা মৃণাল-দল-মন্থনকারী হাতীর পাল আঁকা আছে, এবং তারই ধারে চার পাশে পদ্মলতা দেওয়া নক্সা। মাঝে মাঝে আবার হাস্যরস-জ্ঞাপক ব্যঙ্গ-চিত্র। সেগুলি চৌকো ঘর কেটে আলাদা ভাবে আঁকা থাকলেও গোল পদ্মাঙ্কিত চাঁদোয়ারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আঁকা হয়েছে।

অজন্তার চিত্রাবলীর একটি বিশেষত্ব এই যে উরোপে প্রচলিত নিয়মে 'মডেল' রেখে এগুলি আঁকা হয়নি। এগুলি রেখার টানের ছন্দে ছন্দে শিল্পীর প্রাণের আনন্দের পরিচয় দেয়। উরোপীয় আর্ট গ্যালারীর চিত্রাবলীর মধ্যে কখন কখন দেখা গেছে চিত্রকলার মধ্যে শিল্পীর অজ্ঞাতেই তাঁর

'মডেলের' অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে কিছুকাল থাকার ভাবটিও ধরা পড়ে। অজন্তার চিত্রাবলী আঁকা হয়েছিল পাথরের দেয়ালের উপর গোবর মাটি, তুঁষ প্রভৃতির প্রলেপ বা বজ্রলেপ দিয়ে জমি তৈরী ক'রে। এই বজ্রলেপ যদিও নিতান্তই কাঁচা, কিন্তু তবু ভারতের ভাগ্যে এতকাল টিঁকে না থাকলে শিল্প-ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায় চির-কালের মত বিস্মৃতির গুহায় নিহিত থেকে যেত। ইটালীতে ও গ্রীসে যে প্রণালীতে দেয়ালে ছবি আঁকা হতো, তা'র প্রচার কতকটা পরবর্ত্তী যুগের রাজপুত-ভিত্তিচিত্রে পাওয়া যায়, যদিও তার প্রণালীতে এবং উরোপীয় প্রণালীতে অনেকটা তফাৎ আছে। চূণের সঙ্গে একত্র রঙ মিশিয়ে ভিজে থাকতে থাকতে আঁকার প্রথা একই ধরণের হলেও রঙটিকে কণিক দিয়ে ঘসে ঘসে বসানোর নিয়ম কেবল রাজপুতানায় প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে সিমেণ্টের আমদানীর বহু পূর্ব্বে চূণের সঙ্গে বালীর (stucco) বজ্রলেপ দিয়ে (পঙ্খের কাজ ক'রে) মেঝে তৈরী করার রেওয়াজ ছিল। অতি প্রাচীন সারনাথ, রাজগীর, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানের বাড়ী-ঘরের মেঝেতে তার পরিচয় আমরা এখনো পাই। এ বিষয় স্থাপত্য-অধ্যায়ে পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এইরূপ চূণের উপর পঙ্খের কাজের এবং তাতে ছবি আঁকার প্রথা পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল। বসত-বাড়ীর দালানে, মসজিদে, মন্দিরে সর্ব্বত্রই এই বিশেষ পদ্ধতিতে আঁকা নক্সা দেখতে পাওয়া যায়। উরোপে (Fresco Secco) 'ফ্রেসকো সেকো' শুখ্‌নো বজ্রলেপের উপর আঁকা এবং (Fresco Buono) 'ফ্রেস্‌কো বোনো' বা ভিজে বজ্রলেপের উপর

আঁকার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই দুই প্রথা ছাড়া উরোপে (Egg tempara) 'এগ্ টেম্পারা' অর্থাৎ ডিমের হল্‌দে অংশের সঙ্গে সাদা রঙ মিশিয়ে আগে জমী তৈরী ক'রে নিয়ে তার উপরে আঁকা হ'তো। তা'ছাড়া প্রাচীনকালে উরোপে মোমের সঙ্গে রঙ মিশিয়েও ছবি আঁকাব চলন ছিল ব'লে জানা যায়। আমাদের দেশে নিম, বেল বা তেঁতুল বীচির আটার ব্যবহাব প্রচলিত ছিল রঙের সঙ্গে। ছবি আঁকাব শেষে খুব চক্‌চকে পালিস দেওয়ার রীতি ছিল। তাতে ধূলো-বালি জমতে পারতো না এবং ছবির আয়ু বেড়ে যেতো। এখন জানা যায় যে কোনো কোনা উরোপীয় চিত্রের পরমায় দীর্ঘ হওয়ার কারণ তাতে রঙের সঙ্গে মোম ব্যবহার করা হয়েছিল। এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাচীন চিত্রগুলির পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মোমের প্রলেপ থাকার দরুণ আবহাওয়ার মধ্যে যে সকল অনিষ্টকারী গ্যাস বা য়্যাসিড্ আছে তার আক্রমণ থেকে সেগুলি রক্ষা পেয়েছে।

অজন্তার ভিত্তি-চিত্রের জমী তৈরীর প্রণালীব বিশেষত্ব না থাকলেও, তার অঙ্কন-বিজ্ঞানের কথা যদি আলোচনা করি তো দেখব যে চিত্রগুলি যে দেয়াল জুড়ে আছে, সেই ঘরটিকে নিয়ে সেগুলি এমন ভাবে স্বচ্ছন্দে সাজানো যে সেগুলিকে স্থানচ্যুত করে স্বতন্ত্র ভাবে দেখলে তার রস অনেক পরিমাণে কমে যায়। অথচ উরোপের বিখ্যাত ভ্যাটিকানের যে-কোন ভিত্তি-চিত্রকে দেয়াল থেকে স্বতন্ত্রভাবে সরিয়ে নিয়ে দেখতে পারি এবং তাতে তার সৌন্দর্য্যের হানি হয় না। অজন্তার ছবির পূর্ণ ভাব সেই গুহার দেয়ালের উপরই আত্মপ্রকাশ করে আছে। ভিত্তি-চিত্রের কাজই হল

স্থাপত্যকলার শোভাবর্দ্ধন ও পূর্ণতা আনা। তাই ভিত্তি-চিত্রের সঙ্গে স্থাপত্যকলার সামঞ্জস্য-স্থাপনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যেমন একটি ফুলে ভরা গাছের মধ্যে ফুলগুলি সমষ্টি-ভাবে যেরূপ শোভা পায়, সেগুলি তুলে আনলে তার কোন বিশেষত্ব থাকে না, এও কতকটা তাই। অজন্তার শিল্পীরা তাই যখন ছবিগুলি এঁকেছেন, তখন তাঁদের ছবির বর্ণিত বিষয়টির দিকে মন থাকলেও তা'র মধ্যে রেখা ও রঙের এমন একটি ছন্দ রেখেছেন যার দ্বারা তাঁদের চিত্রকলা স্থাপত্যকলাটিকেও একটি অপূর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করে তুলেছে। তা'ছাড়া রেখা ও রঙের ছন্দ-গতি যা আছে, তার মধ্যে নানান্ শিল্পীর হাতের কাজ হলেও একটা ঐক্যের ভাবও এনেছে।

ছবিগুলিতে প্রধানত বুদ্ধের জীবনী ও তখনকার রাজাদের নানাপ্রকারের ইতিহাসের বিষয় আঁকা আছে। কোথাও রাজসভার জাঁকজমক, কোথাও ভিখারী-বিদায়, কোথাও রান্নাঘর, কোথাও বা তুরীভেরী বাদ্যের মিছিলের সঙ্গে সমারোহে রাজা বেরিয়েছেন বিজয়-যাত্রায়। কোথাও বা জাহাজে চড়ে সমুদ্রাভিযান হচ্চে, কোথাও বা কমলদলকে দলছে হাতীর পাল, কোথাও পলাশ গাছের গুঁড়ির গা বেয়ে সার সার পিঁপড়ে উঠছে, কোথাও বা দাঁড়িপাল্লায় দোকানী জিনিষ ওজন করছে, কোথাও বা রাণী মূর্চ্ছিতা হওয়ায় দাসীরা তাঁর সেবায় নিযুক্তা—এমনি অসংখ্য প্রকারের মানুষের জীবনের ঘটনাকে শিল্পীরা সজীব করে রেখে গেছেন তাঁদের তুলির রেখায় রেখায় গুহার দেয়ালের উপরে। মনে হয় যেন ছবি আঁকার তাঁরা চূড়ান্ত করে গেছেন—কিছু আর বাকি রাখেন নি পরবর্ত্তী শিল্পীদের জন্য। ছাদের উপর শঙ্খ ও

পদ্মলতা এবং দেয়ালের উপর থেকে নীচু পর্য্যন্ত চিত্র-খচিত—এমন কি বারান্দার থামেও তা' বাদ পড়েনি।

অজন্তার চিত্রের বিষয়-সূচী দেওয়া খুবই কঠিন। কেননা এখনো চিত্র-বর্ণিত বিষয়গুলি যে কি, তা' সম্পূর্ণরূপে জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ চিত্রই বুদ্ধের জীবনীর এবং জাতকের গল্প অবলম্বন ক'রে দেয়ালের গায়ে আঁকা হয়েছে, কিন্তু কোন্‌টি যে ঠিক কোন্ গল্পের ছবি তা' বলা শক্ত। প্রাচীন জাতক প্রভৃতি গল্পের সঙ্গে ছবিগুলির কিছু কিছু মিল থাকলেও অনেক সময় সঠিকভাবে তা' ধরা যায় না। তাই দেখা যায় প্রত্যেক গুহার দ্বারের পাশে আঁকা বিরাট আকারের দেবদ্বারীর ছবিটিকে অনেকে অবলোকিতেশ্বর বলে অনুমান করেন। এইরূপ দেবদ্বারীর ভাল দৃষ্টান্ত ১নং গুহাটিতে রয়েছে। ছবিটির মধ্যে অর্দ্ধেক পাখী এবং অর্দ্ধেক মানুষ আকারের কিন্নরের ছবি আছে। কিন্নরের হাতে বাদ্যযন্ত্র মালা প্রভৃতি আছে এবং আশেপাশে মেঘ, গাছ-পালা, ধাপে ধাপে পাহাড়ের ভাব এবং তার গায়ে বাঁদর ও ময়ূর প্রভৃতির ছবি। এই ছবিখানির বিষয় আধুনিক সকল শিল্প-বিষয়ক পুস্তকাবলীতে আছে।

অজন্তার চিত্রের বিষয় বর্ণন।

অজন্তার চিত্রের পটভূমিতে (back-ground) মাঝে মাঝে একপ্রকার চৌকোনা ভাবের পাহাড় আঁকা দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার দালান প্রভৃতির সামনে বা যেখানে দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা পাশাপাশি দেখানো হ'য়েছে তা'র মাঝখানে এইরূপ চৌকো গাঁথুনি প্রতিকৃতি আঁকা আছে। অতি আধুনিক পরকলা-গাঁথা

(Cubist) ছবিতে যেরূপ তিনটি স্বতন্ত্র আয়তন (Three dimensions) দেখানো হচ্চে, এগুলিতেও কতকটা সেই-ভাব আছে। চিত্রে নানাপ্রকারের বিষয় আঁকা থাকলেও সে-গুলিকে এমন স্বচ্ছন্দে সাজিয়ে তোলা হ'য়েছে যে গুহার চার পাশের দেয়ালের ছবিকে একখানি ছবি বলা যেতে পারে। যদিও তা'রি মধ্যেকার টুক্‌রো টুক্‌রো ছবির সকল বৃত্তান্তই আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে ওঠে। অজন্তার পরবর্ত্তীকালে উরোপে প্রাচীন শিল্পের পুনরুত্থানের (Renaissance) যুগে গিওতো (Giotto) থেকে নিয়ে এক একটি শিল্পীর বিষয় স্বতন্ত্রভাবে যেরূপ ব্যাখ্যা করা যায়, অজন্তার এই চিত্রগুলির এক একটি টুক্‌রোকে নিয়েও সেইরূপই বর্ণনা করা যেতে পারে। অজন্তার বিরাট চিত্র-ভাণ্ডার কখনো এক দিনে এবং এক হাতে গড়ে ওঠেনি, বহু শিল্পী ও বহু সময় নিয়ে তবে সম্ভব হ'য়েছিল।

২৯টি গুহার ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত ছবিরই আমরা বর্ণনা করব। ১ম নম্বর গুহায় পূর্ব্বের উল্লিখিত দেবদ্বারীর বিখ্যাত বিরাট চিত্রটি ছাড়া দ্বিতীয় পুলকেশীর দরবারে খসরু পারাফিসের দৌত্যের (৬২৬ খৃঃ) ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনে তাকিয়া হেলান দিয়ে পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে পুলকেশী রাজ বসে আছেন। দালানের রঙিন থামের কলস নীলকান্ত মণির তৈরী এবং মুক্তার ঝালরে সজ্জিত। রাজা গা খালি করে গহনা ও মুক্তামালায় অলঙ্কৃত হয়ে মুকুট পরে বসে আছেন। রাজদরবারে সমারোহের এতটুকু ত্রুটি নেই। এমন কি রাজার পাদানীর পাশে নিষ্ঠীবন-

পাত্রটিও দেওয়া আছে। পারস্য রাজদূত সম্মুখে সমাসীন; মাথায় তাঁ'র (হেলমেটের মত) টুপি আঁটা, গায়ে ছিটের কোর্ত্তা পরা। প্রাচীন কালের পোষাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে অজন্তার চিত্র থেকে অনেক জানা যায়। রাজারা সর্ব্বদাই মণিমাণিক্য শোভিত হয়ে থাকতেন, গায়ে বড় একটা জামা দিতেন না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দাসদাসী ও নর্ত্তকী প্রভৃতির গায়ে সর্ব্বদা নানাপ্রকারের ছিটের জামা পরা থাকত। ১নং গুহাটিতেই একটি চিত্রে রাজার অন্দরমহল দেখানো আছে। রাজারাণী সখী-পরিজন পরি-বেষ্টিত হয় বিরাজ করছেন এবং তা'র পাশেই আর এক অংশে রান্নাঘরে শিল-নোড়ায় মশলা পিষতে গিয়ে ঝাল লাগায় চোখ রগ্‌ড়াচ্চেন এইরূপ আছে। তা'রই পাশে ছিটের (পুরোহাতা) জামা প'রে একটি নর্ত্তকী মাথায় ফুল গুঁজে নৃত্য করছে, ঢুলিরা তা'র সঙ্গে তাল দিচ্ছে। এইভাবে পাশে পাশে রাজা ঘোড়ায় চড়ে শহরের তোরণ পেরিয়ে চলেছেন শোভাযাত্রায়। পথে লোকজন খুব ধুম-ধাম করছে, কেহ'বা শঙ্খধ্বনি করছে, কেহ'বা পতাকা নিয়ে চলেছে। ছবির মধ্যে এমন একটা সজীব ভাব এসেছে যে মনে হচ্ছে যেন তাদের সোরগোল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তারপরের ছবিটিতে রাজা নৌকায় চড়ে সমুদ্র পার হচ্ছেন। তারপরের ছবিতে তিনি একটি দ্বীপে শ্রান্তভাবে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। এই ছবিটির পরিচয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ফুশে (Foucher) দিয়েছেন "সিংহল-অবদান"। ভারতের বণিক 'সিংহল' কি ভাবে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য করতে গিয়ে রাজা হলেন এবং পরে

তাঁর নামেই দ্বীপটির নামকরণ হ'ল, তা'রই বিষয় অবলম্বন ক'রে এই চিত্রটি আঁকা হয়েছে বলে তিনি অনুমান করেন। এই ১নং গুহায় আছে বুদ্ধের মোহ-ভঙ্গের ছবিটি। 'মার' কখনো ভয়ঙ্কর এবং কখনো বা সুন্দরীর বেশে বুদ্ধের নিকটে এসে তাঁর ধ্যান ভাঙাবার জন্যে চেষ্টা করছে। এই ছবিটিতে বুদ্ধের অচল অটল ভাব এবং আশপাশের মূর্ত্তিগুলির মুখের নানা প্রকারের ছল-কাপট্যের ভঙ্গী উজ্জ্বল হয়ে আছে। সাহিত্যের মত এই সকল চিত্রকলার মধ্যেও নব রসের পরিবেষণ হয়েছে।

২নং গুহাটিতে একটি চিত্রে বসন্তকালের ভাব আছে। একটি মেয়ে বাসন্তী রঙের শাড়ী পরে দোলায় দুলছে এবং তার চার পাশে ঝরা ফুলের পাপড়ি ছড়ানো আছে। বসন্তের একটি আমেজ ছবিখানির মধ্যে শিল্পী যেন রেখে গেছেন। ১০নং গুহার জলক্রীড়ারত হাতীর পালের ছবি-গুলি খুবই জীবন্তভাবে আঁকা। ১৬নং গুহায় তথাগতের গৃহত্যাগের একটি সুন্দর ছবি আছে। পরবর্ত্তীকালে কোনো সময় সেই গুহায় সাধু-সন্ন্যাসীরা বাস করায় ধোঁয়া লেগে ছাবগুলি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে।* ছবিটিতে আছে— বুদ্ধের স্ত্রী গোপা ঘুমে মগ্ন, চারি পাশে সহচরী, শান্ত্রী সকলেই স্বপ্নাবেশে রয়েছে। ছবিটি দেখলে মনে হয়, একটি ঘুমন্ত-পুরীর বিষয় যেন জেগে স্বপ্ন দেখছি! এই গুহাটির ঠিক পাশেই ১৭নং গুহাটিতে ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট আছে। এই গুহার বারান্দার ছবির রঙ (বিশেষ করে নীল রঙগুলি)

---

* কিছুকাল পূর্ব্বে নিজাম-সরকার বহু অর্থ ব্যয় করে ইটালীর দু-জন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে গুহাচিত্রগুলিকে পরিষ্কার করিয়েছেন।

একেবারেই নষ্ট হয়নি, দেখে মনে হয় না যে সেগুলি এতকালের পুরোনো ছবি। বারান্দার দেয়ালে অপ্সরাদের ছবি, পান-পাত্র হাতে রাজারাণীর ছবি, বিরাট একটি জীবন-চক্রের ছবি প্রভৃতি আছে। এই গুহাতেই আবার বিখ্যাত বিজয়ের সিংহল-বিজয় এবং শ্বেত-হস্তী জাতকের ছবি আছে। এই ছবিটিতে তখনকার অর্ণবপোতের পরিচয় পাওয়া যায়। জানা যায়, গুপ্ত-রাজাদের সময় ভারতবর্ষে বাণিজ্য-বহর খুব বেশী ছিল।* ইউরোপে তখন এদেশের মত বিরাট আকারের অর্ণবপোত তৈরী হতো না। তখনকার কালে কাপ্তেন মরিস নামক একটি সাহেব ১২০০ টন ভার-বাহী ভারতীয় জাহাজ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। এই ২নং গুহাটির মধ্যে একটি খোড়ো আটচালা ঘর আঁকা আছে। চালাঘরটির নির্ম্মাণ-প্রণালী খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে একমাত্র বাঙলাদেশেই এখন সেই প্রণালীতে আটচালা তৈরী হয়; যে-প্রদেশে ছবিগুলি আঁকা আছে তার আশপাশে কোথাও সেরূপ হয় না। ১৭নং গুহাটিতেই প্রাচীন মাতৃমূর্ত্তির (Madonna) ছবিটি দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের স্ত্রী গোপা তাঁর একমাত্র পুত্র রাহুলকে নিয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়েছেন। চীরবসনধারী বুদ্ধ-দেব, হাতে ভিক্ষাপাত্র, তাঁ'দের আশীর্ব্বাদ করছেন। বুদ্ধের আকৃতিটি মাতা-পুত্রের চেয়ে অনেক বড় আকারের দেখানো হয়েছে—অতিমানুষ হিসাবে। এই বিখ্যাত চিত্রটির মধ্যে আছে বুদ্ধের নিশ্চলভাব এবং মায়ের মুখের সকরুণ

* Ship-building in Ancient India—Dr. Radha Kumud Mukherjee

চাহুনিটি। ছেলের বিস্ময় ও ভয়ের জড়তাও তার মধ্যে বেশ যেন ফুটে আছে।

১৯নং গুহায় কপিলাবস্তুতে বুদ্ধদেবের প্রত্যাবর্ত্তনের বৃত্তান্ত আঁকা আছে। এই গুহাটির চিত্রকলা প্রভৃতির কতক অংশ গুপ্তযুগের ৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং কতক তা'র পরবর্ত্তী চালুক্যরাজ্যের সময় তৈরী হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এই চালুক্য রাজারা ৫৫০ খৃঃ থেকে ৭৫৩ খৃঃ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র-দেশ থেকে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। প্রথম গুহার বর্ণিত পারস্য-দূতের ছবি এবং অন্যান্য ইরাণী ধরণের মানুষের ছবি যা' অজন্তায় আছে দেখে অনেকে ভারতীয় শিল্পে ইরাণী প্রভাবের কথা ভাবেন। আবার ঠিক পরবর্ত্তী কালে মধ্য-এসিয়ার তুর্কিস্থানের অন্তর্গত খোটানের প্রাচীন চিত্রকলার সঙ্গেও অজন্তার খুবই সাদৃশ্য আছে। এইরূপ যবদ্বীপের বরভূধরের দেয়ালের ভাস্কর্য্য-চিত্রাবলীর সঙ্গেও অজন্তার মিল আমরা পাই। অবশ্য একই দেশের শৈলীর যোগে উদ্ভূত শিল্পকলা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়াই এই ঐক্যের কারণ। এ-বিষয় পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। অজন্তার ছবিগুলি এক-ধরণের হলেও স্বতন্ত্র শিল্পীদের হাতের পরিচয় আছে। মাঝে মাঝে অপটু পটুয়ার হাতের রেখাও দেয়ালের গায়ে কোনো কোনো ছবিতে পাওয়া যায়। মনে হয় গুরু শিষ্য মিলে এই সব ছবি এঁকে রেখে গেছেন। দু'একটি চিত্রের উপরের রঙ উঠে যাওয়ায় নীচের রেখাগুলি বেরিয়ে পড়েছে। তা' থেকে কি ভাবে ছবিগুলি সংশোধিত হ'ত, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

অজন্তায় কয়েকটি সুন্দর জাতকের গল্পের ছবি আছে আমরা এখানে কয়েকটির বিষয় বলব। 'পূর্ণ অবদান' * আখ্যানটির ছবি যেটি আছে, সেটি একটি সমুদ্রাভিযানের গল্প। সূর্পরকদেশের বণিকের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও আদুরে ছেলে ছিলেন 'পূর্ণ'। হঠাৎ পিতার মৃত্যুর পর তাঁ'কে এবং তাঁ'র সব চেয়ে বড় ভাই ভাবিলাকে তাঁর অপর দুই দাদা মিলে বিষয় থেকে বঞ্চিত করলেন। পূর্ণর ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলেন সুপ্রসন্ন; তিনি তাই চন্দনকাঠের ব্যবসা ক'রে অল্পদিনের মধ্যেই সে দেশের একজন প্রধান বণিক হয়ে উঠলেন। ছয় বার ক্রমাগত সমুদ্রাভিযান ক'রে বেশ কিছু ধনদৌলতে ভাণ্ডার পূর্ণ করবার পর নিশ্চিন্ত হয়ে ভোগ করবেন বলে মনে করছেন, এমন সময় শ্রাবস্তীপুরের এক বণিক তাঁ'কে পরামর্শ দিলেন পুনরায় সমুদ্রযাত্রা করতে। বড় ভাই ভাবিলার অনুমতি নিয়ে তিনি সমুদ্র-যাত্রা করলেন। কিছু দূর যাত্রা করার পর কোনো দেশে বুদ্ধের জয়-গাথা শুনে বৌদ্ধধর্ম্মে তিনি বিশেষ নিষ্ঠাবান হলেন এবং পুনরায় দেশে ফিরে এসে বড় ভায়ের অনুমতি নিয়ে সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করলেন। পরে শ্রাবস্তী-পুরে গিয়ে বুদ্ধেব নিকট দীক্ষা নিলেন এবং তিনি সংসারে যে আকৃষ্ট নন সেই কথা দেখাবার জন্যই দুর্ব্বৃত্ত শ্রোণপরন্তক জাতীয় লোকদের দেশে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। ডাকসাইটে দুষ্ট লোকদের কাছে বুদ্ধের দয়া-ধর্ম্মের বাণী প্রচারের দ্বারা তিনি তাদের সকলকে অভিভূত এবং দীক্ষিত করে ফেললেন। ইতিমধ্যে তাঁর বড় ভাই

* Ajanta Cave Paintings—Yazdani

সেই সুযোগে তাঁর জলযানে বাণিজ্য করতে গিয়ে একটি দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে চন্দন কাঠের সন্ধান পেলেন। তিনি চন্দন গাছ কাটবার জন্যে জাহাজ থেকে নামবার পূর্ব্বেই সেই চন্দন বনের মালিক একটি যক্ষ তাঁ'র বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। সে মন্ত্রবলে এমন ভীষণ ঝড়-তুফান ও দুর্য্যোগ এনে ফেললে যে তাঁ'র পক্ষে জাহাজে সমুদ্রের উপর প্রাণ বাঁচিয়ে পালানোই দায় হ'য়ে পড়ল। ইতিমধ্যে তাঁ'রই একজন খালাসী দৈবাং তাঁর ভাই পূর্ণকে স্মরণ করতেই তিনি যোগবলে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ঝড়-জল সব থামিয়ে দিলেন। তারপর থেকে তাঁর ভাই ভাবিলা যত ইচ্ছা চন্দন কাঠ সেই দ্বীপ থেকে আহরণ করতে লাগলেন। পরে পূর্ণ এবং তাঁ'র বড় ভাই ভাবিলা সূর্পরকের রাজার সাহায্যে বুদ্ধদেবকে আহ্বান ক'রে আনবার জন্যে একটি চন্দন কাঠের বিহার-গৃহ তৈরী করলেন। অজন্তার ছবিটিতে এই ঘটনা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পূর্ণর বুদ্ধের নিকট দীক্ষা নেবার ছবিখানি এবং বড় ভাই ভাবিলার বিপদসঙ্কুল সমুদ্র-যাত্রার ঘটনাটি বেশ সরসভাবে ছবিতে বিবৃত আছে। সমুদ্রের মধ্যে যক্ষের ইঙ্গিতে নাগেরা দেখা দিয়েছে এবং নক্র কুম্ভীর প্রভৃতি জলচর অনেক প্রকার জন্তুও আছে। অর্ণবপোতটি দেখলেই মনে হয় যেন বেশ মজবুতভাবে তৈরী এবং তা'তে বড় বড় জালায় ঢাকা পানীয় জল রাখা আছে। তাতে বোঝা যাচ্ছে যে বহু দূরে যাবার জন্য প্রস্তুত জলযানটির মাঝখানে ভাবিলা করযোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর আকাশে দেবতারা দেখা দিয়েছেন তাকে উদ্ধার করবার জন্যে।

এইরূপ বিদুর পণ্ডিতের গল্পেরও সুন্দর ছবি একটি আছে

বিতুর পণ্ডিত জাতকে আছে কুরুদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে (এখনকার দিল্লী) ধনঞ্জয় নামক একটি রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁ'র এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁ'র নাম ছিল বিতুর-পণ্ডিত। তাঁ'র অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভিজ্ঞতার কথা দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি জম্বুদ্বীপের রাজাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধ আচার-পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। ধনঞ্জয় রাজা যদিও পাশা খেলায় নিপুণ ছিলেন কিন্তু তেমনি আবার তিনি দাতাও ছিলেন। ঠিক সেই সময় তিনটি বিভিন্ন দেশের রাজারও ধার্ম্মিক বলে খুব খ্যাতি ছিল। সে-সময় কথায় কথায় রাজাদের মধ্যে এক তর্ক উঠল যে, কে সব চেয়ে বড় ধার্ম্মিক ? তাঁরা স্থির করলেন, বিতুর-পণ্ডিতই এর নিষ্পত্তি করবেন। তাঁরা চার জনেই বিতুরের কাছে গেলেন এবং বল্লেন যে নাগরাজ ক্ষমাগুণে গুণী, সপর্ণরাজ শীলতায় শ্রেষ্ঠ, গন্ধর্ব্বরাজ মোহকে জয় করেছেন এবং কুরুরাজ সকল ধর্ম্মমতকে স্বাধীনভাবে প্রচার করতে দিয়ে উদারতাই দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে এখন কে সব চেয়ে বেশী ধার্ম্মিক ? বিতুর পণ্ডিতের বুদ্ধি অসাধারণ ছিল। তিনি বল্লেন, আপনারা যে চারটি গুণের কথা আমায় বল্লেন, এই চারটি গুণ হ'ল একটি চাকার চারটি অর-দণ্ডের মত এবং যাঁর শরীরে এই চারটি গুণ একত্র বর্ত্তমান, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক বলে খ্যাত হবেন। সেই কথা শুনে রাজারা সন্তুষ্ট হয়ে যে-যার রাজ্যে ফিরে গেলেন। ফেরবার সময় সকলেই কিছু না কিছু দক্ষিণা বিতুরকে দিলেন। নাগরাজ বরুণ দিলেন তাঁর নিজের গলার গজমুক্তার মালাখানি। এই মালাটি ছিল নাগরাণীর বিশেষ প্রিয় ; তাই রাজার

গলায় না দেখতে পেয়ে বিরক্ত হলেন, বিশেষ যখন শুনলেন যে সেটি বিত্বর পণ্ডিতকে রাজা দিয়েছেন। মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে তিনি বিত্বর পণ্ডিতের কাছে যাবেন এবং পণ্ডিতের বিদ্যার পরীক্ষা করবেন। নানা ফন্দি করে শেষে রোগের ভান করে শয্যা নিলেন। আর নাগরাজকে বল্লেন যে বিত্বর-পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ডটি না আনলে তাঁর এই ব্যাধি কিছুতেই সারবে না।

একদিন নাগকন্যা ইরন্দতী তাঁর পিতাকে চিন্তাকুল দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা কন্যাকে সব কথা বল্লেন এবং উপদেশ দিলেন যে তিনি যেন শীঘ্রই এমন একটি পাত্রকে বিবাহ করেন যে বিত্বর পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ডটি উৎপাটন করে আনতে পারবে। ইতিমধ্যে একদিন ইরন্দতী উদ্যানে ফুল-শয্যা রচনা ক'রে নৃত্যগীত করছিলেন। এমন সময় পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে আকাশ-পথে যাচ্ছিলেন যক্ষ-সেনাপতি পূর্ণক। তিনি ইরন্দতীর নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। নাগরাজ তাতে সম্মতি দিলেন এই সর্ত্তে যে তাঁকে বিত্বর পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড আগে এনে দিতে হবে। পূর্ণক তাতে রাজী হয়ে গেলেন। ভাবলেন যে ধনঞ্জয় রাজাকে পাশা খেলায় হারিয়ে দিয়ে তাঁর কার্য্যোদ্ধার তিনি করে নেবেন সহজেই। পূর্ণক গেলেন ধনঞ্জয় রাজার কাছে। সহজে ধনঞ্জয়কে খেলায় নাবাবার জন্যে তিনি একটি মহা-মূল্যের হার বাজি রাখলেন। ধনঞ্জয়রাজ বিত্বর-পণ্ডিতকেই বাজি রাখলেন এবং হেরেও গেলেন। তখন পূর্ণক বিত্বরকে পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নাগরাজের রাজ্যে চল্লেন। পূর্ণক পথে বিত্বরকে মেরে তাঁর হৃৎপিণ্ডটা

নেবার অনেক চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হলেন না। শেষে বিদুর তাঁকে তাঁর মৃত্যুর সহজ উপায় বলে দিলেন এবং উপদেশ দিলেন যে নির্দ্দোষীকে কখনো হত্যা করবে না। পূর্ণক বিদুরের কথায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁকে সশরীরেই নাগরাজ-আলয়ে নিয়ে এলেন। বিদুর-পণ্ডিত নাগরাণী বিমলাকে কথাবার্ত্তায় এমন মুগ্ধ করে দিলেন যে নাগরাজ বরুণ ছয় দিনের মধ্যেই পূর্ণকের সঙ্গে ইরন্দতীর বিবাহ দিয়ে বিদুরকেও অব্যাহতি দিলেন। বিদুর কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের নিকট সহজেই ফিরে এলেন। এই সব বিষয় অবলম্বন করে অনেক চিত্রকলা অজন্তার ভিত্তি-গাত্রে অলঙ্কৃত হয়ে আছে।

ছবিতে বাস্তব ভাব না থাকায় একটা স্বাধীন ভাবে ভাববারও অবকাশ দেয়। ফটোগ্রাফের মত চিত্রকলা স্থাবর নয়, মনের মধ্যে তার রেশটি, ঝঙ্কারটি থেকে যায়। রেখা ও রঙের মধ্যে অজন্তার শিল্পীরা প্রাণ যেন ঢেলে দিয়ে গেছেন। অজন্তার ছবিতে নানা প্রকার গতিশীল ভঙ্গী আছে, বিশেষ হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে। এই সব ভঙ্গীতে বেশ একটা সহজ ভাব আছে। তাই মনে হয় না যে কোনো শিল্প-শাস্ত্রের বাঁধা নিয়ম মেনেই শিল্পীরা সর্ব্বদা চল্‌তেন। অতিরিক্ত নিয়ম-কানুন মানার ফলেই 'বাইজান্তাইন' শিল্প উরোপে ভাটা পড়ে গিয়েছিল এবং 'রেনেসাঁ' যুগের ও শিল্পের সেই কারণেই গতি বদলে যায়। অজন্তার ছবিতে কোথাও কোথাও প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে। তা থেকে জাতকের গল্পেরও তথ্য কিছু কিছু জানা গেছে। হিন্দু দেবদেবীর যদিও কোনো চিহ্ন ছবিতে থাকার

কথা নয়, কিন্তু লিপিব মধ্যে এক যায়গায় ‘সরস্বতী’ এই কথাটি পাওয়া গেছে। বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দু দেবতার প্রথম প্রচার হয় ১ম শতাব্দীতে মহাযান মতের প্রতিষ্ঠা হবার পর। এবিষয় পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এই ‘মধ্যমিকা’ বা মধ্য পথেব সন্ধান উত্তর দাক্ষিণাত্যের দার্শনিক নাগার্জ্জুনই প্রথম পেয়েছিলেন। সেই কারণেই প্রথম শতাব্দীর পর থেকে ৮ম বা ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধকীর্ত্তির মধ্যে ‘লক্ষ্মী’—ও ‘কুবেব’ প্রভৃতির চিত্র পাওয়া যায়।

অজন্তার চিত্রকলাব আধুনিক ইতিহাস

১৮১৯ সালে প্রথমে আধুনিক জগতে অজন্তার চিত্র পরিচিত হয়েছিল। তার পূর্ব্বে ছয় শত বৎসর মোগল রাজত্বকালে লোকচক্ষুব অন্তরালে গুহায় নিহিতই ছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক জেম্‌স ফার্গুসনই (James Fergusson) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদেব নিকট এই চিত্রগুলিকে উদ্ধার করার প্রস্তাব কবেছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মেজর জিল (Major Gill) তার নকল নেবার জন্যে গিয়েছিলেন, কিন্তু সিপাই বিদ্রোহের সময় তিনি ছবি নকলের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর আঁকা ছবির নকলগুলি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের কৃষ্টাল প্যালেস (Crystal Palace) প্রদর্শনীতে দুর্ভাগ্যবশতঃ পুড়ে যায়। বম্বে সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গ্রীফিথ্‌স (Griffiths) সাহেব ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সশিষ্য ছবিগুলির নকল করেন। তিনি ১৮৯৬ সালে অজন্তার চিত্রগুলি দুই খণ্ড পুস্তকে (The Painting of the Buddhist Cave Temples of Ajanta)

প্রকাশ করেন। গ্রীফিথস সাহেবের করা নকলগুলি সাউথ কেন্সিঙটন (South Kensington) মিউজিয়ামে রাখা আছে, যদিও অধিকাংশই তার পূর্ব্বেই পুড়ে গিয়েছিল। নকল-গুলিতে অজন্তার রঙ বা রেখার বিশেষ সাদৃশ্য নেই। অবশেষে ১৯০৯ এবং ১৯১০ সালে লেডি হেরিঙ্‌হ্যাম বিলাত থেকে আসেন ছবিগুলির নকল নেবার জন্যে। তার সঙ্গে এসেছিলেন মিস ডেভিস (Miss Davis), মিস্ লারচার (Miss Larcher) এবং মিস্ লিউক (Miss Luke)। শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁ'দের সাহায্যের জন্যে পাঠিয়েছিলেন নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ভেঙ্কটাপ্পাকে। তা'ছাড়া নিজাম-সরকার তাঁদের সাহায্যের জন্যে পাঠিয়েছিলেন ফাজিলুদ্দিন কাজি ও সৈয়দ আহম্মাদকে। এঁদের ছবিগুলি এখন [illegible] সাউথকে[illegible]টন যাদুঘরে (South Kensington Museum) রাখা আছে।

বাগগুহা চতুর্থ শতাব্দী

বৌদ্ধযুগের চিত্রকলার মধ্যে অজন্তা ছাড়া গোয়ালিয়ারের অন্তর্গত বাগগুহার দেয়ালের চিত্রাবলী ভারতের প্রাচীন চিত্র-কলার বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ২২২ ফুট লম্বা যে বারান্দার দেয়ালে ছবি-গুলি আঁকা হয়েছিল, তা'র সামনের থামগুলি চোখে দিচ্ছে প'ড়ে যাওয়ায় একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ছবি-বসে জীর্ণ কাঁথার মত দেয়ালের গায়ে লেগে আছে। ভাগ্যের মতই এই চিত্রকলা মানব-চক্ষের অন্তরালে এ[illegible]াল থেকে ছিল এবং ক্যাপটেন ড্যাঙগারফিল্ডের [illegible]apt. Dangerfield) ১৮২০ খৃষ্টাব্দের বিবরণ

থেকেই প্রথমে সেগুলির কথা জানা যায়। বাগ-গুহাশ্রেণী অজন্তা থেকে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। অজন্তারই মত এই বৌদ্ধ-গুহাসঙ্ঘ বর্ষাকালে চার মাস ভিক্ষুদের নির্জ্জন-বাসের জন্যেই তৈরী হয়েছিল এবং সেই কারণেই অজন্তার ন্যায় এটিও একটি নদীর ধারে মনোরম জায়গায় পাহাড়ের গায়ে তৈরী হয়েছিল।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ত্যাগী 'অনাগরিক' অর্থাৎ নগরের সঙ্গে তাঁদের কোনোই যোগ থাকবে না। বাগ ও অজন্তায় এই ত্যাগী অনাগরিকদের আবাসের দেয়ালে নাচ-গানের ছবি দেখে অনেকে বিস্মিত হন। বৌদ্ধ ভিক্ষু পুরোহিতদের আবাসে সেগুলির স্থান পাবার কারণ কি, তা' বোঝা শক্ত। তবে মহাযান বৌদ্ধেরা হিন্দু-ভাবাপন্ন হওয়ায় চিত্রকলায় মন দিতে পেরেছিলেন।

বাগগুহায় সার সার নয়টি গুহা-প্রাসাদ পাহাড়ের গায়ে কুঁদে বার করা হয়েছে এবং তারই নীচে একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে। এ গুহাগুলির বিশেষত্ব এই যে চৈত্য ও বিহার গুহা ছাড়াও "পাঠশালা" গুহা এখানে দেখতে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া অজন্তার বিহার-গুহার গর্ভ-গৃহে যেমন ধ্যানী-বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি আছে এগুলির মধ্যে আছে স্তূপ। প্রথম গুহাটিতে চিত্রকলার বিশেষ কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। তা'র খানিকটা অংশ দেখলে মনে হয় যে সেটি অসমাপ্ত অবস্থায় আছে। দ্বিতীয় গুহায় উপরে সুন্দর নক্সাকারী (decorative) কাজ যদিও আধুনিককালের সাধু সন্ন্যাসীদের বসবাসের ধোঁয়া লেগে একেবারে মলিন হয়ে গেছে। ...

র্শনীতে
ালয়ের
খৃষ্টাব্দ
রেন।
The
ta)

গুহাটিতে সামান্য রঙিন-চিত্র দেয়ালের কোনো কোনো যায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। দ্বারের এক পাশে চামর হাতে একটি মহিলার ছবি দেখা যায়। ঘরের মাঝে একটি পদ্মাসনে বুদ্ধদেব বসে আছেন ধ্যানে, মাথায় তাঁর রাজছত্র। ছবির কেবল অল্প অংশমাত্র অবশিষ্ট আছে। তাঁরই পাশে আরো একটি বিরাট ধ্যানী-বুদ্ধের ছবি সিংহাসনের উপর আঁকা। সিংহাসনের হাতোলটিতে একটি হাতীর পিঠে সিংহ (গজসিংহ) আঁকা আছে। পরবর্ত্তী কালের দক্ষিণ ভারতেব প্রাচীন মন্দিরাবলীর ভাস্কর্য্যে এইরূপ বিরল নয়। ৪র্থ ও পঞ্চম গুহা দুটি পাশাপাশি ভাবে তৈরী এবং এই দুটি গুহারই বাইরের দিকের বারান্দা; একই সঙ্গে ২২২ ফুট লম্বা ১১ ফুট চওড়া করে তৈরী এই বারান্দার দক্ষিণদিকে ৫১ ফুট লম্বা এবং ৭ ফুট চওড়া ছবি কতকটা বোঝা যায়, আর তার বিপরীত দিকের প্রায় ২২ ফুট চিত্র একেবারেই অস্পষ্ট। এই অস্পষ্ট ছবিগুলির মধ্যে একটি অজন্তার দেবদ্বারীর মত ছবি ছিল, এখন কেবল তার ছায়ামাত্র অবশিষ্ট আছে। ছবিগুলির উপর ধূলা-বালি ভরে যাওয়ায় জল দিয়ে না ভেজালে কিছুই দেখা যায় না।

প্রথমেই একটি ছবিতে আছে ঝরোখার পাশে রাণী চোখে হাত দিয়ে কাঁদছেন এবং একটি সখী তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ঝরোখাটির উপরে দুটি নীল রঙের কপোত কপোতী বসে আছে। তা'রই পাশে একটি দেয়ালের ছবি এঁকে ভাগ ক'রে দেখানো আছে, রাজা ও পরিষদ বসে আছেন এবং একজন তাঁদের সম্মুখে রাজদূত যেন হাত নেড়ে কি বোঝাবার

চেষ্টা করছেন। সকলের মুখের গম্ভীর ভাব দেখলে মনে হয় যেন একটি কোনো গভীর সমস্যার সমাধান করতে তাঁ'রা চাচ্ছেন। অজন্তার মত এই চিত্রে একটি বামন ভৃত্যেরও ছবি আছে। (অজন্তায় রাজ-দরবারের ছবিগুলিতে বামন ভৃত্যের অভাব নেই; মনে হয় তখন রাজাদের এটা একটা 'ফ্যাসান' ছিল।) এই ছবির পাশে আছে বৌদ্ধ অর্হতদের মেঘের উপর ভেসে চলার ছবি। কারু হাতে ফুলের সাজি, কারো বা হাতে বাদ্যযন্ত্র। বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের খৃষ্টান সাধুদের মত (Saint) তখন নানাপ্রকার অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচলিত ছিল। সেকালের প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থেও তা'র অনেক নজির আছে। এই ছবিটির ঠিক নীচে এক শ্রেণীতে কতকগুলি ছবি ছিল—তা'র বজ্রলেপ সমেত এখন দেয়াল থেকে খ'সে গেছে। অবশিষ্ট অংশ থেকে ছবিগুলি যে খুব সুন্দর ছিল তা' বোঝা যায়। এরই পরের অংশে বাগগুহার বিখ্যাত নৃত্যকলার ছবিটি আছে। নানাপ্রকার করতাল মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মহিলার দল একটি তাণ্ডব নৃত্যশীল এবং পারস্যদেশীয় পোষাক ও পরচুলো-পরা লোককে ঘিরে নৃত্য করছে। সামনে একটি মঞ্চাসনে থালার মধ্যে নানাপ্রকার ফল রাখা আছে। ঠিক এইরূপই আর একদল নারীর নৃত্যের ছবি তা'রই সংলগ্ন অংশে আছে। পারস্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ-সূত্রের পরিচয় এই সকল চিত্রকলায় আছে। এই নাচের দৃশ্যের পরেই একটি প্রাচীর দিয়ে ভাগ করা একটি মিছিলের ছবি আঁকা আছে। হাতী ও ঘোড়ায় চড়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কোনো রাজা যেন নাচের আসরের অভিমুখে আসছেন

এইরূপ দেখানো আছে। মিছিলের সব শেষে কয়েকটি নর্ত্তকী পিঠে ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বেঁধে হাতীতে চড়ে চলেছে। একজন অন্যজনকে কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। এই ছবির অশ্বারোহী পুরুষদের মাথায় উড়িষ্যাবাসীদের মত ঝুঁটি বাঁধা এবং পরণে ছিটের ডুরে-কাটা কোর্ত্তা আঁটা। একটিতে হংস-মিথুনের ছিটের নক্সাকারীর কাজ আছে। এই শোভাযাত্রার মধ্যে একটি হাতীর পিঠে রাজা তাঁর একটি হাতে নীল পদ্ম উল্টে ধরে বসে আছেন। বিষণ্ণ ভাবটি মুখে বেশ ফুটে আছে। তাঁরই পিঠের কাছে একজন ছত্রধারী বসে আছে। রাজাকে যেন কেহ বন্দী ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তাই তাঁ'র মনে সুখ নেই। এই ছবিতে আঁকা হাতী ও ঘোড়া-গুলির ছবি খুবই জীবন্ত। হাতী ও ঘোড়ার ছবিতে সরু মোটা রঙের ফোঁটা (stippling) দিয়ে আলোছায়া দেখানো হয়েছে। আঁকার মধ্যে বেশ একটু যত্নের ভাব আছে। লঙ্কাদ্বীপের মহাবংশ পুরাণ পাঠে জানা যায় যে তখন আরব দেশ থেকে (ইরাণ) ভাল ভাল ঘোড়া আমদানী হতো। বাগগুহার এই চিত্র দেখলে ইটালীর প্রাচীন চিত্রের ঘোড়ার ছবির কথা মনে পড়ে। একপ্রান্তে একটি চৈত্য-গুহার মত তোরণদ্বার, আর তা'র পাশেই একটি মুণ্ডিত-মস্তক ভিক্ষু উদ্যানে বসে আছেন, এইরূপ আঁকা আছে। প্রাচীনকালে বৌদ্ধযুগে একপ্রকার আরাম-স্থানের বা পার্কের বিষয় জানা যায় এবং তা'কে তখন 'আরামই' বলা হ'ত। সারনাথের হরিণ-আরামের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

অন্যান্য গুহাগুলির মধ্যে প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেবল কোথাও কোথাও ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে চিত্রকলার

সামান্য চিহ্ন কিছু কিছু দেখা যায় বটে, কিন্তু সেগুলিকে উদ্ধার করা অসম্ভব। গুহাগুলি যে পাহাড়টিতে খোদাই করা হয়েছিল, দুঃখের বিষয় সেটি একটি কাঁচা বালি-পাথরের পাহাড়, তাই সহজেই নষ্ট হয়ে গেছে।

বাগগুহার আধুনিক ইতিহাস

বাগগুহাগুলিকে আবিষ্কার করার পর 'ডাঙ্‌গারফিলড্‌' সাহেব যা' ছবিগুলির নকল করেছিলেন তার পরেও ডাক্তার ইম্পে (Impey) সাহেবও কিছু কিছু আরো নকল করেছিলেন বলে জানা যায়। ডাক্তার বারজেস্‌ (Dr. Burges) গ্রিফিথ্‌স সাহেবকে অজন্তার ছবির নকল করার সময় বাগগুহার ছবিরও নকল করতে অনুরোধ করে লিখেছিলেন। কিন্তু তার পরে লুয়ার্ড (Luard) সাহেবই পুনরায় কিছু ছবি বাগগুহায় গিয়ে নকল করেছিলেন। সম্প্রতি ১৯১৭ সালে অসিতকুমার হালদার প্রথমে গোয়ালিয়র-দরবারের তরফ থেকে ছবিগুলি নকলের উপযোগী কিনা দেখতে যান এবং ১৯২১ সালে তিনি নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ করকে নিয়ে সেগুলি নকল করেন গোয়ালিয়র-প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের জন্যে। বাগগুহায় পূর্ব্বে কেহই কোনো প্রাচীন লিপি খুঁজে পান নি। ছবিগুলি নকল করবার সময় যে লিপি সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছিল, তা' থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪র্থ শতাব্দীর বলে অনুমান করেছিলেন। চিত্রগুলি যদি ঐ সময়ের হয় তবে গুহাগুলি নিশ্চয় তা'র পূর্ব্বে কোনো সময় তৈরী হয়েছিল।

বাগ ও অজন্তার সমসাময়িক চিত্রকলা কশ্যপরাজের আমলের (৪৭৯-৪৯৭ খৃঃ) লঙ্কাদ্বীপে সিগিরিয়ায় এখনো

সিংহলের চিত্রকলা ৪৭৯-১২০০ খৃঃ

বর্ত্তমান। এই সিগিরিয়া (বা সিংহগিরি) ৬০০ ফুট উঁচু একটি পাহাড় এবং তারই গায়ে কোঠরের মধ্যে রক্ষক দেবতাস্বরূপ জলদেবীদের মূর্ত্তি আঁকা আছে নানা রঙে। ছবিগুলিতে রঙ দেওয়ার প্রণালী কতকটা অজন্তারই মত; গহনা ও পরিচ্ছদেরও বেশ সাদৃশ্য আছে। এই সময়কার সিংহলের বিখ্যাত প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি স্তূপের গায়ে (Ruwanweli Dagoba) কতকগুলি ছবি আছে। তা ছাড়া সিংহলের মধ্যপ্রদেশে তামান্‌কাডওয়াতে (Tamankadwa) একটি পাহাড়ের গায়ে গুহার মধ্যে পাঁচটি মুকুটধারী সারি সারি রাজাদের ছবি আঁকা আছে। রাজারা ডুরে ছিটের কাপড়-ঢাকা গোল মোড়ার মত আসনের উপর যোড়হাতে বসে আছেন। এই গুহার নিকট যে প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে, তা'র পাঠোদ্ধার না হওয়ায় চিত্রগুলির বয়স নির্ণয় করা যায় না। তবে এগুলিও অজন্তা এবং সিগিরিয়ার ধরণেরই চিত্রকলা। সিংহলে এর অনেক পরবর্ত্তী-কালের (১০০০-১২০০ খৃঃ) চিত্রকলা পোলানারওয়া, দাম্বোল, কেলনিয়া বিহার (কলম্বো) এবং দেগালডুরুয়া (কান্দী) প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলির মধ্যে এখনো দেখতে পাওয়া যায়। এই ছবিগুলির মধ্যে পাপের পরিণাম ও নরক প্রভৃতির চিত্র আছে। ছবিগুলি আলঙ্কারিক রীতিতে আঁকা এবং তেমন প্রাণ নেই তাতে। ভীলুবন বিহারের ভিত্তি-চিত্র পরাক্রমবাহু রাজার আমলের (১১৫৩—১১৮৬ খৃঃ) এখনো সিংহল-দ্বীপে যা আছে, সেগুলিও অজন্তার ছবিগুলির ধরণের বলেই মনে হয়।

মধ্যযুগ ভারতের চিত্রকলার একটি অন্ধযুগ। তখনকার প্রাচীন শিল্পীদের বিবরণ কোনো কোনো প্রাচীন লিপি বা গ্রন্থ থেকে কখন কখন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাদের সঠিক সময় নির্দ্দেশ করা কঠিন। প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্র এবং বিশেষ করে তারানাথের লেখা গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে শিল্পকলার রীতি-পদ্ধতির (technique) অনেক প্রকারের চলন সে সময় ছিল। তারানাথের গ্রন্থে উত্তর ভারতের কয়েকটি শিল্পীর নামেরও উল্লেখ আছে। জয়, পরাজয় ও বিজয় এঁরা তিনজন বিশেষ গুণী শিল্পী ছিলেন বলে তখন খ্যাতি ছিল। মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর ও চিত্র-শিল্পী ধীমানের পুত্র বীতপালও খুব প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী ও ভাস্কর ছিলেন। শিষ্য-পরম্পরায় এঁদের নাম অনেককাল ধরে শিল্প-জগতে তখন স্থায়ী হয়েছিল।

মধ্যযুগ
৬৫০—১৪২৭ খৃ

অজন্তা, বাগগুহা ও সিগিরিয়ার ন্যায় পণ্ডুকোটে সিওনা-ভাসালে ৭ম শতাব্দীর আঁকা জৈন গুহা-মন্দিরে ভিত্তি-চিত্র পাওয়া গেছে। এগুলি পহ্লবীরাজ মহেন্দ্রবর্ম্মণের সমকার বলে জানা গেছে। এক সময় গুহাটি অনেক চিত্রকলায় শোভিত ছিল। এখনো যা' অবশিষ্ট আছে, তা' থেকে চিত্র-কলার ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট বোঝা যায়। বারান্দার ছাদে একটি কমলশোভিত সরোবরের ছবি আছে। এই সরোবরে মদমত্ত হস্তী, হংস, মীন, মহিষ এবং পদ্মফুলধারী তিনটি মনুষ্য-মূর্ত্তি আছে। ছবির বর্ণিত বিষয়ের এখনো কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। গুহাটির থামের উপর নক্সাকারী কাজের মধ্যে পদ্মফুল এবং তা'রই সঙ্গে নর্ত্তকীর সুন্দর নৃত্য-ভঙ্গীর ছবি

আছে। একটি মুকুট-কুণ্ডলধারী পুরুষ-মূর্ত্তি আছে সেটিকে শিবের মূর্ত্তি বলে অনেকে অনুমান করেন। জৈন মন্দিরে শিবের ছবি যে কি করে আঁকা সম্ভব হয়েছিল বলা যায় না। এই চিত্রগুলির রঙ ও রেখার টান দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, ভারত-শিল্পের গতি-বেগ পরম্পরা-সূত্রে গেঁথে চলেছিল; অনেক দিন পর্য্যন্ত তা'র প্রাণ-শক্তি ক্ষীণ হয়নি সে সময়। সিওনা-ভাসালের পরেই কাশিভারামের কৈলাসনাথের মন্দিরের চিত্রগুলি এখন একেবারে ধ্বংসের মুখে আছে। তা'ছাড়া নারথমালাইয়ের পাহাড়ের পাণ্ড্যরাজের আমলের ৯ম শতাব্দীর মন্দিরটিতেও কিছু চিত্র আছে, তার মধ্যে কালীর তাণ্ডবনৃত্যের ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইলোরার গুহা-মন্দিরেও কিছু কিছু চিত্রাবলীর খোঁজ পাওয়া গেছে। গুহাগুলি যে কোনোকালে চিত্র-শোভিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি (১৯৩০ সালে) তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরে চোলরাজাদের সময়কার ভিত্তি-চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি মন্দিরের গর্ভগৃহের পাশে লোক-চক্ষুর অন্তরালে অন্ধকারে প্রদক্ষিণা-অলিন্দের দেয়ালে আঁকা আছে। এই মন্দিরটি ১০০৯—১০১০ খৃঃ চোলরাজের দ্বারা তৈরী হয়েছিল। ভিত্তি-চিত্রে আছে, হাতী শুঁড় উঁচু করে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলেছে এবং তা'র পিঠে একটি রাজা বসে আছেন। পটভূমিতে পাহাড়ের মত আঁকাবাঁকা রেখা আঁকা এবং তা'রই পিছনে আকাশের উপর কিন্নরদের গীতোৎসবের ছবি। ছবির ছন্দ-সমাবেশ (composition) খুবই সুন্দর এবং হাতীর ছবির রেখাগুলি মোগল-আমলের ছবির রেখার মত বলে মনে হয়। মোগলের পূর্ব্বেকার শিল্পের সঙ্গে যোগ-

সূত্রটি এই চিত্রে বেশ ধরা পড়ে। অজন্তার সঙ্গে ঠিক এগুলিকে এক দলে ফেলা যায় না। যদিও চিত্রগুলি অজন্তার মতই রেখা-প্রধান। অজন্তা ও বাগগুহার চিত্রের সমসাময়িক হিন্দু চিত্রাবলীর মধ্যে বিজাপুর জেলায় বাদামী-গুহায় চালুক্যরাজ মঙ্গলেশ্বরের আমলের চিত্রকলার কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে। এগুলি ৫০০—৫৭৮ খৃষ্টাব্দের কোনো সময় আঁকা হয়েছিল বলে ডাক্তার শ্রীমতী ষ্টেলা ক্রামরীশ মনে করেন। ছবির বিষয়গুলি বেশীর ভাগ শৈব বলেই মনে হয়। একটি শিবের তাণ্ডবনৃত্যের ভাবের ছবি আছে। তার একটি হাতে কথক-মুদ্রা, অপরটি লোল-হস্ত, চক্ষে নৃত্যের মাদকতা। বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী প্রভৃতির ছবিও বাদামী-গুহাটিতে আছে। বাদামী গুহার ভাস্কর্য্যের উপরও নানা চিত্রে অলঙ্কৃত।

মান্দ্রাজে তাঞ্জোর ছাড়াও ত্রিচুরে, তিরুমালাইপুরামের মন্দিরের গায়ে ১১শ শতাব্দীর কেরালা যুগের রাজাদের আমলের চিত্রাবলীও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পহ্লব, চোল, পাণ্ড্য ও কেরালা রাজারা মধ্যযুগের ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন এবং তাঁদের আমলের চিত্রাবলী কিছু কিছু এখন আবিষ্কৃত হচ্ছে নানা মন্দির প্রভৃতির গায়ে। ১৬শ শতাব্দীর আঁকা কোচীনের প্রাচীন প্রাসাদে শিবের বিবাহের পাঁচটি ধারাবাহিক ভিত্তি-চিত্র দেখলে মনে হয় যেন ছবিগুলি রেখায় রেখায় জীবন্ত হয়ে আছে। এগুলির ভিতর অজন্তার রেখা-লাবণ্য ও দ্রাবীড়ী ভাব দুয়েরই সুন্দর সমাবেশ হয়েছে। সম্প্রতি শিল্প-রসিক ডাক্তার কাজিন্স (Dr. James H. Cousins) ত্রিবাঙ্কুরের নিকটবর্ত্তী পদ্মনাভপুরমের প্রাচীন

রাজপ্রাসাদের দেয়ালে কিছু প্রাচীন চিত্র আবিষ্কার করেছেন। এগুলি ১৭শ খৃষ্টাব্দীর শেষ ভাগের কাজ বলে মনে হয়। মহিষমর্দ্দিনী, দুর্গা, গণেশের নৃত্য প্রভৃতি ছবিগুলি আলঙ্কারিক একটি বিশেষ রীতিতে আঁকা। এগুলিতে দ্রাবীড়ী ছাপ খুব বেশী আছে। মধ্যযুগের চিত্রকলার দৃষ্টান্ত জৈনী পুঁথিতে এবং বাঙলাদেশের পুঁথির পাটায় আঁকা ছবিগুলিতে কিছু পাওয়া যায়। ভিত্তিচিত্র (fresco) যেভাবে ঘটনা-পরম্পরা একই ছবিতে একসঙ্গে সাজিয়ে দেয়ালের গায়ে আঁকার প্রথা প্রচলিত ছিল জৈন পুঁথির ছবিগুলিও তারই অনুরূপ ভাবে আঁকা। বেশীর ভাগ লাল রঙের জমীর উপর হলুদ, সবুজ, কাল প্রভৃতি রঙ দিয়ে ছবিগুলি আঁকা হতো। ঠিক সে-সময় দেয়ালে আঁকার যে প্রচলন ছিল, তা'রই প্রমাণ দেয় এই ছবিগুলি। জৈন ছবিগুলি বেশীর ভাগ গুজরাটের জৈন মন্দিরের সংলগ্ন গ্রন্থশালায় পাওয়া যায়। তার মধ্যে শালিভদ্র চিত্রাবলী একটি প্রাচীন জৈন পুরাণ অবলম্বন করে আঁকা হয়েছে, এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগের খোটান, চীন, আফগানিস্থান ও জাপানের চিত্রকলা

মধ্যযুগের চীন তুর্কিস্থানের অন্তর্গত খোটানের চিত্রকলা যা ডাঃ স্টাইন (Dr. Stein) আবিষ্কার করেছেন তা'থেকে ভারতবর্ষের চিত্র-শিল্পের ধারা কি ভাবে দেশবিদেশে প্রসার-লাভ করেছিল এবং তা'র জীবনীশক্তি কিরূপ ছিল, তা' বোঝা যায়। খোটানের চিত্রগুলিতে গ্রীক, পারস্য, ভারতীয় ও চীন সভ্যতার একটি অপূর্ব্ব সমাবেশের কথা জানা যায়। খোটানে পারস্য পোষাকে ভূষিত বোধিসত্ত্বের ছবিটিতে আছে অজন্তার মত ভঙ্গী। তা'ছাড়া তাঁ'র চার হাত

যোজনা করায় হিন্দু-প্রভাবও বেশ বোঝা যাচ্চে। একটি হাতে ইরাণী কায়দায় পেয়ালা ধরা আছে এবং আর এক হাতে হিন্দু দেবতারা যেরূপ পদ্ম ধরে থাকেন, রজনীগন্ধা ধরে আছেন। অন্য দুটি হাতের মধ্যে একটিতে অস্ত্র ধারণ ক'রে আছেন। খোটানের ভিত্তি-চিত্রে আছে ঠিক অজন্তার অনুরূপ ভাবে আঁকা বৌদ্ধভিক্ষুর ছবি এবং তারই নিকটে সান-বাঁধানো পদ্মপুকুরে একটি নারী স্নান করছেন; সঙ্গে একটি শিশু, তার গায়ে ও মাথায় অজন্তার মত গহনা। মধ্য-এসিয়ায় এইরূপ চিত্র 'টারফান', 'মিরাণ' প্রভৃতি স্থানেও অনেক পাওয়া গেছে। এগুলি বাহুল্য-বর্জ্জিত ভাবে আঁকা। আঁকার ধরণ খোটানের মতই। মনে হয় যেন এগুলির সঙ্গে নেপালী ও তিব্বতী ছবির ঐক্য আছে। জৈনীদের মত বুদ্ধের চিত্রে। নানাপ্রকার রূপক মাঙ্গলিক চিহ্ন দেওয়া আছে।

জাপান ও চীনের চিত্রকলার বিষয় আলোচনা করলে জানা যায় যে খোটানের মারফৎ কি ভাবে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি বিস্তার-লাভ করেছিল সেই সব সুদূর দেশে। চীন সম্রাট হিয়াঙটি (১০৫—১১৯ খৃঃ) অনেক বিদেশী শিল্পীদের নিজের রাজ-দরবারে নিযুক্ত করেছিলেন বলে জানা যায়। চীন দেশে সে সময় বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে ভারতীয় শিল্পী 'বাজনার' কাজের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ভাবে চীন-জাপানে ও কোরিয়ায় ভারতীয় শিল্পের প্রভাব বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার-লাভ করেছিল। চীন দেশে শানসি প্রদেশের গুহা-মন্দিরে এবং হোনেনের বিরাট বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের সংলগ্ন দেয়ালের গায়ের চিত্রকলায় এখনো ভারতীয় চিত্র-শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট রয়েছে চীনদেশের সহস্র-বুদ্ধের

গুহাবলীর দেয়ালের চিত্রগুলি এবং জাপানের হোরিওজি মন্দিরের ভিত্তি-চিত্রাবলীর মধ্যে ভারতীয় বৌদ্ধ-চিত্রকলার বেশ আমেজ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চীন-জাপানের মত আফগানিস্থানেও তা'র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আফগানিস্থানে বামিয়ানের গুহার মধ্যে যে সব ভিত্তি-চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি বৌদ্ধ, ইরাণী ও গ্রীক শিল্পের সংমিশ্রণে উদ্ভূত একটি বিশেষ চিত্রকলা বলে মনে হয়। কিন্তু তা'তে ভারতের ঐতিহ্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে।

নেপাল ও তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের চিত্রকলা

মধ্য যুগের অন্তর্গত চিত্রকলা হিমালয়ে অর্থাৎ নেপাল ও তিব্বতে যা' প্রচলিত ছিল, তারই বিষয় এখন বলব। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তান্ত্রিক হিন্দুদের সহযোগে এক অপূর্ব্ব চিত্র-শিল্পের রূপ প্রকাশ পেয়েছিল উল্লিখিত দেশে। তাই তিব্বতের বৌদ্ধ সঙ্ঘ-মন্দিরের দেয়ালে এবং পতাকা-চিত্রে (Tibctan Banners) এইরূপ চিত্রকলা আজ পর্য্যন্ত আকা হয়ে থাকে। এই সব চিত্রকলা তান্ত্রিক পুরাণ ও যন্ত্রমন্ত্রের চিহ্ন প্রভৃতির দ্বারা এরূপ ভারাক্রান্ত যে সেই সব চিত্রকলাকে জানতে এবং ভাল করে বুঝতে হলে তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক কিছু জানা দরকার। শিল্পকলার অন্ধযুগের সময় এইরূপ নিয়ম-প্রণালীর ও রূপক চিহ্ন প্রভৃতির বাঁধাবাঁধি ভাবই বেশী দেখা যায়। শিল্পী যখন সহজভাবে ভাবতে পায় তখনই সে হৃদয়ের সব চেতনাকে তা'র চিত্রের মধ্যে জাগাবার সুযোগ পায়। আর যখন তা'র নিজের আঁকার তাগিদের চেয়ে নিয়ম ও প্রতীকের তাগিদ বেশী থাকে, তখন তা'র হাত

দিয়ে বের হয় প্রাণহীন রেখা ও রঙের ছাপমাত্র। সব দেশেরই শিল্পকলার ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। অবশ্য ধর্ম্ম-সংস্কারই তা'র জন্যে দায়ী। তিব্বতে তাই ধর্ম্মচক্র ঘুরিয়ে ধর্ম্ম অর্জ্জন এবং প্রতীক চিহ্ন দিয়ে শিল্পকলা বাঁধা নিয়মে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে, এখনও তার নড়চড় নেই। নেপালী ও তিব্বতী চিত্রগুলিতে মঞ্জুশ্রী, বোধিসত্ত্ব, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, তারা, বজ্রতারা প্রভৃতি চিত্রই বেশী দেখা যায়। আসলে দেবতার সঙ্গে নানা প্রকার উপদেবতারও ছবি থাকে। নেপালের ন্যায় ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ মন্দিরে ও প্যাগোডার গায়ে চিত্রাবলী দেখা যায়। নবম শতাব্দীর পুরাতন চিত্রকলা ব্রহ্মদেশে পেগানের স্তূপে ও বৌদ্ধ মন্দিরে আছে।

রাজপুত ও কাঙড়ার চিত্রকলা ১৫০০—১৮০৫ খৃঃ

মধ্য যুগের অনিশ্চয়তার পরেই একেবারে আকবরের সময় থেকেই ভারতীয় চিত্রকলার এক নবযুগের সন্ধান আমরা পাই। সূক্ষ্ম কাশ্মীরী শালের কাজ, সোনার উপর মিনার কাজ প্রভৃতি যেমন ভারত-শিল্পের বিশেষ গৌরবস্বরূপ ছিল, তেমনি ভারতীয় চিত্রকলার সূক্ষ্ম তুলির টানের তুলনা পারস্যদেশ ছাড়া আর অন্য কোনো দেশে নেই: এই বিশেষ ধরণের সূক্ষ্ম চিত্রকলা (miniature) ভারতবর্ষের একটি বিশেষ সম্পদ। পারস্য চিত্রকলার সঙ্গে তাই এইখানেই বিশেষ মিল ছিল। মোগল-দরবারে বাদশাদের সূক্ষ্ম রুচি ও রসবোধের প্রভাব ভারতের অন্যান্য রাজাদেরও মধ্যেও দেখা দিয়েছিল এবং তা'রই ফলে, তখনকার শিল্পীরা অবাধে এই বিশেষ একটি ধরণের কলা গড়ে তুলতে পেরে-

ছিলেন। চিত্রগুলি এত সূক্ষ্মভাবে আঁকা যে মোগল বা রাজপুত-চিত্র ভাল করে দেখতে হলে একটি আতপ ফলকের (magnifying glass) প্রয়োজন হয়। ছবিতে মানুষের প্রত্যেক কেশের রেখা, মুখের ভাব প্রভৃতি এত চুল চিরে সূক্ষ্ম-রেখাপাতে ধ'রে ধ'রে এঁকে দেখানো হতো যে তা এখন দেখলে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়। রঙের কথা বাদ দিলেও কেবল সেইরূপ সূক্ষ্ম তুলির রেখা-সম্পদ বাড়াতে হলে আশৈশব কত সাধনার প্রয়োজন, তা' ছবিগুলি দেখলেই বেশ বোঝা যায়।

রাজপুত-চিত্রকলার অতি প্রাচীন নিদর্শন এখন খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। রাগিণীর চিত্রাবলীর মধ্যে দৈবাৎ কখন কখন প্রাচীন ছবি যা' দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি কতকটা মধ্যযুগের জৈন চিত্রকলার ধরণের বলে মনে হয়। এই সব প্রাচীন রাজপুত-চিত্রগুলিতে ঠিক জৈন-চিত্রের মত সাধাসিধা ভাব আছে। ছবিতে গাছপালা, মানুষের আকার প্রভৃতি ফোটানো হয়েছে এক রঙা পট-ভূমির (background) উপর। গাছপালাগুলি আলঙ্কারিক রীতিতেই আঁকা। রেখার চেয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-সমবায়ে (colour harmony) ছবিটিকে ফোটানো হ'তো,—পরবর্ত্তী যুগের চিত্রের মত সূক্ষ্মভাবে তার আকার রেখার দ্বারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হতো না। তা' ছাড়া এই সকল প্রাচীন রাজপুত-চিত্রগুলি দেখলে মনে হয় যে ইরাণ থেকে আনা মোগল দরবারের কৃষ্টির চেয়ে মধ্যযুগের প্রাচীন জৈন-শিল্পের প্রভাবই তাতে আছে।

ডাক্তার আনন্দ কুমারস্বামীই প্রথমে রাজপুত-চিত্রকলার

শ্রেণী বিভাগ করেন। তাঁর মতে রাজপুত-চিত্রকলার তিনটি বিশেষ ধারা আছে: যথা:—(১) রাজস্থানী (অর্থাৎ যেখানে কেবল রাজপুতদের বাস—জয়পুর, মাড়োয়াড়, বুন্দেলখণ্ড, কাঠিওয়ার ইত্যাদি) (২) পাহাড়ী (অর্থাৎ জম্মু, কাশ্মীর কাঙড়া, গাড়োয়াল) (৩) এবং শিখ (যা রঞ্জিৎ সিংহের সময় ১৮০৩ খৃঃ থেকে ১৮৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে চলেছিল)। এখন সাধারণতঃ রাজপুত-চিত্রের নির্ব্বাচন হয় জয়পুর-কলম, কাঙড়া বা পাহাড়ী-কলম, এবং বুন্দেলখণ্ডি-কলম এই তিনটি বিশেষ ভাগে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে (১৪৮৫—১৫৩৩ খৃঃ) বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার তাঁ'র শিষ্য-পরম্পরা দেশবিদেশে করায় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গীতি-কবিতা, গীতিনাট্য প্রভৃতি দেখা দিয়েছিল। বৈষ্ণব-সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার চিত্রকলাও দেখা দিয়েছিল এবং রাজপুত-চিত্রকলা তা'রই প্রভাবে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়েছিল। রাম না থাকলে যেমন রামায়ণ অসম্ভব হ'তো, তেমনি বৈষ্ণব-সাহিত্য না থাকলে এই মধুর শিল্পকলা কখনই সম্ভব হ'তো না। রামানুজ ও মাধবের সংস্কৃত ভাষায় লেখা বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী, জয়দেবের গীত-গোবিন্দ (ত্রয়োদশ শতাব্দীর) রামানন্দের রচনা (পঞ্চদশ শতাব্দীর), কবীর, বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস, তুলসীদাস, কেশব দাস, বেহারীলাল প্রভৃতির লেখা দোঁহা ও গীতিকাগুলির বিষয় না জানলে রাজপুত-চিত্রকলার মধ্যে প্রবেশ-লাভ করা যায় না। এই সব বৈষ্ণব হিন্দু শিল্পীদের সে সময়কার প্রাণের আবেদনের পরিচয় তাঁ'রা তাঁ'দের চিত্র-রচনায় রেখে গেছেন। যদি চিত্রগুলিকে এইভাবে দেখা যায়, তবে তা'র আধুনিক উরোপীয় ধারায়

পারিপ্রেক্ষিক (perspective) বা শারীর-তত্ত্ব (anatomy) বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে দেখার প্রয়োজন হয় না। বৈষ্ণব-ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁ'রা যে-কোনো বিষয় ছবি এঁকেছেন তারই মধ্যে একটা সহজ সৌন্দর্য্য এনে ফেলেছেন। রাধাকৃষ্ণের লীলার ছবি ছাড়াও তাঁরা রাগ-রাগিণীর ও ঋতু-বর্ণনার চিত্রও অনেক এঁকে গেছেন। রাগ-রাগিণীর ছবিগুলি সঙ্গীত-শাস্ত্রের বর্ণনার অনুরূপ তাঁরা আঁকতেন।

সঙ্গীত শাস্ত্রে আছে সাতটি স্বরের অধিষ্ঠাতৃদেবতার বিষয়। যথা : ষড়্‌জ স্বরের (সা) দেবতা হলেন অগ্নি, ঋষভের (ঋ) ব্রহ্মা, গান্ধারের (গ) সরস্বতী, মধ্যমের (ম) মহাদেব, পঞ্চমের (প) বিষ্ণু, ধৈবতের (ধ) গণেশ এবং নিখাদের (নি) সূর্য্য। তা' ছাড়া ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর স্বতন্ত্রভাবে রূপ-বর্ণনা আছে। প্রত্যেক রাগের ছয়টি স্ত্রী বা রাগিণীর কল্পনা করা হয়েছে। শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম মেঘ, নটনারায়ণ এই ছয়টি রাগ এবং মালবশ্রী, ভূপালী, ভৈরবী, তোড়ী প্রভৃতি ছত্রিশটি রাগিণী এই রাগগুলিরই অন্তর্গত। এ বিষয়ে পঞ্চম শতাব্দীর লেখা রাগমালা ও নাট্যশাস্ত্রে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। তা'র পরবর্ত্তী যুগের হিন্দী সাহিত্যে রাগশ্রেণীর উপর দোঁহা ও কবিতা লেখার চলন হয়েছিল বলে জানা যায়। যেমন তোড়ী রাগিণীর কল্পনা করা হয়েছে তুষার-কুন্দোজ্জ্বল দেহযষ্টি, কাশ্মীর কর্পূরবিলিপ্তদেহা বীণা-বাদনের দ্বারা বনের হরিণীদের চিত্তবিনোদন করছেন। মেঘ-পত্নী গান্ধারী-রাগিণী জটাধারিণী, নীলবসনা, মুদিতনয়না নম্র প্রশান্ত মূর্ত্তিতে যোগাসনে উপবিষ্টা দেখানো হয়েছে। হাম্বিরী রাগিণীকে শ্যামাঙ্গী পুষ্পচয়নরতা সখী-হস্ত-ধারণ ক'রে

নৃত্য করতে করতে ভ্রমণ করছেন—দেখানো হয়েছে। রাগ-রাগিণীর ছবিগুলি ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারতের চিত্রাবলীও অসংখ্য সে সময় আঁকা হয়েছিল। রাজপুত শিল্পীরা প্রতিকৃতি আঁকতে মোগল শিল্পীদের মতই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জয়পুর দরবারে রক্ষিত জয়সিংহ, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি রাজাদের বিরাট আকারের প্রতিকৃতি-চিত্রগুলির মধ্যে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। এগুলির মধ্যে বিলাতি তৈলচিত্রের ভাব মোটেই নেই, এগুলি তা'র আমদানীর অনেক পূর্ব্বেকার আঁকা ছবি। ছবিগুলির বিশেষত্ব এই যে এতে কেবল রঙ ও রেখায় পটভূমির উপর আকৃতিটি এঁকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে খুব সাধাসিধা ভাবে। তৈলচিত্রের মত এতে কোনো চাকচিক্য নেই—আছে কেবল একটি স্নিগ্ধতা।

রাজস্থানী ও কাঙড়ার মধ্যে ততটুকু তফাৎ—সহোদর ও বৈমাত্রেয় মধ্যে ঠিক যতটুকু। অর্থাৎ পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে না সে বিষয়ে অভিজ্ঞ না হলে। মোটামুটি দেখলে কাঙড়ার ছবিগুলির মধ্যে প্রধানত রঙের দিকে একটা অতিরিক্ত উজ্জ্বলতার ভাব এবং মানুষের ছবির সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমাবেশের চেষ্টা দেখা যায়। রাজস্থানী চিত্রে মানুষের ঘরবাড়ী আসবাব-পত্রের দিকেই লক্ষ্য বেশী দেখা যায়, প্রাকৃতিক দৃশ্য সেখানে মুখ্য নয়। কাঙড়ার ছবিতে মুনি-ঋষিদের আশ্রমের ছবি, পর্ব্বতকন্দরে নির্জ্জন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী প্রভৃতি সুন্দরভাবে আঁকা আছে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে সাধু-পুরুষেরা কি ভাবে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বাস ক'রে বিশ্ব-নিয়ন্তার সত্তাকে অহরহ উপলব্ধি করতেন তা'রই বিবরণ

এইসব কাঙড়া শিল্পীরা দেখিয়ে গেছেন। কৃষ্ণলীলার ছবি ছাড়া শৈবদেরও হরপার্ব্বতী, শিবের তাণ্ডব, শিবের বিবাহ প্রভৃতি চিত্রও বিরল নয়। গো ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি ও জীবে দয়া ধর্ম্মের একটি বিশেষ শিক্ষা হওয়ায় তখনকার শিল্পীরা গরু, বাঁদর, হরিণ প্রভৃতি জন্তুর ছবিও খুব ভাল ক'রে এঁকে গেছেন।

এই সকল চিত্রকলা মোগল আমলে উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয়েছিল। হিন্দু রাজারা শিল্পীদের বংশানুক্রমে জায়গীর দান ক'রে লালন পালন করতেন এবং পূজা-পার্ব্বণে ভাল কাজের জন্যে পারিতোষিক দিতেন। এখনো জয়পুর, ওরছা, আলোয়ার প্রভৃতি রাজ্যে প্রাচীন শিল্পকলার জের ক্ষীণ ভাবে চলেছে। রাজপুত-চিত্র-শিল্পের শেষ হয় জয়পুরে, কাঙড়ার চিত্র-শিল্পের শেষ হয় টেহরী-গাড়ওয়ালে এবং বুন্দেলখণ্ডি-চিত্রকলার শেষ হয়েছিল ওরছা রাজ্যের রাজাদেরই দরবারে। গাড়ওয়ালের শেষ বড় শিল্পী ছিলেন মোলারাম। এঁর নাম শিল্প-জগতে এখন প্রসিদ্ধ। তাঁর হাতের কালীয়দমন, কৃষ্ণ-রাধা, কৃষ্ণ-যশোদা প্রভৃতি চিত্রের বিষয় সকলেই জানেন। কাঙড়া-চিত্রে রাত্রে মশাল জ্বালিয়ে হরিণ শীকারের একটি সুন্দর ছবি আছে। কাঙড়ার মেয়েদের ছবি খুবই সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে আঁকা হতো। মেয়েদের মুখের বিশেষ ভাব ও ভঙ্গীগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষবোধের পরিচয় আছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে ইরাণ থেকে মহম্মদ গজনীর পনেরো বার ভারত-আক্রমণের পর তাঁরই বংশধর কুতুবুদ্দিন পেশোয়ার থেকে বিহার ও বাঙলা দেশ পর্য্যন্ত দখল

করেন। তিনিই বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলি নষ্ট করায় বৌদ্ধেরা দেশ ছাড়া হন। এতকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধেরা হিন্দুদের দেবতাদের মেনে নিয়ে মহাযান-ধর্ম্মপালনে রত ছিলেন। ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে কুতব সব শেষে পাটনা থেকেও বৌদ্ধদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজমীরে কুতবের তৈরী আড়াই দিনকা ঝোপ্‌রা প্রথম মোগল-অধিকারেরই নিশানস্বরূপ এখনো বর্ত্তমান আছে। মোগলদের-ভারত অভিযানের গোড়ার ইতিহাস যেমনি হৌক না কেন, রাজ্য-স্থাপনের পর ধীরে ধীরে তাঁরা স্থানীয় কৃষ্টির সঙ্গে এমন যোগযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁদের বাদ দিলে শিল্প-ইতিহাসের অনেক কিছু ভাল জিনিষই বাদ পড়ে।

মোগল-চিত্রকলা
১৫৫০-১৮০০ খৃঃ।

মোগল-চিত্রকলাকে "হিন্দু-ইরাণী" শিল্পকলা বলা যেতে পারে। কেননা ইরাণের তৈমুরী বংশের- রাজারাই মোগল সাম্রাজ্য এদেশে স্থাপনা করেছিলেন। এই তৈমুরী বংশ-ধরেরাই যে চিত্র-শিল্পে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন তা' ইরাণের পূর্ব্ব অঞ্চলে তাঁ'দের অধীনস্থ স্থানের প্রাচীন চিত্রকলাগুলি দেখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। সম্রাট বাবর যে সুবিখ্যাত ইরাণী শিল্পী বায়জাদকে বিশেষ সম্মান করতেন তা' তাঁ'র রোজনামচা কেতাব (বাবরনামা) থেকে জানা যায়। এই বায়জাদেরই শিষ্য খোজা আবদুল সামাদকে সিরাজ থেকে মোগল-দরবারে সম্রাট আকবর আনিয়াছিলেন। এই শিল্পীর সঙ্গে আকবরের দরবারে এক সঙ্গে কাজ করতেন অনেক হিন্দু শিল্পীরা। তাঁদের মধ্যে বেশ নামজাদা শিল্পী ছিলেন কেশবদাস, বিষ্ণু, যশবন্ত। এঁরা আকবরের হুকুমে

মহাভারতের উর্দ্দু তর্জ্জমার জন্যে চিত্র এঁকেছিলেন। এই 'রজম্‌নামা' বইখানির চিত্র ছাড়াও শিল্পীরা সম্রাটের জন্যে অসংখ্য ছবি এঁকেছিলেন বলে জানা যায়। ইরাণী ও হিন্দুস্থানী শিল্পীরা একযোগে কাজ করায় পরস্পর-ভাব-বিনিময়ে একটি অভিনব মোগল-শিল্প গড়ে উঠেছিল। সেই কারণেই মোগল-চিত্রে ইরাণী ও হিন্দুস্থানী (যা' মোগল যুগের পূর্ব্বে চলেছিল) এই দুইয়েরই সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া সম্রাট আকবর রাজপুত রাজ-কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং হিন্দুদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিছিলেন। রাজা অশোকের মত সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোই তাঁ'র রীতি ছিল। সেই কারণেই এরূপ একটা সহজ মিলন-ক্ষেত্র ইরাণী ও হিন্দুস্থানী শিল্পে ঘটতে পেরেছিল।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, মোগল-দরবারের চিত্রকলার একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে সেগুলি ইরাণী চিত্রকলার মতই সূক্ষ্ম ও ছোটভাবে (miniatnre) আঁকা হ'ত। একটি দামী অলঙ্কারের মত সেটিকে খুঁটিয়ে দেখবার জিনিষ। আকবর কিন্তু তাঁ'র ফতেপুরসিক্রির প্রাসাদের দেয়ালে বড় বড় ভিত্তি-চিত্র আঁকিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে তার বড় একটা চলন মোগল-দরবারে দেখা যায় নি, যদিও লতা-পাতা আঁকা নক্সা-চিত্রের খোঁজ পাওয়া যায় কিছু কিছু। অবশ্য আকবরের সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী রাজপুত রাজারা তাঁদের প্রাসাদের গায়ে ভিত্তি-চিত্র আঁকাতেন বলে জানা গেছে। জয়পুর অঞ্চলে ধনী-গৃহস্থেরা শয়ন-কক্ষকে 'সুখ ভবন' বলেন এবং তা'তে দেয়ালে নানা তীর্থস্থানের চিত্র

আঁকা থাকে। উদ্দেশ্য এই যে প্রাতে শয্যা ত্যাগ করে উঠেই যা'তে তীর্থ-দর্শনের পুণ্য তাঁ'রা সহজেই সঞ্চয় করতে পারেন। মোগল ভিত্তি-চিত্রে প্রধানত নক্সাকারী কাজেরই প্রচলন ছিল। এমন কি তা'র উপর নানা প্রকারের দামী পাথর বসিয়ে ফুল-লতা-পাতা আঁকা হতো। মোগল আমলের চিত্র-কলার বিবরণ আকবরের প্রধান মন্ত্রী আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে এবং 'আকবর-নামা' গ্রন্থে জানা যায়। আকবরের সময়কার প্রায় পঞ্চাশ জন শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। আকবরের সকল প্রকার শিল্পকলায় অনুরাগ ছিল। তিনি দৈনিক রাজ-কাজের মধ্যেও সুযোগ পেলেই শিল্পীদের কাছে বসে তাঁদের দিয়ে কাজ করাতেন।

হিন্দু-ইরাণী-চিত্রকলা আকবরের সময়ে যা' পাওয়া যায়, ত'ার মধ্যে কতকগুলি ইরাণী-যুদ্ধের ইতিহাস অবলম্বন করে আঁকা চিত্রও আছে। তৈমূরের দ্বারা তুর্কি সুলতানের বন্দী করার ছবিটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তা'ছাড়া সে সময়কার ফারাখবেগের আঁকা ইরাণী-ভাবের 'বাবরের দরবারের' ইরাণ-রাজ 'ফারীদুনের পুত্র ইরাজের' এবং 'বাবরের রোজনামচা লেখা' প্রভৃতি চিত্রগুলি ছাড়াও বাবর ও তৈমুরের প্রতিকৃতি চিত্রগুলিও মোগল যুগের চিত্রকলায় ইরাণী-প্রভাবের পরিচয় দেয়। এই সব চিত্রগুলি যে ঠিক বাবরের সমসাময়িক তা' জানবার এখন উপায় নেই। বাবর তাঁ'র পিতা ওমার শেখ মির্জ্জার (পূর্ব্ব তৈমুরী) রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে দিল্লীতে মোগল রাজ্যের গোড়া পত্তন করতেই ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁর দরবারে তখন চিত্রকলার স্থান দিতে পারেন নি। যুদ্ধ-বিগ্রহেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়

কেটে গিয়েছিল এবং ৪৭ বৎসর মাত্র বয়সে অকালে মানব-লীলা সম্বরণ করেছিলেন।

তার পরবর্ত্তী কালে তাঁর পুত্র হুমায়ুনের সময়েও বড়ই অশান্তি চলেছিল। কেননা পাঠান সর্দ্দার শের সা কর্ত্তৃক বিতাড়িত এবং পরে রাজ্য পুনরুদ্ধারের হাঙ্গামায় তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল কেটে যাওয়ায় শিল্পকলার দিকে বিশেষ নজর দিতে তিনি পারেন নি। দিল্লী থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে পনেরো বৎসর (১৫৪০—১৫৫৫ খৃঃ) তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করেছিলেন। তারই মধ্যে এক বৎসর ইরাণের রাজ-দরবারে অবস্থান-কালে বায়জাদের শিষ্য আগা-মীরাক, মাজাফ্ফার আলি, সুলতান মহম্মদ প্রভৃতি বিখ্যাত ইরাণী শিল্পীদেব সংস্পর্শে এসেছিলেন। সেই সময় সেখানে হুমায়ুন মীর সৈয়দ আলি নামক একটি শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। এই শিল্পীব পিতা মীর মন্সুরও একজন বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। তাঁ'রা বায়জাদের ধরণেই চিত্র আঁকতেন এবং নিজেদের দেশ ছেড়ে বায়জাদের নিকট গিয়ে বসবাস করেছিলেন। মীর সৈয়াদ আলি যে কেবল বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন, তা'নয়; তিনি সুকবি বলেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। সিরাজের আরো একজন শিল্পী আবদুল সামাদও নির্ব্বাসিত সম্রাটের সুনজরে পড়েছিলেন। খোজা আবদুল সামাদ ও সৈয়াদ আলির মত কবি ও চিত্রকর ছিলেন। ইনি আবার সিরাজের রাজ-প্রতিনিধির পুত্র ছিলেন। হুমায়ুন যখন পরে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে কাবুল রাজ্য অধিকার করলেন তখন উল্লিখিত শিল্পীদের তাঁ'র দরবারে ইরাণ থেকে আহ্বান করেছিলেন। তাঁ'দের দ্বারা তিনি ইরাণী-পুরাণ "দাস্তান-ই-

আমির-হামজারের" জন্য ছবি আঁকিয়েছিলেন। এই সব চিত্রকলাই হ'ল মোগল-চিত্র শিল্পের ভিত্তি। এগুলি আঁকতে অনেক বৎসর তাঁ'দের লেগেছিল। আকবরের রাজত্বকালে সেগুলি শেষ হয়। হুমায়ুন তাঁ'র পুত্র আকবরের শৈশবকালে এই সকল শিল্পীদের কাছে ছবি আঁকতে শেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন। আকবর লেখাপড়া যদিও শেখেন নি, কিন্তু শৈশব থেকেই তাঁ'র চিত্র-শিল্পে গভীর অনুরাগ জন্মেছিল। তাঁ'র নিজের হাতের আঁকা ছবির এখন কোনো সন্ধান না পাওয়া গেলেও তাঁ'র আদেশে আঁকা চিত্রকলার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আকবর সাহের সময়কার আঁকা চিত্রকলাব মধ্যে তখনকার ঐতিহাসিক ঘটনারও অনেক কথা জানা যায়। আকবর তাঁ'র পিতার মৃত্যু-সংবাদ যখন পান, তখন তিনি পাঞ্জাব অঞ্চলে হিমালয়ের তরাইয়েতে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এই ঘটনাটিকে চির-স্মরণীয় করে রেখে গেছেন তাঁরই দরবারের একটি চিত্রকর। তা'ছাড়া আকবর কর্ত্তৃক ফতেপুরসিক্রির প্রাসাদ তৈরীর ঘটনা এবং সা-আবদুল-মালীর আকবরের রাজ্য-অভিষেকের সময় বিদ্রোহী হওয়ার বিষয় ইরাণী চিত্রকর আবদুল সামাদের চিত্রে বেশ ভাল ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়কার কোনো কোনো ছবিতে যথা: 'তানসেন ও আকবর সংবাদ', 'আকবরের দরবার' প্রভৃতি কতকগুলি চিত্রে এবং 'বাহারিস্তান' ও 'খামশা' নামক দুটি পুস্তকের চিত্রাবলীর মধ্যে ইরাণী-ভাব প্রকৃষ্টভাবে থাকলেও ত'ার মধ্যে প্রচলিত দেশীয় শিল্প-কৃষ্টিরও প্রভাব কম ছিল না।

আকবর
১৫৫৬-১৬০৫

মুচকুন্দ, মাধব, মুকুন্দ, বসওয়ান এবং লাল প্রভৃতি হিন্দু শিল্পীরা তাঁ'র দরবারে স্থান পেয়েছিলেন। এঁরাই অজন্তা, বাগ প্রভৃতি পুরাতনী শিল্পের জের—যা' মধ্যযুগে ক্ষীণভাবে জৈনী ও আদিম-রাজস্থানী শিল্পে চলেছিল—মোগল দরবারে ইরাণী শিল্পের মধ্যে দিয়ে চালিয়েছিলেন। এইভাবে আকবরের সময় হিন্দুস্থানে আবার চিত্র-শিল্পের নব জাগরণ আরম্ভ হয়েছিল।

ইরাণী শিল্পের বিশেষত্ব হ'ল—চিত্রকলায় নক্সাকারী ধরণে গাছপালা আঁকা। আর প্রচলিত ভারতীয় রীতিতে গাছপালার স্বাভাবিক ভাব বজায় রেখে তা'রই উপর একটা আলঙ্কারিক মাধুর্য্য দেবারই চেষ্টা তা'তে করা হতো। মোগল চিত্রে তাই এই দুই পন্থার সামঞ্জস্যে উদ্ভূত একটি বিশেষ রূপ দেখতে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া, আকবর সার আমলে দু জন বিখ্যাত হিন্দুকবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সুরদাস ও তুলসীদাস। সুরদাস ছিলেন আকবরের সভার সঙ্গীতাচার্য্য এবং গীতিকবিতায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-মহিমা প্রচার করতেন আকবরের সভায়। এইভাবে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার প্রভাব মোগল দরবারে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করেছিল। আকবর বুঝেছিলেন যে বিজেতা ও পরাজিতের মধ্যে সন্ধি ও সদ্ভাব সংস্থাপনের প্রধান উপায় হল শিল্পকলা। তাই দেখা যায়, মোগল যুগে হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার কৃষ্টির যোগে কিরূপ একটি দৃঢ় ঐক্য সংস্থাপিত হ'য়েছিল।

আকবরের সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব কালে যে-সব অসংখ্য চিত্রকলার প্রচার হয়েছিল, তার বিবরণ সহজে কেহই দিতে পারেন না। তা'ছাড়া মোগল চিত্রকলা পরবর্ত্তীকালে

শাল-দোশালা ও নানাপ্রকার বিচিত্র পণ্য (Curio) হিসাবে ভারতের বাইরে নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের ব্যবসাদার ছাড়া এখন কেবলমাত্র মুখ্য সংগ্রহ শিল্প-গুরু ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নাহার, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বম্বের গাজদার, পাটনার মান্নুক প্রভৃতির নিকট আছে। তা'ছাড়া, কলিকাতা, বম্বে, লাহোর, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বড়োদা রামপুর প্রভৃতি স্থানের মিউজিয়ামগুলিতে কিছু কিছু ভাল চিত্র সংগ্রহ আছে। এই সব প্রাচীন চিত্রকলার সঙ্গে তখনকার কত কাহিনী কত ইতিহাসই যে জড়িয়ে আছে, তা' কে বলতে পারে? অবশ্য মোগল চিত্র-শিল্প মোগল বাদশাহের দরবারেই গড়ে উঠেছিল এবং তাই কেবল তাঁ'দের ঐশ্বর্য্যের বিষয়, দরবারের বিষয়, শিকার ও হারেমের এবং বাদশাদের প্রিয় ফুল, ফল, জন্তু জানোয়ারের কথাই তা'তে বেশী জানা যায়।

সূক্ষ্ম তুলির টানে মোগল শিল্পীরা রাজস্থানী চিত্রকরদের হারিয়েছেন। এখনো শিল্পীদের বংশধরদের মধ্যে কিছু কিছু নকল করবার শক্তি দেখা যায়। জয়পুরের গঙ্গা বক্স বা আগ্রার বাবুলাল, পাটনার ঈশ্বরীপ্রসাদ, আলওয়ারের মহম্মদ জাকাউল্লা (এখন দিল্লীতে) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

আকবরের পরে তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের সময় চিত্রকলার আরো উন্নতি হ'য়েছিল বলে জানা যায়। জাহাঙ্গীর ছিলেন খুব সৌখীন লোক। তাই তাঁ'র কাছে শিল্পীরা বিশেষ সম্মান পেতেন। তিনি নানা দেশ থেকে নিজের দরবারে শিল্পীদের আহ্বান করতেন। হিরাতের আকারেজার পুত্র আবুল

জাহাঙ্গীর সা
১৬০৫—১৬২৭ খৃঃ

হাসানকে তিনি ইরাণ থেকে আনিয়েছিলেন। আকা রেজা ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর ইরাণের শিল্পকলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থাগারে ইরাণী শিল্পীদের আঁকা চিত্র-সম্বলিত গ্রন্থ অনেক তিনি সংগ্রহ করতেন। ইরাণের সুবিখ্যাত শিল্পী বায়জাদ, সুলতান মহাম্মাদ, আগা মিরাক এবং জাফার আলি প্রভৃতির চিত্রকলার ভূরি ভূরি নিদর্শন তাঁ'দের গ্রন্থশালায় ছিল। এই সব চিত্র-সংগ্রহ ভারতবর্ষে এবং দেশবিদেশের নানাস্থানে সংগ্রাহকদের নিকট ছড়িয়ে পড়েছে। উরোপের মত স্বতন্ত্রভাবে চিত্রশালার ব্যবস্থা মোগল আমলে ছিল না, তখন রাজাদের গ্রন্থাগারেই চিত্র সংগৃহীত হতো। এখনো জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যে সেই রীতিই চলে আসছে। সেখানে পুঁথিখানায় প্রাচীন চিত্রকলার সংগ্রহগুলি রাখা আছে।

জাহাঙ্গীরের আমলে চিত্রকলা কতদূর উন্নত হ'য়েছিল, তা'র বিষয় তাঁ'রই লেখা রোজনামচায় (জাহাঙ্গীর নামায়) জানা যায়। তিনি তাঁর দরবারী শিল্পী আবুল হাসানের বিষয় লিখেছিলেন, "আজ আমার জাহাঙ্গীর নামা কেতাবের মুখপত্রটিতে ছবি এঁকে এনেছিলেন শিল্পী আবুল হাসান! আমি তাঁ'কে সন্তুষ্টচিত্তে নাদির-উল্ রুমা (Marvel of the Time) উপাধিতে ভূষিত করছি। ছবিখানি সত্যি খুব প্রশংসার যোগ্য হওয়ায় তাঁ'কে এই খেতাব দিয়েছি। এঁর কাজ এতদূর সুন্দর যে একমাত্র বায়জাদ বা আবদুল হক্ই এঁর কাছ ঘেঁষবার যোগ্য। আমি যখন যুবরাজ, তখন এঁর পিতা হিরাতের আকা-রেজা আমার নিকট নিযুক্ত

ছিলেন। অবশ্য ছেলের কাজের সঙ্গে পিতার কাজের তুলনাই হয় না। এঁকে আমি শৈশব থেকেই চিত্রাঙ্কনে উৎসাহিত করে মানুষ করেছি এবং তা'রই ফলে আজ এঁর কাজের এত উন্নতি হয়েছে। ইনি যথার্থই এই খেতাবের উপযুক্ত।" এই ঘটনাটি থেকে সম্রাটের প্রগাঢ় শিল্প-অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, এই সুবিখ্যাত শিল্পী আবুল হাসানের আঁকা ছবি এখন খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া তখনকার শিল্পীরা তাঁদের ছবিতে নাম-ধাম লিখে রেখে না যাওয়ায় তা'র পরিচয় পাওয়াও এখন সহজ নয়। জাহাঙ্গীর সা তাঁ'র নিজের প্রতিকৃতি শিল্পীদের দিয়ে অনেক আঁকিয়েছিলেন এবং তা'র অনেক দৃষ্টান্ত এখনো আছে। মোগল বাদশাদের মুদ্রায় একমাত্র জাহাঙ্গীরের চেহারা দেখতে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের মা ছিলেন রাজপুত-রাজকন্যা, সুতরাং তাঁর ধমনীতে সহজেই ভারতীয় সংস্কৃতি প্রবেশ-লাভ করেছিল। তাই তাঁ'র ইরাণী চিত্রে অনুরাগ থাকলেও তাঁ'র আমলের চিত্রকলায় ক্রমশ ভারতীয় ভাব ও লক্ষণ বেশী দেখা যায়। প্রাচীন অজন্তা প্রভৃতি চিত্রকলায় যেমন রেখার সহজ ও সাবলীল ভাব আছে, মোগল ছবিতেও তেমনি রেখার মধ্যে সূক্ষ্ম ও সংযত ভাব বেশী ফুটে আছে।

জাহাঙ্গীরের সময় হকিন্স (Hawkins) সাহেবকে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে এবং সার টমাস রোকে (Sir Thomas Roe) ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-সম্রাট জেম্‌স দি ফার্ষ্ট্‌ (James I) দৌত্য-কার্য্যে মোগল দরবারে পাঠিয়েছিলেন। এঁদেরই লেখা পত্রাবলী ও রোজনামচা থেকে তখনকার ইতিহাসের বিষয়

অনেক তথ্য জানা যায়। একবার সার টমাস রো বাদশাকে বিলাত থেকে একটি বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা তৈলচিত্র উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট চিত্রটি পেয়েই বাজি রেখে বলেছিলেন যে, যদি তাঁ'র দরবারের কোনো শিল্পী সেই চিত্রটির এমন নকল করে দিতে পারেন যে আসলের সঙ্গে তা'কে চেনা শক্ত হবে, তা'হলে রো সাহেব তাঁকে কী উপহার দেবেন? রো সাহেব ৫০৲ টাকা বাজি রাখতে সম্মত হওয়ায় সম্রাট তাঁ'কে বলেছিলেন যে কাজের দক্ষিণা রো সাহেব খুব কমই ধার্য্য করেছেন। যাইহোক, কিছুদিন পরে অবশেষে হঠাৎ রো সাহেবকে সম্রাট দরবারে তলব করলেন তাঁর শিল্পীদের আঁকা নকল চিত্রগুলি দেখাবার জন্যে। ৬ খানি ছবির মধ্যে ৫ খানি ছবিই তাঁ'র দরবারী শিল্পীরাই এঁকেছিলেন। রো সাহেবের আনা বিলাতি তৈলচিত্রটি নকলগুলির সঙ্গে একত্রে রেখে তাঁ'কে প্রদীপের সাহায্যে দেখে নির্ব্বাচন করতে বলা হ'ল। রো সাহেবের নিজের আনা ছবিটিকে বাছাই করে নিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল বলে জানা যায়। তা'তে সম্রাট খুসী হ'য়ে ছিলেন এই ভেবে যে, এ-দেশের শিল্পীদের শিল্পকলা শেখবার জন্যে বিদেশের আশ্রয় নেবার কোনো প্রয়োজন নেই।

জাহাঙ্গীর তাঁ'র পিতার আমলের শিল্পীদের সকলকেই প্রতিপালন করেছিলেন এবং তা'ছাড়া অন্যান্য আরো অনেক শিল্পীকে তাঁ'র দরবারে আহ্বান করেছিলেন। আবদুল সামাদ আর মীর সৈয়াদ আলির মৃত্যুর পর তাঁ'দের স্থান দখল করেছিলেন ফরাক্ বেগ। জাহাঙ্গীর খুসী হয়ে তাঁকে

একবার অযাচিতভাবে যুবরাজের বিবাহের সময় দু হাজার টাকা উপহার দিয়েছিলেন। উক্ত শিল্পীটি ছিলেন মধ্য এসিয়ার লোক। জাহাঙ্গীরের সময় ভারতবর্ষের বাহির থেকে সামারকান্দের মহাম্মাদ নাদির ও মহাম্মাদ মুরাদ নামক দুটি বিচক্ষণ চিত্রকর এসেছিলেন। এই ক-জন ছাড়া পরবর্ত্তী সাজাহানের রাজত্বকালে বিদেশী শিল্পী আর বড় একটা কেউ মোগল দরবারে আসেন নি। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে পার্শ্বচর হিসাবে দুটী তিনটী শিল্পী সর্ব্বদাই থাকতেন। সম্রাট যখন দীর্ঘ অবসর নিয়ে ভূ-পর্য্যটনে যেতেন, তখন তাঁ'রাও সঙ্গে থাকতেন। তাঁ'দের দিয়ে সম্রাট তাঁ'র শিকার, যুদ্ধ, জলসা প্রভৃতির ছবি আঁকিয়ে নিতেন। এইভাবে তখনকার অনেক ঘটনা এই সব শিল্পীরা এঁকে রেখে গেছেন। রাজ-অনুগ্রহ সব সময় শিল্পীদের পক্ষে সুলভ ছিল না। এঁর পূর্ব্বে আকবরের সময় শিল্পী সাঁওল দাস, জগন্নাথ এবং তারাচাঁদকে এগার দিন ছয় শত মাইল উটের পিঠে দারুণ গ্রীষ্মে বাধ্য হ'য়ে মরুভূমি পার হ'তে হয়েছিল। সে সময় শিল্পীদের অধ্যবসায় এবং শারীরিক শক্তি থাকারও প্রয়োজন ছিল। তা' ছাড়া আকবরের সময় রাজ্যে শান্তি-স্থাপনার জন্যেই অশান্তি পোয়াতে হ'তো অনেক; কিন্তু জাহাঙ্গীরের সময় পুরোদমে শান্তি-স্থাপনা হ'য়েছিল। তাই তিনি 'মুসাব্বর' শিল্পীদের নিয়ে সময় কাটাবার সুযোগ পেতেন। তাঁ'র আমলের চিত্রকলায় সকল রকমের আভিজাত্যের ও আনন্দপূর্ণ জীবন-যাত্রার কাহিনী জানা যায়। জাহাঙ্গীরের প্রতিকৃতিগুলি বেশ যত্ন করে ধরে ধরে আঁকা। আকবরের অল্পসংখ্যক ভাল প্রতিকৃতি চিত্র পাওয়া যায়। তাঁ'র বেশীর ভাগ

প্রতিকৃতি জীবনের ঘটনা অবলম্বন করে আঁকা; তাই তাতে প্রতিকৃতির চেয়ে অন্যান্য বক্তব্য বিষয়ের দিকেই শিল্পীরা বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁর 'জাহাঙ্গীরনামা' রোজনামচায় মিরজা মহম্মদ হাকিম, সাহামুরাদ প্রভৃতির আঁকা প্রতিকৃতির বিষয় নিজে বিশেষভাবে উল্লেখ করে গেছেন। সম্রাটের উদ্যান-রচনার দিকেও খুব ঝোঁক ছিল। তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল ইত্যাদি খুব ভালবাসতেন। তাই তাঁ'র হুকুমে শিল্পী ওস্তাদ মনসুর যে কতকগুলি ফুলের ছবি এঁকে গেছেন তা'র তুলনাই হয় না। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর যাবার পথে লাহোরেই সম্রাটের মৃত্যু হয় এবং তা'র সঙ্গে সঙ্গে মোগল চিত্রকলারও দৈন্য আরম্ভ হয়।

এর পরেই তাজমহলের পরিকল্পনা যে সম্রাট করেছিলেন, সেই সাজাহান বাদশার হাতে ভারতের চিত্র-শিল্পের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার পড়ল। তিনিও চিত্র-শিল্পের যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, এ বিষয়ে একটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। সার টমাস রো তাঁকে একটি বিলাত থেকে আনা ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট ঘড়িটি গ্রহণ করে বলেছিলেন যে তিনি যেমন তাঁর স্বর্গীয় পিতাকে একটি তৈলচিত্র এনে দিয়েছিলেন, সেইরূপ একখানি পেলে তিনি ইহা অপেক্ষা আরো সন্তুষ্ট হতেন। সম্রাট সাজাহান কেবল চিত্রকলা নয়, অন্যান্য কারুশিল্পের উন্নতির দিকেও মন দিয়েছিলেন। তারই ফলে আজ মণিমাণিক্যখচিত তাজমহল জগতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য হ'য়ে থেকে গেছে। তাঁ'র আমলের আঁকা তাঁ'র দরবারে পারস্য দূতের অভিযান, ময়ূর সিংহাসনে আসীন সম্রাটের

সাজাহান
১৬২৭—১৬৫৮

প্রতিকৃতি প্রভৃতি চিত্রগুলি দেখলে বোঝা যায় যে চিত্রকলা তখনো উন্নতির পথেই চলেছিল। অবশ্য তা'র প্রধান কারণ, তাঁ'র পিতার প্রেরণা রাজ-দরবারের শিল্পীদের মনের মধ্যে ছিল, তাঁর নিজের তাতে বিশেষ হাত ছিল না। সাহাজানও তাঁ'র পিতার মত সূক্ষ্ম কারিগরির পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তাঁর আমলের চিত্রকলায় সূক্ষ্ম নক্সাকারী কাজের বেশ একটু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। সাজাহানের সময় শিল্পীরা কেবলই বাদশার অনুগ্রহে বর্দ্ধিত হন নি, অনেক বড় বড় সৌখীন অমাত্যদের দ্বারাও তাঁরা প্রতিপালিত হয়েছিলেন। পাঞ্জাবের একজন বড় রাজ-পারিষদ (আসফ খাঁ) তাঁর লাহোরের বসতবাড়ীতে অনেক শিল্পীদের নিযুক্ত করে ছবি আঁকিয়েছিলেন। মোগল বাদশাদের দেখাদেখি বিজাপুরের সম্রাটও তখনকার অনেক চিত্রকরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁ'দের আমলের পুঁথিপত্রের এবং চিত্রের নিদর্শন সেই সময়কার রাজাদের শিলমোহর-সমেত দেখতে পাওয়া যায়। শিল্প-রসিক মোগল বাদশাদের সংস্পর্শে এসে তখনকার অনেক ধনী-গৃহস্থও শিল্পকলার অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন।

সার টমাস রোয়ের মত ফরাসী চিকিৎসক বেরনিয়ারের (Bernier) ভারত-ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে সাজাহানের সময়কার অনেক কথাই জানা যায়। ১৬৫৬ থেকে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি মোগল দরবারে থাকার কালে এদেশের অনেক কথাই জানতে পেরেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে এই সময়কার সকল প্রকার শিল্পকলাই সম্রাট ও আমীর ওমরাহদের প্রসাদেই বেঁচে ছিল এবং শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠে-

ছিল। তাঁ'রা শিল্পীদের কাছে রেখে কাজ করাতেন এবং উৎসাহিত করতেন। এদেঁর উৎসাহে বর্দ্ধিত না হলে ভারতের শিল্প-সম্ভারের সুনাম দেশবিদেশে তখন ছড়িয়ে পড়ত না। চীন ও উরোপে ভারতীয় শিল্পকলার তখন বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং পণ্য হিসাবে বহুমূল্যে বিক্রি হতো।

সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে তাঁ'র বড় ছেলে দারাসিকোই চিত্রকলায় খুব অনুরাগী ছিলেন। তাঁর নিজের চিত্র-সংগ্রহের একটি কেতাব ছিল, তা'তে বিখ্যাত শিল্পীদের হাতের ছবি তিনি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন এবং তা'তে তাঁ'র হাতের সই আছে।

আওরাঙজীব
১৬৫৮—১৭০৭

এখন সেটি বিলাতে 'ইণ্ডিয়া আফিসের' গ্রন্থশালায় রাখা গেছে। দুঃখের বিষয় দারাসিকো রাজ্য পেলেন না, রাজ্যের ভার পিতাকে জোরজবরদস্তী বন্দী করে নিলেন আওরাঙজীব ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন খুব গোঁড়া ও জেদী লোক। প্রবাদ আছে, তিনি রাজ্য-লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সভার সমস্ত চিত্রকরদের বিদায় দিয়েছিলেন এবং অনেক চিত্রের মধ্যে মানুষের মুখগুলি আঁকা ধর্ম্মসঙ্গত নয় ভেবে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। আওরাঙজীবের আমলের উরোপীয় পরিব্রাজক তাভারনিয়ার (Tavernier) এবং মানুচীর (Manucci) লেখা বিবরণী থেকে সে সময়কার অনেক কথা জানা যায়। এঁদের বিবরণীতে আছে যে আওরঙজীব সম্রাট আকবরের কবর সেকেন্দ্রার ভিত্তি-চিত্রে যে সব মানুষের মূর্ত্তি আঁকা ছিল, সেগুলিকে চূণকাম করে মুছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি তাঁর গোঁড়ামীর জন্যে চারু-শিল্পকে যে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, এ-কথা যে কতদূর

সত্য, তা বলা যায় না। আবার জানা যায় যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতান বিদ্রোহী হওয়ায় তাঁকে যখন তিনি গোয়ালিয়ারের দুর্গে বন্দী ক'রে রাখেন, তখন তাঁর হুকুমে চিত্রকরেরা মাঝে মাঝে বন্দীর প্রতিকৃতি এঁকে এনে তাঁ'কে দেখাতেন। তিনি পুত্রের সেই প্রতিকৃতি চিত্র দেখেই সন্তুষ্ট থাকতেন। এই সব শিল্পীরা তখন হাতে হুবহু প্রতিকৃতি এঁকে ফটো তোলারই কাজ করেছিলেন। এই প্রতিকৃতি আঁকার রেওয়াজ যে তখন ছিল, বিজাপুর গোলকুণ্ডার স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে প্রচলিত প্রতিকৃতি চিত্র-গুলিই তার প্রমাণ।

আওরাঙজীবের বিজাপুর রাজ্য দখল, আওরাঙজীবের দরবার এবং তাঁ'র প্রতিকৃতি প্রভৃতির অনেক ছবি দেখা যায়। এই সব চিত্রে বেশীর ভাগ তাঁ'কে বৃদ্ধ অবস্থায় দেখানো হয়েছে। তা'থেকে পার্শী ব্রাউন সাহেব অনুমান করেন যে, হয়ত সম্রাট বৃদ্ধ বয়সে শিল্পীদের তাঁর দরবারে পুনরায় স্থান দিয়েছিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আওরাঙজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার যেটুকু কদর দরবারে ছিল, তাও শেষ হয়ে গেল। রাজ-সিংহাসন নিয়ে আরম্ভ হলো কাড়াকাড়ি এবং ফলে বিদ্রোহ কাটাকাটি মারামারি চল্ল কিছুকাল। যখন মহম্মদ শা দিল্লীর তক্তে বসলেন, তখন অল্পকালের জন্যে একটু শান্তির আমেজ দিয়েছিল বটে, কিন্তু ১৫৫০ থেকে ১৬৫০ পর্য্যন্ত যেমন চিত্রকলার দরবারে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল—১৬৫০ থেকে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তেমনি তা'র দুর্দ্দশা চলেছিল। একটি ঘটনা থেকেই মহম্মদ শার চিত্রকলার প্রতি বীতরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মোগল দরবারের গ্রন্থশালায় সযত্নে রক্ষিত

আকবরের আমলের শিল্পীদের আঁকা অমূল্য চিত্র-সম্পদ 'রাজামনামা' খানি অম্লানবদনে এক কথায় মহারাজ সওয়াই জয়সিংহকে উপহার দিয়েছিলেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার মোগল-রাজপ্রতিনিধি যখন স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন রাজ্য লক্ষ্ণৌয়ে স্থাপনা করলেন, তখন মোগল দরবারের বিতাড়িত শিল্পীরা তাঁ'দের দরবারে কিছুকাল এসে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে-ছিলেন। ঠিক এইভাবেই একদল মোগল দরবারের শিল্পী হায়দ্রাবাদের সামন্তরাজের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু যেমন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের আর প্রাণ-শক্তি থাকে না, সেইরূপ এই সকল শিল্পীরা মোগল-অনুগ্রহের অভাবে একেবারে নির্জ্জীব হয়ে পড়েছিল। কোনো প্রকারে পয়সা রোজগার করে প্রাণ বাঁচানোই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং মোগল শিল্পের অন্তিমকাল শীঘ্রই উপস্থিত হ'ল। অতএব যা' "লক্ষ্ণৌ-কলম", "হায়দ্রা-বাদী কলম" এবং "পাটনা কলম" প্রভৃতি চিত্রকলা দেখি, তা'র মধ্যে যদি এক আনা থাকে শিল্পীর মন তবে পনেরো আনা আছে তাতে অর্থলোলুপতা।

মোগল শিল্পীরা দরবারী ছবি ছাড়াও ফকির, দরবেশ, প্রভৃতির ছবি (অনেক সময় তাদের ব্যঙ্গ-কৌতুক), শিকারের ছবি এঁকেছিলেন। মোগল ছবির মধ্যে অক্সফোর্ড গ্রন্থাগারে রক্ষিত ইনায়ৎ খাঁর মৃত্যু-শয্যার ছবিখানি যে-কোনো দেশের চিত্রকলার গৌরব-স্বরূপ হতে পারে। ছবিখানি দেখলেই প্রথমে খুবই বাস্তব ভাবে আঁকা বলে মনে হয়। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাস্তবচিত্রের পারিপ্রেক্ষিক বা তিনটি বিভিন্ন আয়তনের দিকে লক্ষ্য (Three dimensions)

রেখে আঁকা হয়নি। তবুও যে তাকিয়াটির উপর মুমূর্ষু ব্যক্তিটির মাথা রাখা আছে, সেটিকে সূক্ষ্মভাবে ধূপছায়া (Light and shade) দিয়ে এবং বর্ণের সমবায়ে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে তাতে তা'র কোনোই অভাব বোধ হয় না। মুমূর্ষুর মুখে একটি মৃত্যু-ছায়া-ঘেরা বিষাদ-শান্ত ভাব বেশ ফুটে উঠেছে। এই ছবিটিকে মোগল চিত্রকলার আদর্শ হিসাবে কুমারস্বামী, হ্যাভেল, পার্শী ব্রাউন প্রভৃতি মনীষীরা তাঁদের গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

মোগল চিত্রকরেরা অন্ধকার রাত্রির ছবি খুব সুন্দর আঁকতেন। শিবিরে রাত্রি-যাপন, দেওয়ালীতে উষা-জাগরণ, রোজা-শেষে উপোস-ভঙ্গ প্রভৃতি অনেক রাত্রিকালের ছবি আছে। শিল্পীরা অন্ধকারের স্তব্ধতা ও গভীরতা চিত্রগুলিতে খুব সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্য কোনো দেশের শিল্পীরা রাত্রিকালের এত ভাল ছবি আঁকতে পারেন নি। এঁদের সমসাময়িক রাজপুত-চিত্রে রাত্রে হরিণ-শিকারের ছবির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। মোগল শিল্পীরা প্রতিকৃতি আঁকতে কতদূর দক্ষ ছিলেন তা' সেখ সাদির ছবিটি এবং আকবরের দরবারের রাজ-কবি ফৈজীর চিত্রটিতে বেশ জানা যায়। এই চিত্রগুলি নিখুঁতভাবে আঁকা। মোগল শিল্পীরা চেহারার ভিতরকার বিশেষত্বটি (type) বিশেষভাবে ফোটাতে পারতেন। উল্লিখিত দুটি চিত্রে দু জনের চেহারার বিশেষত্ব এই ছিল যে একটি 'মঙ্গোলিয়ান' (Mongolian) এবং অন্য জনের সেমেটিক (Semetic) ধরণের, তা' ছবি দুটি থেকে বেশ ধরা যায়, যদিও শিল্পীরা নৃতত্ত্বের (Anthropology) বিষয় কিছুই জানতেন না, কিন্তু তাঁদের প্রত্যক্ষ-

বোধ কতদূর প্রখর তা'র পরিচয় এই সকল প্রতিকৃতি চিত্রে তাঁ'রা রেখে গেছেন। এই সব মোগল শিল্পীদের প্রত্যক্ষ-বোধের দৃষ্টান্ত তাঁ'দের অনেক চিত্রকলায় দেখতে পাওয়া যায়। মোগল দরবারের চিত্রগুলি দেখলে মানুষের আকৃতিগুলিতে, পোষাকে এবং আদব-কায়দার ধরণের এমন একটা মিল আছে যে অনেক সময় একঘেঁয়ে বলে ভ্রম হয়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে প্রত্যেক সভাসদের প্রতিকৃতি যতদূর সম্ভব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আঁকা হয়েছে।

এক্ষেত্রে একটি কথা বল্লে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সম্প্রতি বিলাতের কোনো নামজাদা শিল্পী পালিয়ামেণ্টের জন্যে একটি মোগল দরবারের ছবি এঁকেছিলেন। তিনি এঁকেছেন সার টমাস রোর জাহাঙ্গীরের দরবারে দৌত্যের বিষয়। আঁকার কালে একটি মাত্র 'মডেল' তাঁ'র চিত্র-বর্ণিত সভাসদগুলির জন্যে তাঁ'র সামনে বসেছিল। তাই দেখা যায় তিনি প্রত্যেক সভাসদের প্রতিকৃতি ঠিক একই রূপে এঁকেছেন কেবল কোনো লোককে একটু বৃদ্ধ কোনো লোককে যুবক ভাবে এঁকেছেন। এইখানে মোগল শিল্পীরা অন্যান্য দেশের (বিশেষত উরোপের) শিল্পীদের চেয়ে অনেক উন্নতিলাভ করেছিলেন। তাঁ'রা মন থেকে ভেবে দরবারের প্রত্যেক লোকটির চেহারার বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তাঁ'দের চিত্রকলায়। মোগল চিত্রে যদিও একপেশে চেহারাই বেশী আঁকা আছে, তবে সামনের দিকের চেহারা বা এক-তৃতীয়াংশ ভাবে ফেরানো মুখের ছবিও আঁকতে পারতেন। মানুষেব ছবিতে অঙ্গ-চালনার ভাবের মধ্যে একটা শান্তভাব আনবার দিকেই বেশী ঝোঁক দেখা যায়। তাতে 'থিয়েটারী' ভাব নেই মোটেই। এখনকার

দিনে প্রাচীন মোগল ছবিগুলির মধ্যে যে একটা স্তব্ধভাব ভাব আছে, তা' খুবই একঘেঁয়ে বলে মনে হয়; কিন্তু সেকালে শিল্পীরা এবং শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকেরা ঠিক্ কি চাইতেন, তা' যদি আমরা আজ জানতে পারি তবেই তা'র প্রকৃত রস অনুভব করতে পারব। তখন আমাদের দেশের লোকেরা উরোপের তৈলচিত্র দেখেন নি। তৈলচিত্রগুলিকে দেখতে হ'লে এক নজরে দূর থেকে তা'কে দেখলে তবে তা'র বর্ণ-সমবায়ের রস পাওয়া যায়। আর মোগল চিত্রগুলিকে খুব নিকটে এনে তা'র কারিগিরির খুঁটিনাটিই দেখবার তখন নিয়ম ছিল। তা'ছাড়া, এখন যেমন তৈলচিত্র বাড়ীতে বাড়ীতে বিরাজ করছে, তখন রাজা, শিল্প-রসিক এবং রাজ-পারিষদদের জন্যেই সেগুলি আঁকা হ'তো। শিল্পীরা সর্ব্বসাধারণকে চটক লাগাবার জন্যে ছবি আঁকতেন না; তাঁ'দের কাজ সমষ্টিবদ্ধ সমঝদারদের নিকটই কদর পেতো। তাঁ'রা তাই এক একখানি চিত্র বহু যত্নে বহু দিন ধরে চুল চিরে সূক্ষ্ম তুলির টানে আঁকবার চেষ্টা করতেন—তাঁ'দের ছিল কঠোর সাধনা। আজ মোগল ঐশ্বর্য্যের বিশেষ কোনো পরিচয় না থাকলেও এই সকল শিল্পীদের চিত্রকলায় তাঁদের সাধনার যথেষ্ট স্মৃতি থেকে গেছে। এখানে মানুষের সৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী জীবনের চেয়ে অনেক উচ্চস্থান পেয়েছে।

মোগল চিত্রকলার কথা বলতে হ'লে তাঁ'দের লিপি-লিখনের (calligraphy) কথা কিছু বলা দরকার। মানুষের মূর্ত্তি আঁকা ইসলাম-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ; সেইজন্যে অনেক ধার্ম্মিক শিল্পী মানুষের আকৃতি না এঁকে লেখার নৈপুণ্যের দিকেই তখন মন দিয়ে-

মোগল লিপিলেখন
(Calligraphy)

ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁ'রা বিশেষতঃ ধর্ম্ম-পুস্তকের নকল করবার পুণ্য-লাভ থেকে বঞ্চিত হ'তেন না। মোগল আমলে কি হিন্দু, কি মুসলিম সকলেই কলমগীর ছিলেন। মোগল বাদশারা এবং সামন্ত রাজারাও এ বিষয় খুব উৎসাহী ছিলেন। আরবী ও পারসী ছিল তখন রাজভাষা এবং তা'রই সঙ্গে প্রচলিত হিন্দীর সংমিশ্রণে উর্দ্দু ভাষা মোগল দরবারে প্রচলিত হয়েছিল। লেখন-রীতি ছিল সাধারণতঃ চার প্রকার। (১) 'কুফি'—অর্থাৎ কোনাদার-লেখা যা' অতি প্রাচীন কোরাণে পাওয়া যায়। (২) 'নাস্‌খ',—অর্থাৎ গোল গোল হরফ্‌। (৩) 'নাসতালিখ্‌'—ইহা নাস্‌খের চেয়ে আরো বেশী গোল গোল ধরণের। (৪) 'শিখাস্‌তা',—নাস্‌তালিখেরই অন্য একটি রূপ মাত্র। জানা যায়, সাজাহানের পুত্র দারাসিকো আব্‌দুল রসিদ-দয়ল্‌মীরের নিকট লিপি-লিখন শিখেছিলেন। আওরাঙজীব বাদশা প্রত্যহ অবসর-কাল কোরাণের বয়েৎ লিখে কাটাতেন বলে জানা যায়। শেষ মোগল-সম্রাট বাহাদুর শাহের লিপি-লিখনের অনেক নমুনা এখনো পাওয়া যায়। ভারত-শিল্প মোগল আমলের চিত্রকলা ছাড়া নানা প্রকারের লেখা পুঁথির কারগরিরি জন্যেও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মোগল চিত্র ও পাণ্ডুলিপির প্রচার উরোপে যে হয়েছিল তার প্রমাণ অনেক আছে। প্রধানত ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন ডচ্‌ শিল্পী রামব্রান্ত দেউলিয়া হয়ে যান, দেনার দায়ে তখন তাঁর সংগৃহীত ভারতীয় চিত্রকলা ও শিল্প-সামগ্রী নীলাম হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই কারণে রামব্রান্তের চিত্রকলায় প্রাচ্য প্রভাব আছে বলে অনেকে অনুমান করেন। তা'ছাড়া অষ্ট্রিয়ার রাজপ্রাসাদে একটি কামরায় মোগল চিত্রের দ্বারা

সমস্ত দেয়াল ভরে দিয়ে সাজানো হ'য়েছিল, তা'রও প্রমাণ পাওয়া যায়। মোগল চিত্রকলার সূক্ষ্ম আলঙ্কারিক ভাবটি তখন সকল দেশের লোককেই মুগ্ধ করত; যদিও তাঁরা তা'র মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারতেন না সহানুভূতির অভাবে।

আধুনিক চিত্রকলা

এর পরেই ভারতের চিত্রকলার বিষয় বলতে গেলে প্রথমেই রাজা রবিবর্ম্মার সর্ব্বসাধারণের মনোনীত চিত্রাবলীর কথাই বলতে হয়। সে সময় তাঁর দেখাদেখি বাঙলা দেশে শ্রীবামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ঐ প্রকার চিত্রকলার সাধনার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোহরণ করেছিলেন। মোগল-সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের রুচির গভীর পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছিল এবং রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মেকলে-মিলটনের ভক্তরা ইংরাজীতে কাব্যকলার আলোচনা সুরু করে দিলেন। তাঁরা তখন বার্ডউডের (Birdwood) সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দেশের প্রাচীন শিল্পকলাকে অদ্ভুত-কিম্ভূত (quaint and curious) নামে অভিহিত করতে লাগলেন। তাজমহলকে খৃষ্টীয় বিবাহের পিঠা (wedding cake) এবং প্রাচীন ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তিগুলিকে স্থূল কুলের পিঠা (Plum pudding) নাম দিয়ে বিদ্রূপ করতে লাগলেন। ঠিক এই প্রকার বিরূপ আব-হাওয়ার মধ্যে হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ লর্ড কর্জ্জনের সহায়তায় ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। হ্যাভেল প্রথমেই কলিকাতা মিউ-জিয়ামের চিত্রশালায় রক্ষিত বিলাতি তৈল চিত্রগুলির

স্থানে প্রাচীন দেশী মোগল ও রাজস্থানী চিত্রকলা সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। শেষে কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা থেকে হ্যাভেল অবসর নিয়ে ভারত-শিল্পের বিষয়ে গ্রন্থ-রচনায় মন দিলেন। তাঁ'র যায়গায় শিল্প-গুরু শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয়ের ভার নিলেন ভারতীয় রীতিতে চিত্র-বিদ্যা শেখাবার উদ্দেশ্যে। তাঁ'রই নিকট প্রথমে নন্দলাল বসু, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভেঙ্কেটাপ্পা (মহীশূর), হাকিম মহম্মদ (লক্ষ্ণৌ), সামি উজ্জমা (লক্ষ্ণৌ) ও নাগাহাওয়াত্তা (সিংহল) এলেন প্রথমে ভারতীয় শিল্প-রীতিতে চিত্রাঙ্কন-শিক্ষায় দীক্ষা নিতে। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিল্পী স্বর্গীয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উদ্যোগে সহায় হ'লেন এবং একযোগে লর্ড কিচ্‌নারের সভা-পতিত্বে ১৯০৭ সালে ভারতীয় প্রাচ্য শিল্পসভা (The Indian Society of Oriental Art) স্থাপনা করলেন। আজ পর্য্যন্ত এই শিল্প কেন্দ্রটির সহায়তায় প্রতি বৎসর প্রদর্শনী খোলা হয় এবং তারই প্রভাবে এখন অন্যান্য প্রদেশেও ভারতীয় শিল্পের কদর হ'চ্ছে। বিলাতে লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড, ও সার উইলিয়াম রোদেন্‌-ষ্টাইন, লরেন্স বিনিয়ান প্রমুখ ভারতবন্ধু বিশেষজ্ঞ শিল্পী ও শিল্প-রসিকেরা মিলে "ইণ্ডিয়া সোসাইটি" (India Society) স্থাপনা করেছেন। বিলাতের এই সভার প্রচারিত ভারত-শিল্প-বিষয়ক পুস্তকাবলীর মধ্যে জগৎ-পূজ্য কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ এঁরাই

প্রথমে প্রকাশ করেন। ১৯১০ সালে এঁদেরই মধ্যে ১৩জন গুণী সভ্য মিলে বার্ডউড সাহেবের ভারতীয় শিল্পের বিরুদ্ধ-উক্তির বিষয় প্রতিবাদ করবার জন্যে একটি সভা আহ্বান করেন। তাঁ'রা বৌদ্ধ শিল্পকলাকে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্পদ বলে মেনে নেন। এই ঘটনার পর থেকেই উরোপীয়দের মধ্যে ভারত-শিল্প-সম্বন্ধে ভুল ধারণা কতক পরিমাণে দূর হ'তে আরম্ভ হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বম্বে গভর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্‌স সাহেব যদিও অজন্তার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বহু গবেষণা করেছিলেন এবং সরকারী গ্রন্থও প্রকাশ করে-ছিলেন, কিন্তু ভারত-শিল্পের পুনরুদ্ধারের বিষয় তাঁ'র তখন মনেই আসেনি। তা'র ভার পড়ল অবনীন্দ্রনাথ ও হ্যাভেলের হাতে। এখন অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও অনুশিষ্যবর্গ শান্তি-নিকেতন, মাদ্রাজ, কলিকাতা, লাহোর, জয়পুর এবং লক্ষ্ণৌয়ের সরকারী ও বে-সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়গুলির অধ্যক্ষতা করছেন। এখন আশা করা যায় যে, শিল্পকলার গৌরব দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে যাবে। উরোপের সনাতনী বাস্তব-শিল্পের মোহ এঁদের যদিও পিছন দিকে টানবে না জানি, কিন্তু অতি-আধুনিক ও অনায়াস-লব্ধ উরোপীয় শিল্পের পরবর্ত্তী সার-রিয়ালিষ্ট (Sur-realist) নামে যে চিত্র-শিল্পের ঢেউ চলেছে, তা'র আবর্ত্তে পড়ে না এঁরা তলিয়ে যান। তবে আশা করা যায় যে, সত্য ও জাগ্রত-অনুভূতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাঁদের উদ্যম যদি হয়, তবে দেশের এই শিল্প পথ-ভ্রষ্ট বা লক্ষ্যচ্যুত হবে না।

পরিশেষে ভারতের এবং মিসর, গ্রীস ও পরবর্ত্তী উরোপীয় শিল্পকলার বিশেষ পার্থক্য কোথায়, এ-বিষয় তু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। স্থানাভাবে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। শিল্প-সৃষ্টি মানুষ করে মনের স্বতঃস্ফুর্ত্ত আনন্দে এবং তার জীবন-পথে যা' আসে যায়, আর মনে সায় দেয়, তারই রূপ-ছন্দ সৃষ্টির দ্বারা ;—তা' পটেই হোক, ইট-কাঠেই হোক, আর ধাতু প্রস্তরেই হোক। তবে প্রত্যেক দেশের এবং জাতির মনস্তত্ত্বও তৈরী হয় দেশের আবহাওয়া, সংস্কার ও সাধনার ফলে এবং তা'রই জন্যে শিল্পকলায় এত বৈচিত্র্য দেখা যায় দেশগত ও জাতিগত পার্থক্যের মধ্যে। অতি আদিম যুগে মিসরে, রাজা, পুরোহিত, ও রাজন্যদের স্মৃতি-রক্ষার্থে পিরামিড প্রভৃতি তৈরী হ'ত এবং তা'রই জন্যে তখনকার শিল্পীরা সেগুলির গায়ে চিত্রকলায় তা'রই খবর লিখে গেছেন (Pictography তে) ছবি-হরফে। ছবিগুলি হরফের মতই সোজা সোজাভাবে একটি বিশেষ ছাঁদে ঢেলে যেন এঁকে রেখে গেছেন। পাথরের মূর্ত্তিগুলিও তাই সেখানে ঋজুভাব অবলম্বন করেছে—প্রকৃতিকে ছুঁয়েও ছোঁয়নি। অথচ মানুষ, জন্তু প্রভৃতি আঁকতে বা গড়তে গিয়ে সেগুলির মাপ প্রমাণের হিসাবে অসামঞ্জস্যও পাওয়া যায় না। এক কথায়, আঁকার মধ্যে ছেলেমানুষি নেই, আছে একটা বৈশিষ্ট্য, ও গাম্ভীর্য্য। পটগুলিকে তাঁরা প্রাণবন্ত করেছেন, প্রকৃতির হুবহু নকলে নয়, সোজাসুজি ভাবে পট এঁকে। তেমনি আবার গ্রীক ও রোমান শিল্প গড়ে উঠেছিল পেগান ধর্ম্মের অতিমানুষিক দেবদেবীর পূজার মধ্যে। তাঁ'রা তাঁ'দের দেবদেবীকে গড়তে গিয়ে প্রকৃতির যেখানে যা সুন্দর একত্র

ক'রে একটি নূতন ছাঁদ ও 'ছিরি' দিয়েছিলেন ভাস্কর্য্যকলায় বিশেষভাবে। মানবদেহের আকার দেবতাদের প্রতিমূর্ত্তি গড়তে গিয়ে তাঁ'রা তা'র খুঁটিনাটি সৌন্দর্য্যও খুব কাছ থেকে দেখেই ধরে দিয়েছেন সূক্ষ্মভাবে, কিন্তু তার ভিতর আধ্যাত্মিকতার আমেজটুকু মাত্রই ফুটেছে, তা'র বেশী তা'র থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। তবে একটা মানসী আদর্শ গড়তে যাওয়ায় প্রকৃতির খুঁটিনাটিতেও যে তাঁদের মনের একটা বিশেষ ছাঁদ দিতে হয়েছে, তা' তখনকার প্রস্তর ও তাম্রমূর্ত্তিগুলি খুঁটিয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায়। গ্রীক ও রোমানদের পরবর্ত্তী যুগে বাইজান্তাইন শিল্পকলায় (বিশেষতঃ চিত্রকলায়) বাস্তব ভাব নেই, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই আলোছায়া-সম্পাতে প্রকৃতিকে পটে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা ক্রমশ এগিয়ে চলেছিল এবং অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আতপচিত্র (Photograph) উদ্ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশঃ তার কদর কমে যায়। তারই ফলে আধুনিক একদল উরোপীয় শিল্পীদের যে বিশেষ এক ভাব-প্রবর্ত্তন ঘটেছে এবং প্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে উপেক্ষা ক'রে একেবারে আদিম অসভ্যদের শিল্পকলার মত এমন কি শিশুর মত হিজিবিজি যা' তাঁরা গড়তে আরম্ভ করেছেন, তা তাঁদের Sur-realist কাজ থেকে দেখা যাচ্ছে।

ভারত-শিল্পের পক্ষে দেখা যায়, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে শিল্পীরা নিরাকার ব্রহ্মের অনন্ত রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় জেনেও তার রূপক প্রতিমূর্ত্তি ভাবের দিক থেকে বার বার ফোটাবার সাধনা ক'রে গেছেন। তেত্রিশকোটি দেবতা সেই অনন্ত রূপেরই অভিব্যক্তি। তাই দেখা যায়, সংস্কার-

গত রূপকভাবে মূর্ত্তিগুলিকে মানুষের আকার থেকে একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। অনন্ত রূপকে ধরবার তাঁরা চেষ্টা করেছেন। এমন কি অসংখ্য হাত বা মস্তক যোজনার দ্বারা যা' পেগান-ধর্ম্মাবলম্বী গ্রীক শিল্পীদের গড়া দেবমূর্ত্তিতে পাওয়া যায় না। গ্রীকেরা যেমন দেবতা গড়তে গিয়ে মানুষের দেহ-পেশীর খুঁটিনাটির দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন, তেমনি ভারতীয় শিল্পীরা দেবতাদের দেহ গঠনকে মানুষের উর্দ্ধে তুলে' ধরবার ইচ্ছায় পেশীবাহুল্য মোটেই করেন নি, এমন কি দেবমূর্ত্তি-গুলি দেখ্‌লে যা'তে মন কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করে, তার জন্যে চেষ্টা করেছেন স্বপ্নাবেশমণ্ডিত পদ্মপলাশ নেত্র গড়ে। ধ্যান-ভাব আনাও তা'র আর এক উদ্দেশ্য ছিল। তা'ছাড়া সূক্ষ্ম কারিগরি দেখিয়েছেন দেবতাদের দেহের অলঙ্কার সজ্জার মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ক'রে। এতে অবশ্য তাঁ'দের দেবপ্রীতি-বা নিষ্ঠারই পরিচয় দেয়। যুগ যুগ ধরে সাধনার ফলে ভারতের শিল্পকলার এক বিশেষরূপ দেখা দিয়েছিল এবং তা'রই পরিচয় সমগ্র ভারতে ছড়ানো আছে। ভারতের শিল্পকলার এই বিশেষ ভাবের বা ভঙ্গীর রূপক-ছায়া শ্যাম, কাম্বোজ থেকে নিয়ে চীন, জাপান পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীক-প্রভাব আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পাওয়া গেলেও দেখা যায়, তা'র পরিচয় অন্যান্য স্থানে সমসাময়িক যুগে বা তা'র পরবর্ত্তী যুগের শিল্পকলায় একেবারেই নেই এবং ভারতের নিজস্ব একটি বিশেষ সংস্কারই তখন অধিকার ক'রে বসেছিল এসিয়া খণ্ডে বৃহত্তর ভারতের শিল্পকলায়। ভারত-শিল্পের প্রাণ-ধর্ম্মের পরিচয় এইভাবেই জানা যায়। অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীন চিত্রকলা, ভারতীয়

প্রাচীন ভাস্কর্য্য একটা বিশেষ ভঙ্গীতে দোলায়মান দেখা যায় এবং কোনো বিদেশীর পক্ষে তার মর্ম্ম স্পর্শ করা সম্ভব নয়। ভাস্কর্য্যকলা অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, এই প্রকার রূপক-ছন্দে গড়াটা তাঁ'দের অক্ষমতার পরিচয় নয়, কেননা প্রকৃতির হুবহু নকলও তাঁরা জীব-জন্তুর ছবি আঁকতে বা গড়তে গিয়ে দেখিয়েছেন। মোহেন-জো-দড়ো বা হারাপ্পার মৃন্ময় চিত্র-ফলকে, অশোকের স্তম্ভে এবং পরবর্ত্তী যুগে মহাবলী-পুরমের ভাস্কর্য্য-কলায় তা'র যথেষ্ট পরিচয় আছে। ভারতের শিল্পকলাকে ভাল ক'রে জানতে হ'লে অপর দেশের শিল্প-কলাকেও জানতে হয় এবং তা'র মধ্যে সংস্কারগত পার্থক্যকে ভাল ক'রে বুঝতে হয় বিশেষভাবে জাতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম্মের ও শিক্ষা-দীক্ষার নানাবিভাগ ও নানাদিক থেকে তা'র গবেষণার দ্বারা।

শিল্প-ধারার কাল-সূচী

প্রাগৈতিহাসিক (প্রস্তব যুগ) আনুমানিক	খৃঃ পূঃ ৩০,০০০—	পাথরের তৈরী, কুঠার, জলপাত্র, মাটির তৈরী গৃহসামগ্রী। গুহাব গাযে চর্ব্বি দিয়ে আঁকা এবং খোদাই করা চিত্র পাওয়া গেছে।
নব্য-প্রস্তর যুগ	„ ১০,০০০	
দ্রাবিড়ি সভ্যতা	„ ৪০০০ (?)	
মোহেন-জো-দড়ো ও হারাপ্পার সিন্ধুসৈকতসভ্যতা	„ ৩১০০-২৫০০—	সভ্যতার বহু নিদর্শন ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতি পাওয়া গেছে।
আর্য্য-আগমন (বৈদিক যুগ)	„ ১৫০০—	লৌরিয়া নন্দনগড়ে প্রাপ্ত সোনার লক্ষ্মী-মূর্ত্তিটি এই সময়ের তৈরী বলে অনুমিত হয়। (ভূদেবী, আঃ খৃঃ পূঃ ৮০০ ?)
মহাবীব	„ ৫৪০-৪৮৮	
গৌতম বুদ্ধ	„ ৫৬৩-৪৮৭	
মগধে হর্য্যঙ্ক (বা পৌরাণিক শিশুনাগ) বাজবংশ : বিম্বিসাব	„ ৫৩০-৪৯১—	(গিরিব্রজ বা) নব-বাজগৃহ স্থাপন।

কুণিক অজাতশত্রু	খৃঃ ৪৯১-৪৭৫—	পাটলী (পরবর্তী কুসুম-পুর) বা পাটলিপুত্রে দুর্গ স্থাপনা করেন। মথুরার নিকট যে বিবাট প্রস্তর-মূর্তি পাওয়া গেছে সেটি এঁরই প্রতিমূর্তি বলে অনুমান করা হয়।
দর্শক (?)	„ ৪৭৫-৪৫১—	গোল মোড়ক আসনে বসা মথুবার নিকটে একটি গ্রামে যে মূর্তিটি পাওয়া গেছে, তার লিপি-পাঠে সেটিকে দর্শক-রাজেরই মূর্তি বলে অনুমান করা হয়।
উদয়ন	„ ৪৫১—	পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপনা। দুটি বিবাট প্রস্তর-মূর্তি পাওয়া গেছে একটি উদয়ন এবং অপরটি নন্দীবর্ধন বাজেব বলে অনুমান কবা হয়।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩২৭-৩২৫

মৌর্য্যযুগ :

চন্দ্রগুপ্ত	„ ৩২২-২৯৮—	পার্সিপলিসের অনুকরণে পাটলিপুত্রে শতস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ রচনা। মেগাস্থিনিসের দৌত্য।

অশোক	খৃঃ ২৭৩-২৩২	—ভারতের নানাস্থানে স্তূপ স্তম্ভ, লিপি ইত্যাদি। লঙ্কাদ্বীপের রাজা তিস্যের নিকট দূত প্রেরণ। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও শিল্পকলার বিকাশ।
মহেন্দ্র	,, ২৫০-২০৪	—লঙ্কাদ্বীপে সমুদ্র-পথে অভিযান।
রাজা তিস্য (লঙ্কাদ্বীপ)	,, ২৫১-২১১	—অনুরাধাপুরের (লঙ্কায়) স্তূপ স্থাপন ও ভাস্কর্য্য-কলার উন্নতি।
উত্তরপশ্চিম সীমান্তে গ্রীক রাজন্যদের রাজ্যবিস্তার	,, ১ম শতাব্দী	—গান্ধারের গ্রীকভাবাপন্ন শিল্পের সূচনা।
শুঙ্গবংশের রাজ্যকাল	,, ১৮৫-৭২	— সাঁচী, বুদ্ধগয়া, ভরহুৎ স্তূপ-বেষ্টনী-গাত্রে ভাস্কর্য্য-শিল্পের বিকাশ।
দক্ষিণাপথে সাতবাহনরাজ্য	,, ১ম শতাব্দী	—অমরাবতীর স্তূপ ও ভাস্কর্য্য।

উত্তর পশ্চিম ভারতে কুষাণ রাজ্য

কণিষ্ক, হুবিষ্ক, বশিষ্ক ইত্যাদি	খৃষ্টাব্দ ৭৮-২২৬	—তক্ষশিলায় গ্রীকভাবাপন্ন গান্ধার শিল্প। বুদ্ধমূর্ত্তির উদ্ভব। মথুরায় ভাস্কর্য্য-কলার উন্নতি। বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশ। নাগার্জ্জুন ও অশ্বঘোষের আবির্ভাব। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার।

গুপ্ত রাজবংশ : (ভারতেতিহাসেব ও শিল্পকলার স্বর্ণযুগ) চন্দ্রগুপ্ত (১ম) সমুদ্র-গুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত (২য) কুমারগুপ্ত (১ম) স্কন্দগুপ্ত, কুমাবগুপ্ত (২য) প্রভৃতি।	আনুমানিক খৃঃ ৩১৯-৫৫০ (?)	—চীন পরিব্রাজক ফা' হিয়ানের ভারত-ভ্রমণ। ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্র-কলার বিশেষ উন্নতি। কবি কালিদাসেব আবির্ভাব। লঙ্কাদ্বীপ থেকে মহারাজ মেঘ-বর্ম্মাব দূত প্রেরণ। অজন্তায় গুহামন্দির গাত্রে চিত্র-শিল্প। যবদ্বীপ, শ্যাম, কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানে সমুদ্র-পথে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিল্পকলার প্রচার।
মগধের পববর্ত্তী গুপ্তবাজবংশ	৬ষ্ঠ—৮ম শতাব্দী	—শিল্পে প্রাদেশিকতাব সূচনা।
মালবরাজ মিহিরকুল (হূণ)	খৃঃ ৫০২	—জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ ববাহ মিহিরের আবির্ভাব ?
দাক্ষিণাত্যে চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও পববর্ত্তী চালুক্য রাজবংশ	,, ৫৫০-১১৯০	—ওহিওলের মন্দিরাবলি। বাদামীর বৈষ্ণব গুহা-মন্দির ও ভাস্কর্য্য। ইলোরার গুহামন্দির ইত্যাদি।
দক্ষিণ-ভারতে পল্লবরাজ্য	৬ষ্ঠ—৮ম শতাব্দী	—দক্ষিণে তৎকালীন মন্দিরাবলি ও মহাবলী-পুরমের যাবতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য।

হর্ষবর্দ্ধন খৃঃ ৬০৬-৬৪৭—শিল্প, সাহিত্য ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উন্নতি; সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রচেষ্টা।

চীন পরিব্রাজক হিয়াঙসাঙ „ ৬২৯-৬৪৫—এই সময় নালান্দার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষ খ্যাতি।

রাজপুতজাতির উত্থান „ ৭০০

সিন্ধুদেশে আরব অধিকার „ ৭১২

রাজা ললিতাদিত্য (কাশ্মীর) আনুমানিক
খৃঃ ৭২৫-৭৬০—মার্ত্তণ্ড মন্দির (কাশ্মীর)

বঙ্গের পালরাজবংশ (গোপাল, ধর্ম্মপাল,
দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতি) „ ৮০০-১২০০—প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক ১ম গোপাল দেব নির্ব্বাচিত হন। বঙ্গে শিল্পকলার উন্নতি। নেপাল ও তিব্বতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার। কাশ্মীরে শৈবধর্ম্ম।

ভোজরাজা (গুজরাট) „ ৮৪০-৯০০—ভাস্কর্য্যযুক্ত মন্দির-স্থাপত্যের উন্নতি।

শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় „ ৭৮০-৮৫০—

উড়িষ্যার নাঙ্গরাজবংশ আনুমানিক ১০ম
শতাব্দী থেকে—ভুবনেশ্বরের মন্দিরাবলি।

জেজাকভুক্তির চন্দেল রাজবংশ
আনুমানিক ১০ম শতাব্দী থেকে ১১শ—খাজুরাহোর মন্দিরা-বলি ও ভাস্কর্য্য।

দক্ষিণে পরবর্ত্তী চোলরাজ্য আনুমানিক	খৃঃ ৯৭৩-১১৯৮	নানাস্থানে মন্দির ও ভাস্কর্য্যকলার উন্নতি। বিখ্যাত ব্রঞ্জের নটরাজের মূর্ত্তি এই সময় তৈরী হয়।
পূর্ব্ব যবদ্বীপে হিন্দুরাজ্য আনুমানিক	১০ম-১৬শ শতাব্দী	যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য।
গজনীর ভারত আক্রমণ	খৃঃ ১০০১-১০২৭	সোমনাথের মন্দির (গুজরাট) এবং মথুরা, কনৌজ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরাবলি ও ভাস্কর্য্য ধ্বংস। এই সময় অল' বিরূণীর ভারত-বিবরণ লিখিত হয়। তিনি ভারতীয় সাহিত্যে—বিশেষতঃ বৈদিক সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।
দ্বার সমুদ্রের হয়শল রাজ্য	খৃঃ ১১১০-১৩৪২	মহীশূরে একটি বিশেষ ধরণের স্থাপত্য কলা। হেলেবিদের মন্দিরাবলি।
পৃথ্বিরাজ	খৃঃ ১১৮২-১১৯২	মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর ভারত-আক্রমণ।
দিল্লীতে মুসলিম রাজ্য স্থাপনা	,, ১১৯২-১২০৬	
মার্কোপোলোর ভারত আগমন	,, ১১৮৮-১১৯৩	
জয়দেব	১৩শ শতাব্দী	উড়িষ্যার কোণার্ক মন্দির।

খিলজি বংশ	খৃঃ ১২৯০-১৩২১
বিজয়নগর রাজ্য	১৪শ-১৬শ শতাব্দী—হাজার রামস্বামী মন্দির ও বিরাট প্রাসাদ পুরী-নির্ম্মাণ।
তৈমুরের দিল্লী আক্রমণ	খৃঃ ১৩৯৮
বাহমনী রাজ্য	„ ১৩৪৭
বামানন্দ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস	১৪শ শতাব্দী—বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রচার।
আহ্‌মদ শাহ (গুজরাট)	খৃঃ ১৪১১-১৪৪৩—মাণ্ডুর (মালবের) স্থাপত্যকীর্ত্তি
লোদী বংশ	„ ১৪৫০-১৫২৬
আদিলশাহী রাজ্য (বিজাপুর)	„ ১৪৯০-১৬৭৩—বিজাপুর গোলকুণ্ডার একটি বিশেষ ধরণের স্থাপত্য। ২য় আদিল শাহের সমাধি। এটির গোল গম্বুজটি পৃথিবীর মধ্যে ২য় বড় গম্বুজ।
ভাস্কো-ডি-গামা কালিকাটে আসেন	খৃঃ ১৪৯৮
কৃষ্ণরায়দেব (বিজয়নগর)	১৬শ শতাব্দী— বিজয়নগরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যকলা
কবি তুলসী দাস	খৃঃ ১৫৩২-১৬২৩—কালিকাটে পর্ত্তুগীজদের অভিযান।
ইব্রাহিম শাহ (জৌনপুর)	„ ১৫১৭— জৌনপুরে অটলা মসজিদ

মোগল যুগ :

বাবর	খৃঃ ১৫২৬-১৫৩০—শিখগুরু নানকের আবির্ভাব।

হুমায়ুন	,,	১৫৩০, ১৫৫৫-১৫৫৬
শেরশাহ	খৃঃ	১৫৪৩-১৫৪৫—সাসেরামের বিরাট পাথরের সমাধি।
আকবর	,,	১৫৫৬-১৬০৫—ফতেপুরের স্থাপত্যকলা। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়ে উন্নতি। মোগল চিত্রকলা। হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর প্রচেষ্টা।
জাহাঙ্গীর	,,	১৬০৫-১৬২৭—মোগল চিত্রকলার চরম উন্নতি।
শাজাহান	,,	১৬২৭-১৬৫৮—চিত্রকলার বিশেষ চর্চ্চা। তাজমহল নির্ম্মাণ। সুরাটে ইংরাজদের কারখানা স্থাপনা।
নাদির শাহের দিল্লী-লুণ্ঠন	,,	১৭৪৮
বৃটিশ সাম্রাজ্য সূচনা	,,	১৭৫৮

উনবিংশ শতাব্দী—ধর্ম্ম :

দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্য-সমাজ-স্থাপনা।

রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রভৃতির ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি।

শিল্পী ও কবি :

শিল্পী রাজা রবিবর্ম্মা।

কবি তরু দত্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেম-চন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশ-চন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, ভাই বীরসিংহ ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দী—জাতীয় জাগরণ :

তিলক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গান্ধীজি, শ্রীঅরবিন্দ, মতিলাল নেহরু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, জহরলাল নেহরু, সুভাষ বোস, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি।

কবি :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুল প্রসাদ সেন, রজনীকান্ত, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শিল্পী :—

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলী।

শব্দসূচী

অ

ঈ

উ

ঊ

ঋ

এ

ও

ক

খ

গ

ঘ

ট

ড

ত

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ল

ক্ষ

———

ভারতের শিল্প-কথা সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক

Acharya (P. K.)	A Dictionary of Hindu Architecture.
Andrae	Die Kunst Alten Orients.
Aravamuthan (T. G.)	Portrait Sculpture in South India.
Arnold (Sir Thomas)	Catalogue of Chester Beatty collection of the Indian Miniatures.
Bacchoffer (Ludwig)	Early Indian Sculpture, 2 vols.
Barua (B. M.) and K. G. Singh	Barhut-Inscriptions, edited and translated with critical notes. (Cal. University).
Banerjee (R. D.)	The Temple of Siva at Bhumara.
Bhandarkar (D. R.)	Asoka (Calcutta University).
Bhattacharyya (B.)	The Indian Buddhist Iconography.
Binyon (L.)	The Court Painters of the Grand Moguls.
Blakiston (J. F.)	The Jami Masjid at Badaun and other buildings in the United Provinces.
Blochet (E.)	Muslim Painting.
Bose (P. N.)	Principles of Indian Silpasastra.

Brown (Percy) — (a) Indian Painting under the Moguls.
(b) Indian Painting.

Bruhl (Odette) — Indian Temples.

Burgess (James) — (a) A Guide to Ellora Cave Temples.
(b) The Ancient Monuments, Temple of Bhuvaneswara of India.

Chanda (Ramaprasad) — (a) The Indus Valley in the Vedic Period.
(b) The Lingaraja or Great Temple of Bhuvaneswara

Coomaraswamy (A. K.) — (a) Rajput Painting.
(b) Selected Examples of Indian Art (1910).
(c) Indonesian Art.
(d) Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Arts, Boston (1924).
(e) Early Indian Sculptures (six reliefs from Mathura, Boston Btin:, XXIV— August 1926.)
(f) Introduction to Indian Art.
(g) Vishwakarma.
(h) Mediæval Singhalese Art.

Codrington — Ancient India.

Cousens (Henry) — (a) The Architectural Antiquities of Western India.
(b) Chalukyan Architecture.
(c) Mediæval Temples of Deccan.

Fergusson	(a) History of Indian and Eastern Architecture. (b) Tree and Serpent Worship of Mythology in India.
Fergusson, Hope and Biggs	Architecture of Ahmedabad.
Fisher (D.)	Die Kunst Indians, Chinese and Japanese (German).
Frech (Varion)	La Temple D' Icvarapura (French).
Gangooly (O. C.)	(a) Rupam (Indian Art Journals). (c) Rajput Painting. (c) Modern Indian Artist, Vol. 1 and Vol. 2. Masterpieces of Rajput Painting: (Selected, annotated and described in relation to original Hindi texts from religious Literature)
Ganguli (Monmohan)	Indian Architecture from the Vedic Period.
Ganguly (Monomohan)	Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad.
Ghosh (Ajit)	(a) A comparative Survey of Indian Painting. (b) Old Bengal Paintings, Pat Drawing—(Indian art and letters Vol. 2 pp. 43-53).
Copinath Rao	Elements of Hindu Iconography, 2 Vols.
Coswami (Kunjagobinda)	প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো (Calcutta University).

Griffith — Ajanta Cave Temples, 2 Vols.

Grousset (Rene') —
(a) The Civilization of the East, Vol. I. (Near and Middle East.)
(b) The Civilization of the East Vol. 2. (India).
(c) In the Foot-steps of the Buddha.
(d) Recent Archaeological discoveries in Indo-China.

Cluck (D) and Diez — Die Kunst Des Islam.

Haldar (Asit. K.) —
(a) Art and Tradition.
(b) অজন্তা
(c) বাগগুহা ও রামগড়

Havell (E. B.) —
(a) The Indian Sculpture and Painting (1908 and 1928)
(b) Ideals of Indian Art.
(c) Hand-book of Indian Art.
(d) A short History of India
(e) The Himalayas in Indian Art.
(f) Indian Architecture.
(g) Ancient and Mediæval Architecture of India (study on Indo-Aryan civilization).
(h) Benares the Sacred City

Hackin (J) 'C. Huart etc. — Asiatic Mythology.

Herringham (Lady) — Ajanta Frescoes.

Hurlimann (Martin) — Ceylon, Burma and Indo-China.

Iyer (A. V. T.) — Indian Architecture, 3 Vols.

Kak (R. C.)	Ancient Monuments of Kashmir.
Kats (J.)	Het Ramayana op Javansche Temple relief. (The Ramayana in the reliefs of Javanese Temples) Dutch.
Kleen (T. De)	Mudras.
Kramrisch (Stella)	(a) A Survey of Painting in the Deccan. (b) Indian Sculpture.
Kranse (G) and Karlwith	Bali (German).
Krom (N. J.)	(a) The life of Buddha on the Stupa of Barabudur according to the Lalitavistara. (b) Hindoe-Javansche (Hindu Javanese History) (Dutch)
Lindsay (James H.) I. C. S. (Retd.)	Indian Influence on Chinese Sculpture.
Maisey	Sanchi and its Remains.
Manson	Indian Architecture according to Silpa-Shastra.
Marshall (Sir John)	(a) Pre-historic India. (Sind and Punjab discoveries). (b) The Bag Cave. (c) Mohenjo-Daro and Indian Civilization. 2 Vols.
Muzumdar (N. G.)	Nalanda copper-plate of Devapaladeva.
Mehta (N. C.) I. C. S.	(a) Studies in Indian Painting.

	(b) Bharatia Chitra Kala (Hindi).
Mittra (Rajendra Lal)	(a) Indo-Aryan Civilization. (b) Buddha Gaya.
Mukerjee (Radha Kumud)	(a) Harsha. (b) Hindu Civilization. (c) Ashoka.
Permentier (L. F. H.) and Victor Coloubew	La' Temple d' Icvarpura (Combodge).
Pandey (R. S. Desh)	Science of Building Construction.
Ram Raj	Architecture of the Hindus.
Rawlinson (H. G.)	A short Cultural History of India.
Roerich (George)	Tibetan Painting.
Sahani (Daya Ram)	Guide to the Buddhist Ruins of Sarnath.
Sastri (H. Krishna)	Two Statues of Pallava kings and five Pallava Inscriptions in a Rock Temple of Mahabalipuram.
Satake (K. T.)	Camera pictures of Sumatra, Java and Bali.
Smith (Edmund W.)	Mogul Architecture of Fatepur Sikri.
Smith (Vincent)	(a) A History of Fine Art in India and Ceylon. (b) Early History of India. (c) The Jain Stupa and other antiquities of Mathura.
Stein (Sir Aurel)	Khotan.
Stutterhiem (Von. W.)	Rama-Legends und Rama (German) 2 Vols.

Tagore (Dr. Abanindra Nath) (a) Indian Artistic Anatomy.
(b) Six Limbs of Paintings.
(c) বাঙলার ব্রতকথা (আলপনা)
(d) ভারত-শিল্প

Thompson (Jr. D. V.) Preliminary notes on some early Hindu paintings at Ellora (Rupam, 1926, pp. 45-49).

Vernevil (M. P.) L' Art A Java. (French).

Vogel (J. Ph.) La sculpture De Mathura ars Asiatic XV.

Waley (Arthur) (Edited) The year-book of Oriental Art and Culture.

Yazdani (A.) Ajanta.
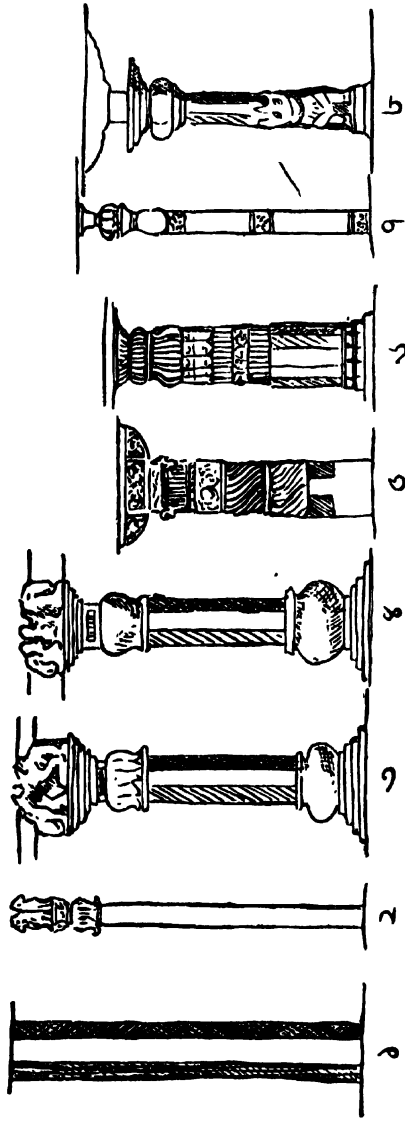
১। আদি পরকলা স্তম্ভ। ২। অশোকের সিংহ স্তম্ভ। ৩। কার্লের সিংহ স্তম্ভ। ৪। গরুড় স্তম্ভ। ৫। নাসিকের বৃষ স্তম্ভ। ৬। অজন্তা গুহার আমলক স্তম্ভ। ৭। অজন্তা, ভরহুৎ প্রভৃতি চিত্রে আঁকা এবং গড়া মন্দিরের ছবির স্তম্ভ। ৮। দ্রাবিড়ী ধরণের মহাবালীপুরমের স্তম্ভ।
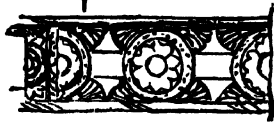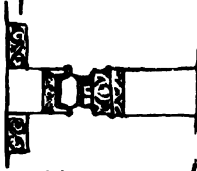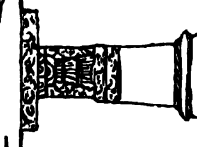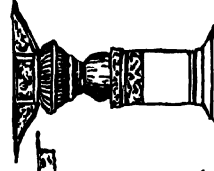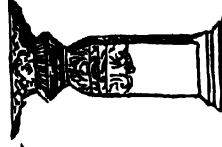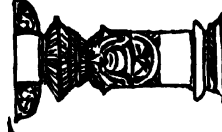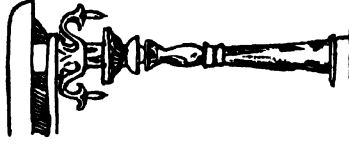
৯। ভরহুৎ ও অমরাবতীর রেলিঙের স্তম্ভ। ১০। দক্ষিণী মন্দির স্তম্ভ। ১১। জৈন মন্দিবের মাঙ্গলিক স্তম্ভ। ১২। মঙ্গল-কলস-সম্বলিত উড়িষ্যার স্তম্ভ। ১৩। উত্তর ভাবতীয় মন্দিরেব আমলক-স্তম্ভ। ১৪। গুপ্ত যুগের শঙ্খ স্তম্ভ। ১৫। জৈন-মন্দির স্তম্ভ। ১৬। গুপ্ত যুগের পদ্ম-স্তম্ভ।

১। উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য ২। খাজুরাহোর ভাস্কর্য্য
৩। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ৪। মথুরার ভাস্কর্য্য
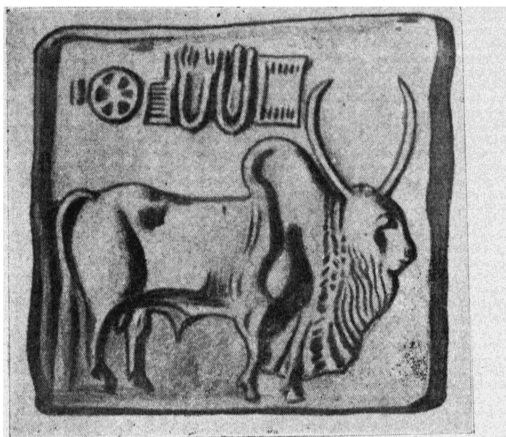
মোহেন-জো-দড়োর মৃৎ-ফলক

সিগিরিয়ার ভিত্তি-চিত্র

১। সুলতানগঞ্জের ধাতুমূর্ত্তি (বারমিংহমে রক্ষিত)

২। যবদ্বীপে চণ্ডিমেন্দুতের বুদ্ধ মূর্ত্তি

৩। শ্যামের বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তি

৪। যবদ্বীপের ভাস্কর্য্য

দক্ষিণ ভারতের লক্ষ্মীমূর্ত্তি

ভরহুতের রেলিঙে ভাস্কর্য্য-চিত্র

কাম্বোজের ভাস্কর্য্য-চিত্র

গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্য

শ্যামের ভাস্কর্য্য

শ্যামের ভাস্কর্য্য-চিত্র

একটি গুপ্ত যুগের ভাস্কর্য্য

যবদ্বীপের ভাস্কর্য্য

চৌমুখনাথ শিবের মূর্ত্তি

কাম্বোজের ভাস্কর্য্য-চিত্র (সমুদ্রমন্থন)